গ্রন্থ-সমর্পণ।

যিনি স্বীয় বিশাল বুদ্ধিগৌরবে বিপুল বৈভবের
অধীশ্বর হইয়াও ভগবদ্ভক্তিতে নিজকে তৃণ
হইতেও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেন,
যাঁহাকে সম্ভ্রান্ত মহামান্য ব্যক্তিরাও শ্রদ্ধাভক্তি
ও প্রীতির নেত্রে সন্দর্শন করিয়া
পরিতৃপ্ত হইতেন,
যাঁহাদ্বারা সহস্র সহস্র দীনদুঃখী নিরন্তর
প্রতিপালিত হইত এবং বহুপ্রকার
হিতকর অনষ্ঠান সম্পন্ন হইত,
সেই গোলকগত
কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, মহাভক্ত, মহানুভব
৺শ্যামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের
প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র নামে
পরম প্রীতিপুরঃসর
এই গ্রন্থোৎসর্গ করা
হইল।

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

ভূমিকা

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ইতঃপূর্ব্বে এই দীনজনদ্বারা শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থে সাধারণভাবে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-সুধাময়ী গম্ভীরা-লীলার সহিত এই দুই চরিতের অন্ত্য অংশের গূঢ়সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ অতি সুমধুর। ললিতা ও বিশাখার ন্যায় স্বরূপ ও রামরায় অন্ত্যলীলায় দিব্যোন্মাদের বিবিধ দশায় মহাপ্রভুর সেবা করিতেন,—স্বরূপ সুধাময় গানে, রামরায় মধুময় কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনা প্রশমন করিতে চেষ্টা পাইতেন এবং উন্মাদচেষ্টায় উভয়ে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সংরক্ষণে সচেষ্ট হইতেন। ইঁহাদের এই সেবা ও সম্বন্ধ "শ্রীস্বরূপদামোদর" ও "শ্রীরায় রামানন্দ" গ্রন্থে প্রদর্শিত হয় নাই, সুতরাং এই অভাবে এই অকিঞ্চনের উক্ত গ্রন্থ দুইখানি একবারেই অসম্পূর্ণ ছিল। সেই অসম্পূর্ণতা কিয়ৎপরিমাণে নিরাকৃত করার প্রয়াসই "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থপ্রকাশের এক প্রধান উদ্দেশ্য। মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলা লেখা আমার সাধ্যাতীত, ইহা বহুবার বলিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয় অনেক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আরও কোন কোন বিষয় সংযোগ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহাতে অনন্ত দোষ দৃষ্ট হইবে, তাহা আমি জানি। ভক্ত পাঠকগণের কৃপাই আমার ভরসা।

খাস্তকুড়িয়ার অন্যতম জমীদার, অশেষ-ধীসম্পন্ন পরমকল্যাণাস্পদ সদাশয় ও সদনুষ্ঠানের উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয় অতীব দয়া করিয়া এই গ্রন্থপ্রণয়নের সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃপায় ও সাধুসজ্জনগণের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনস্থিত গম্ভীরা-মন্দিরে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের যে মহাভাবে ও ব্যাকুলতায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সকল ভাব-ব্যাকুলতা আমার ন্যায় জীবাধমের অনুভবেরও বিষয়ীভূত হইবার নহে। সুতরাং গম্ভীরা-লীলায় আমি কি বর্ণনা করিব, আমি কি বুঝাইব? প্রেমের ব্যাকুলতা-ভিন্ন মধুময় রসময় শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। প্রেমিক ভক্তসাধকগণ এই নিমিত্ত শ্রীচরিতামৃত হইতে এই লীলা আস্বাদন করেন। সেই শ্রীচরিতামৃতই এই গ্রন্থের একমাত্র অবলম্বন।

অন্ত্যলীলায় যে মহাভাব পূর্ণতমরূপে বিকাশিত হইয়াছিল, মহাপ্রভুর কৈশোরে এবং তরুণ যৌবনের প্রারম্ভেই তাহার স্পষ্ট সূচনা পারলক্ষিত হয়। শ্রীল লোচনদাস লিখিয়াছেন, যজ্ঞোপবীতের সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল যথা :—

পুলকিত সর্ব্ব অঙ্গ আপাদমস্তক।
কদম্ব-কেশর জিনি এক এক পুলক।

গয়াতে এই ভাব আরও পরিস্ফুট হয়, শ্রীল মুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

কম্পোর্দ্ধরোমা ভগবান্ বভূব
প্রেমাম্বুধারাশতধৌতবক্ষা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই ঘটনার উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে :—

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
"কৃষ্ণরে, বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইনু ঈশ্বর মোর, কোন্ দিগে গেলা।"
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥
গড়াগড়ি করেন কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি-বিরহ-সাগরে॥

গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে একবারেই বিহ্বল হইয়া পড়েন, এই সময়ে তাঁহার দিন-যামিনীর জ্ঞান ছিল না, হরিনাম বা একটী গান শ্রবণমাত্রেই বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, যথা মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত কাব্যে :—

ততো রোদিতি স ক্বাপি নানাধারাপরিপ্লুতঃ।

নাসে চ শ্লেষ্মধারাভ্যাং বিপ্লুতে সংবভূবতুঃ ॥
বিলুণ্ঠন্ ভূতলে দেবঃ শুক্লাম্বরদ্বিজাশ্রয়ে।
রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে ॥
দিবসোঽয়মিতিপ্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা
এবং রজন্যাং প্রেমার্দ্রঃ সর্ব্বাং রাত্রিং প্ররোদিতি।
প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোঽসৌ বুবুধে হরিঃ।
ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রি বর্ত্ততে প্রাহ তং জনঃ।
দিবসোঽয়মিতি প্রেম্না ন জানাতি কিয়ং ক্ষপাম্ ॥
কচিচ্ছ্রুত্বা হরের্নাম গীতং বা বিহ্বলো ক্ষিতৌ।
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে কচিৎ ॥
কচিৎ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি সাদরম্।
সন্নকণ্ঠঃ কচিৎ কম্পো রোমাঞ্চিততনুভূ শম্।
ভূত্বা বিহ্বলতা মিতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে ॥

দ্বিতীয় প্রক্রমে ১ম সর্গ।

অর্থাৎ তার পরে তিনি কৃষ্ণ-বিরহে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগলের শত শত অশ্রুধারায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ পরিপ্লুত হইল। শ্লেষ্মধারায় নাসিকা বিপ্লুত হইয়া উঠিল। শুক্লাম্বরবিপ্রের গৃহে তিনি ভূতলে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, সারাদিন এইরূপ রোদন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে একটুকু চেতনা পাইয়া বলিলেন, "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে কি?" অপরে তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিল—"দিন নয় রাত্রি"। হরিনাম বা গান শুনিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িতেন, বাতাহত কদলীকাণ্ডের ন্যায়

কম্পিত হইতেন, রোমাঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ নামজপ করিতেন, এইরূপ করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গ স্বেদযুক্ত ও পুলকিত হইত, বাক্য গদগদ হইত, আবার তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

এইরূপে নবদ্বীপে কিয়ৎকাল শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ-প্রেমে দিনযামিনী বিভোর থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এই ভাবটী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

পাদোদকতীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নয়ান ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদিতে লাগিলা বহুতর ॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেমজলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
পুলকে পূর্ণিত হইলা সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্প-ভরে থর থর ॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলেন অবতার ॥

আবার অন্যত্র :—

প্রভু বলে "গদাধর তোমরা সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি ॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথারসে।
পাইনু অমূল্য নিধি গেল দৈবদোষে ॥

এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধুলায় লুটায় সর্ব্বসেব্য কলেবর॥
পুনঃ পুনঃ বাহু পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাকমুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে চক্ষু পূর্ণ প্রেমজলে।
সবেমাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবদনে বলে॥
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা বন্ধুসব বোলহ সত্বর॥"
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দগোপের নন্দন॥"
এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লুটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥

আবার একদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সমাগত। কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত তরুণ সন্ন্যাসীর পরিধানে অরুণ বহির্বাস, সে চাঁচরচিক্কণ-চিকুররাশি-শোভিত মস্তক একবারেই বিমুণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সমুজ্জ্বল অঙ্গকান্তি আরও শতগুণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্দর্শনের নিমিত্ত আচার্য্যভবন নিরন্তর জনতাপূর্ণ। প্রতিদিনই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে লইয়া কীর্ত্তন-মহামহোৎসব। একদিন সুগায়ক শ্রীমুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর মন জানিয়া গান ধরিলেন :—

"হায় হায় প্রাণনাথ কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনুমন জরে॥
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ্।
যাহা গেলে কানু পাঙ্ তাহা উড়ি যাঙ্॥"

গান শুনামাত্রই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সাত্ত্বিকভাবের প্রভাবে অধীর হইয়া "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অন্ত্যলীলায় শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরে এইরূপ ঘটনা প্রতিদিনই বহুবার পরিলক্ষিত হইত। মহাপ্রেমের সেই সকল বিচিত্র বিবিধ ভাব সাধারণ মানবের ধারণার অতীত। ভজননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণ এই গম্ভীরা-লীলার রসাস্বাদে বুঝিতে পারেন—শ্রীভগবান্ কেমন মধুরতম—তিনি প্রাণের কত প্রিয়তম,—তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কত মধুর,—আর তাঁহার প্রেমের আকর্ষণই বা কত প্রবল, তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের জন্য প্রেমিক ভক্তের ব্যাকুলতাময়ী চেষ্টা, গভীর উচ্ছ্বাস এবং অবশেষে মূর্চ্ছার ব্যপদেশে নীরব-নিস্পন্দভাবে সেই মহাপ্রেমরসসমরের রসাস্বাদনই বা কত সুধামাধুরীপূর্ণ।

আমি শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের পয়ার ও পদসমূহ মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করি। সুতরাং সে সকল পয়ার ও পদ বহুল পরিমাণে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই সকল পদ ও পয়ার ভক্ত পাঠকগণের নিকট চিরনূতন। এই গ্রন্থেও পাঠকগণ তাহা দেখিতে পাইবেন।

এতদ্ব্যতীত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামির ভাব গ্রহণ করিয়া গোলক-গত সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক সুকবি ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামি-মহোদয়ের রাইউন্মাদিনী গ্রন্থ হইতেও বহুল গান এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠকগণ সেই সকল গান-পাঠেও রসাস্বাদলাভ করিতে পারিবেন। এই ভরসায় এই গ্রন্থ ভক্ত-পাঠক মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ এই দুইখানি গ্রন্থও এই গ্রন্থে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। কিরূপে ভক্ত পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদীভাবে ও সুমধুর ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে হয় তাহা একবারেই আমার অবিদিত। ভ্রমপ্রমাদবিবর্জ্জিত গ্রন্থ-প্রণয়নও মাদৃশ অকৃতীর পক্ষে একবারেই অসম্ভব। সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির এইরূপ প্রয়াস বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু ভক্তগণ পাখীর মুখেও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া সুখী হয়েন, এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরাঙ্গের নামেই পরিপূরিত, সুতরাং ভক্ত পাঠকগণের কৃপা-দৃষ্টিপাত সম্বন্ধে ইহাই আমার প্রধান ভরসা।

১৭ই মাঘ, ১৩১৭ সাল।
২০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগৌরভক্তকৃপাভিক্ষু—
শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥"

"যামিনী জাগি জাগি জগজীবন
জপতহি যদুপতি নাম।
যাম যাম যুগ যৈছন মানত
জর-জর জীবনমান॥"

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীসচ্চিদানন্দ দেবশর্ম্মা
কলিকাতা।

মূল্য ২॥০ টাকা।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

সূচী-পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠ

উপসংহার।

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রবর্ত্তনা।

প্রয়াগধামে প্রসন্নসলিলা পতিতপাবনী ভাগীরথীর পুণ্যধারায় সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গম,—ত্রিবেণী তীর্থ নামে অভিহিত। আবার এই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীত্রয় বহুল জনপদকে কৃতার্থ ও তীর্থীভূত করিতে করিতে অবশেষে যে স্থানে সাগরে সম্মিলিত হইলেন, সে স্থান "সাগর সঙ্গম" নামে পরিকীর্ত্তিত।

সূচনা।

সাগরসঙ্গম-ক্ষেত্র মহাতীর্থ। শাস্ত্রে এই সকল মহাতীর্থ দর্শন স্পর্শন প্রভৃতির ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমজগতের নিভৃত প্রদেশে যে সুমহৎ সঙ্গমতীর্থ বিরাজমান, তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে অতি অল্প লোককেই সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট দেখা যায়। দুইটী প্রেমতরঙ্গিণী ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন হইয়া একত্র সম্মিলনে যে স্থলে প্রেমের মহাসাগরে আত্মসমর্পণ করিলেন, সে স্থল প্রেমিক ভক্তগণের মহাতীর্থ। প্রেমভক্তির এই সাগর-সঙ্গম-ক্ষেত্রে যে বিশাল প্রেম-তরঙ্গ-লীলা পরিলক্ষিত হয়, এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও তাদৃশ মধুর ও মহৎ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইবার নহে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চরণপ্রান্তবাহী সুনীল জলধি—পুরীতীর্থ-যাত্রিমাত্রেই সন্দর্শন করিয়াছেন। উহার অবিশ্রান্ত কল্লোল, উত্তালতরঙ্গ, অনন্তনীলিমা দর্শকমাত্রের হৃদয়েই এক বিশালভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। পুরী যাত্রিমাত্রেই এই সাগরতীর্থে অব-গাহন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। ইহারই তীরভাগে যে অদ্বিতীয় প্রেম-সাগর-সঙ্গমতীর্থ বিরাজমান, তাহা নীরব হইয়াও প্রেমের অফুরন্ত কল্লোলে কল্লোলিত, লোকলোচনের অদৃশ্য হইলেও বিশাল উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে নিরন্তর তরঙ্গায়িত। উহা অসীম, অনন্ত ও অতলস্পর্শ জলনিধি হইতেও অনন্তবিস্তৃত ও কোটীগুণ গম্ভীর। ফলতঃ ভাগ্যবান্ কাশীমিশ্রের ভবনস্থ গম্ভীরায় শ্রীরাধা-প্রেম-সাগরের যে তরঙ্গ-কল্লোলে শ্রীগৌরাঙ্গ দিবানিশি আত্মহারা হইতেন, জগতে সেই গম্ভীর প্রেম-সগর-সঙ্গম-তীর্থের তুলনা নাই। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দরূপী দুইটী প্রেমতরঙ্গিণী এই প্রেমসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া যে রসাস্বাদন করিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে সে রস অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় এবং অতুল্য।

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অতি বিস্ময়জনক অলৌকিক ব্যাপার। প্রেমময় ও রসময় শ্রীভগবানের প্রতি জীবের প্রেম-ভক্তির চরম-বিকাশ এই মহীয়সী লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় এই মধুময়ী লীলা-তরঙ্গ অসীম ও অনন্ত। মানবীয় ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তথাপি দিগ্‌দর্শনের ন্যায় অথবা মূকের আস্বাদন-প্রকাশ-চেষ্টার ন্যায় এই সন্দর্ভে এইসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে

শ্রীগম্ভীরা-মন্দির ও শ্রীপাদ কাশীমিশ্রালয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

পুরীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মঠ পুরুষোত্তমযাত্রী বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রধানতম দর্শনীয় স্থান। এই মঠেই প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরা-লীলা-স্থলী এখনও বর্ত্তমানে। গম্ভীরার কথা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনের কথা বলিতে হয়, কাশীমিশ্রের ভবন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মঠের কথাই সর্ব্বাগ্রে বলা কর্ত্তব্য। এই মঠ

শ্রীরাধাকান্ত-মঠ।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণপূর্ব্বভাগে অবস্থিত। শ্রীমন্দির হইতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিবার যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তার পূর্ব্বভাগে শ্রীরাধাকান্ত-মঠ বিরাজমান। শ্রীমন্দির হইতে অনধিক পাঁচ মিনিট গমন করিলেই এই মঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ সময়ে উহা সংস্থাপিত হয়, কোন্ সময়ে এখানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার ঠিক ঐতিহাসিক বিবরণ জানিবার সবিশেষ উপায় পাইলাম না। তবে প্রাচীন জনশ্রুতি এই যে একদা রাজা প্রতাপরুদ্র যুদ্ধার্থে কাঞ্চিনগরে গমন করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন এবং আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে শ্রীভগবানের চরণে একান্তমনে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই অবস্থায় তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শিরঃপার্শ্বে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন "তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি আবার

সৈন্যসংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও, বিজয়লক্ষ্মী অবশ্যই তোমাকে কৃপা করিবেন। অপিচ আমার মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তি এই স্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত আছেন, উনি শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামে অভিহিত। স্বদেশে প্রত্যাগমনের সময়ে উঁহাকে সাদরে লইয়া গিয়া উঁহার সেবা প্রতিষ্ঠিত করিও।" এই বলিয়া পাঞ্চজন্যধারী শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র জাগরিত হইলেন। আশার উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার বিষণ্ণ-হৃদয় এবং উষার কনকালোকে তাঁহার নিভৃত আশ্রয়-কুটীর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রকৃতই বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া শ্রীরাধাকান্ত জীউর সন্দর্শন লাভ করিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র প্রেম-ধারা শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় বহিয়া চলিল। তিনি পরম প্রেম-ভরে শ্রীমূর্ত্তি উত্তোলন করিলেন, তৃষিত চকোরের ন্যায় শতবার শ্রীমুখ-শশীর সুধারাশি নয়নযুগলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকান্তের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। যে বীরবর প্রতপ্ত নরশোণিতে কাঞ্চীনগর কর্দ্দমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন সেই বীরবরের বীররস প্রেমভক্তিতে পরিণত হইয়া প্রেমাশ্রু-গঙ্গায় কাঞ্চীনগরকে পরিষিক্ত ও পবিত্র করিয়া তুলিল। অনেকক্ষণ পরে এই প্রেমপ্রবাহের কিঞ্চিৎ বিরাম হইল। তিনি এই শ্রীমূর্ত্তি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজগুরু কাশীমিশ্র মহাশয়কে প্রদান করিলেন। ইহাই শ্রীরাধাকান্ত-মূর্ত্তি-সংস্থাপন সম্বন্ধে জনশ্রুতি।

এই সময়ে এই শ্রীমূর্ত্তি একক ছিলেন। বহুদিবস পরে শ্রীমতীর এক দারু-মূর্ত্তি রাধাকান্তের সুদীর্ঘ প্রিয়া-বিরহ প্রশমিত করিয়া ভক্তগণের নয়নানন্দবর্দ্ধন করেন। এতৎসহ ললিতাদেবীও যুগল সেবার সহায়রূপে সেবাস্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৬০।৭০ বৎসর হইল দুইখানি সমুজ্জ্বল ধাতুমূর্ত্তি এই দুই আনন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরাধাকান্তের সেবার জন্য মাদ্রাজে ও কটকে কিছু ভূসম্পত্তি আছে। সেবাধিকারী মহন্তমহোদয়গণ ক্রমশঃই সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন এই মঠের অধীন গঞ্জাম জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আটটি, পুরী জেলায় ৪টী, শ্রীধামবৃন্দাবনে ৩টী মঠ আছে। মাদ্রাজপ্রদেশে গঞ্জাম জিলায় পুরুষোত্তমপুরে একটী, চিল্কাহ্রদের সন্নিকটে রম্ভানামক স্থানে একটী, টেককালী রঘুনাথপুর একটি, পারলা কিমেডি সহরে দুইটী, কর্ত্তাপল্লীতে (নূতনগ্রাম) একটী, মুখলিঙ্গমে একটী, নিমগ্রামে একটী মঠ আছে। পুরী জেলায় পুরীমঠ ১টী, ডেলাং ষ্টেশসনের নিকটবর্ত্তী ঘবড়িয়া মঠ একটী, উহারই সন্নিকটে বাদলপুর মঠ একটী এবং কোণার্কের নিকটবর্ত্তী বালিয়াপটাতেও একটী মঠ আছে। শ্রীবৃন্দাবনধামে বংশীবটে শ্রীগোপালগুরু মন্দির, নিধুবনে শ্রীগৌরগোপাল মন্দির, শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরের নিকট কাঙ্গালী মহাপ্রভুর মন্দির,— এই ৩টী মঠ আছে। সর্ব্বসাকল্যে পুরীস্থ শ্রীরাধাকান্তমঠের অধীন এক্ষণে চৌদ্দটি মঠ বর্ত্তমান। এই সকল মঠের মধ্যে পুরীমঠে, পারলা কিমেডী মঠে, ঘরড়িয়া মঠে, গৌরগোপাল

মঠে এবং কাঙ্গালী মহাপ্রভুমঠে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূজ্যপাদ শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনই গম্ভীরা-লীলাস্থলী, এই পবিত্রতম স্থানই বৈষ্ণবগণের মহাপীঠরূপে চির-পূজ্য। এই ভবন কি প্রকারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাসভবনরূপে নির্ণীত হইল তাহা বলিবার পূর্ব্বে এস্থলে প্রথমতঃ কাশীমিশ্র মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধেই দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

কাশীমিশ্র ও তাঁহার বাড়ী।

কাশীমিশ্র বিশুদ্ধ ভক্ত। তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত চরিত মহাকাব্যে কবি কর্ণপুর অতি অল্পাক্ষরে অনেক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণান্তে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ভক্তবৃন্দ সমাগত হইলেন, তখন কাশীমিশ্রও তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ ও চতুর্ভুজরূপের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বাসনা হইয়াছিল, তিনি একবার চতুর্ভুজ রূপ দেখিতে পাইলে কৃতার্থম্মন্য হইবেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু অন্তর্যামী মহাপ্রভু মিশ্রমহাশয়ের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে ত্রয়োদশ সর্গে ঃ—

সমাগতং তং পরিকর্ণ্য কাশী
মিশ্রঃ কৃতাগঃ পটলীতমিস্রঃ।
বিলোক্য নত্বা মুমুদে প্রকাম
মভীপ্সিতং বাহুচতুষ্টয়াঢ্যম্॥

যাঁহার পাপশ্রেণীরূপ-অন্ধকার-রাত্রি বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নিষ্পাপ,—সেই কাশীমিশ্র, গৌরাঙ্গদেব আসিয়াছেন শুনিয়া অভীপ্সিত বাহু চতুষ্টয়যুক্ত প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া আনন্দিত হইলেন। অতঃপর লিখিত হইয়াছে :—

তৎকৃপাভিরভিচুম্বিত এষঃ
শ্রীমদঙ্ঘ্রিকমলস্য রজোঽভি-
রঞ্জিতঃ পুলককণ্টকিতাঙ্গঃ
সান্দ্রসৌখ্যবিবশঃ স ররাজ। ৬৪।

যো যদীয়কৃপয়া সুমহত্যা
নীলশৈলতিলকালয়লক্ষ্মীং
স্বে বশে প্রকুরুতে স্ম গরীয়াং
স্তস্য কেন মহিমা পরিমেয়ঃ। ৬৫।

গৌরচন্দ্রচরণদ্বিতয়স্যা
স্থাপনং সকল মাতনুতে যঃ
ঈপ্সিতং পরিকলয্য স কাশী-
মিশ্র এষ কথয়া কিমুবেদ্যঃ। ৬৬।

যো মহোৎসববিধৌ বিবিধানি
প্রায়শো নিজমতানি বিশেষাৎ
নির্ম্মিতানি বিদধে প্রভুচিত্তং
প্রাকলয্য কিময়ং জনবেদ্যঃ। ৬৭।

অর্থাৎ কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের কৃপায় তৎপাদপদ্মের রজঃ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলেন, রঞ্জিতাঙ্গ ও পুলকরূপ কণ্টকে ব্যাপ্তকলেবর ও

নিবিড়ানন্দবিবশ হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের সুমহতী কৃপাবলে নীলাচল-তিলক জগন্নাথের গৃহলক্ষ্মীকেও নিজের বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাত্মার গুরুতর মহিমার কথা পরিমাণ কে করিতে পারে? যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের চরণদ্বয়ের যে কোন ঈপ্সিত আজ্ঞা নিজ বিবেচনায় সম্পন্ন করেন, সেই মহাত্মা কি বাক্যের গোচর হয়েন? যে কাশীমিশ্র মহোৎসব-বিধিতে প্রভুর চিত্ত জানিয়া নিজ মনোমত প্রায়শঃই বিবিধ বস্তু সবিশেষরূপে নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার মহিমা কি সকলেই জানিতে পারে?

কাশীমিশ্র মহাভক্ত। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলেন :—

কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে॥

এতদ্ব্যতীত ইনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ভারের পূর্ণ অধ্যক্ষতা ইঁহার হস্তে বিন্যস্ত ছিল এবং ইনি সকল কার্য্যের পরিদর্শক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ম্যানেজার বলিলে যাহা বুঝা যায়, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা সম্বন্ধে মিশ্রমহাশয়ের উপরে তাদৃশ ভার সংন্যস্ত ছিল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপ্রভুর নিকট কাশীমিশ্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—

"কাশীমিশ্রনামা এষ সর্ব্বাধিকারী প্রাড়্‌বিবাকো ভগবতঃ।" অর্থাৎ কাশীমিশ্র, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বাধিকারী ও প্রাড়্‌বিবাক। সমস্ত বিষয় কার্য্যাদির পরিদর্শকই প্রাড়্‌বিবাক নামে খ্যাত।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-সেবা সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কার্য্যেই ইঁহার পরামর্শমতে সম্পন্ন করিতেন।

এই শ্রীপাদ কাশীমিশ্র মহোদয়ের ভবনই মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিমিত্ত সমর্পিত হইয়াছিল, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিলা তারে কাশীমিশ্র ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈলা নিবেদনে॥

এই দিন হইতেই কাশীমিশ্রের ভবন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহাপীঠে পরিণত হইল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও লিখিত হইয়াছে :—

প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে—প্রভু তোমার যোগ্যবাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভু কহে—এই দেহ তোমা সভাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥

মহাপ্রভু শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবন অঙ্গীকার করিলেন। এই সময় হইতে এই স্থানই "মহাপ্রভুর বাড়ী" বলিয়া খ্যাত হইল।

এই সম্বন্ধে লীলালেখকগণের কোনও মতদ্বৈধ নাই। শ্রীল মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে লিখিয়াছেন :—

শ্রীকাশীনাথস্য গৃহে স্থিতো হরিঃ
শ্রীসার্ব্বভৌমাদিভিরন্বিতঃ স্বয়ম্।

এই গৃহে সময়ে সময়ে শত শত ভক্তচকোর ব্যাকুলিত হইয়া মহাপ্রভুর বদনচন্দ্রমার সুধাপানে বিভোর হইতেন। সময়ে সময়ে ভক্তগণের জনতা এত অধিক হইত যে, মহাপ্রভুর এই বৃহৎ ভবনখানিতেও লোকসঙ্কুলন হইত না, তাই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ৮ম অঙ্কে :—

যুগান্তেঽনন্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলঘো
রমী সর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডকসমুদয়াদেব বপুষঃ।
যথাস্থানং লব্ধাঽবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ
সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে॥

অর্থাৎ অহো কি আশ্চর্য্য! যুগান্তসময়ে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী সেই ভগবানের অশ্বত্থদল সদৃশ ক্ষুদ্র কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনায়াসে অবস্থিতি করিয়াছিল, তদ্রূপ এই লঘুতর মিশ্রালয়ে সহস্র সহস্র লোক বিনাক্লেশে প্রবেশ করিতেছে।

মিশ্রালয়ে কি বিশাল ব্যাপার অভিনীত হইত, ইহাতে অনায়াসে তাহা বুঝাযাইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও লিখিয়াছেন :—

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র গৃহে কুতূহলে॥

নিরন্তর নৃত্য গীত আনন্দ-আবেশে।
প্রকাশিল গৌরচন্দ্রদেব সর্ব্বদেশে॥
কখন নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেক বাহ্য নাহি নিজানন্দ সুখে॥
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে॥
এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাস!
তিলার্দ্ধেক অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥

পূজ্যপাদ কাশীমিশ্রের ভবনেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর "গম্ভীরা" রূপ মহাপীঠস্থান বিরাজমান। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে এই স্থান অধিক দূরবর্ত্তী নহে। শ্রীচন্দ্রোদয়-নাটকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপীনাথকে বলিলেন,—কাশীমিশ্রের আগার মহাপ্রভুর অবস্থানের নিমিত্ত সমর্পিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গোপীনাথ বলিলেন :—

"সাধু সাধু! সিংহদ্বারনিকটবর্ত্তী ভবতি যতঃ সকাশাৎ সুখেনৈব জগন্নাথদর্শনং ভবিষ্যতি।"

এই স্থানে এখনও নদীয়ার সেই ভুবনপাবন প্রেমিক সন্ন্যাসীর সচ্চিদানন্দময় শ্রীঅঙ্গস্পর্শি ছিন্নকন্থা ও শ্রীরাধাকুণ্ডের করঙ্গটী বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের মহন্ত-পরম্পরা *

---

*. শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনস্থ শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মঠের যে গাদীশ্বর মহন্তপরম্পরা গাদীঅধিরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম-তালিকা।—

শ্রীশ্রীরাধা-প্রেম-মাতোয়ারা সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকান্তের সন্ন্যাস-লীলার এই নয়নজলাকর্ষী স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে ও সভক্তিতে সংরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন। নীরব নিস্তব্ধ গম্ভীর গম্ভীরায় বঙ্গীয় সন্ন্যাসিচূড়ামণির এই স্মৃতিচিহ্ন দর্শনে ভাবুক ভক্তহৃদয় স্বভাবতঃই নিদারুণ বিপ্রলম্ভরসের বিশাল তরঙ্গে একেবারেই অধীর হইয়া উঠে, আর ঐ নিভৃত গম্ভীরার গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নিরন্তর যেন এক করুণ রোল শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইয়া ঝিল্লী রবের ন্যায়—

"কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

কেবল এই রব কর্ণপথ অধিকার করিয়া বসে। হেথা হইতে সিন্ধুতীরে চলিয়া গেলেও এই ঝঙ্কারের সহসা বিরাম হয় না। সমুদ্রের কল্লোলেও যেন ঐ "কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ" রোল মিশ্রিত হইয়া হৃদয়কে উদাস ও অধীর করিয়া তোলে; ধন্য অনন্ত প্রেমশক্তির মহাপীঠস্থলী—কাশীমিশ্রভবনস্থ গম্ভীরা!

১। মহাপ্রভু, ২। বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী, ৩। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী (মকরধ্বজ পণ্ডিত), ৪। ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, ৫। শ্রীবলভদ্র দাস গোস্বামী, ৬। দয়ানিধি গোস্বামী, ৭। দামোদর গোস্বামী, ৮। গোবিন্দশরণ গোস্বামী, ৯। রামকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, ১০। হরেকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, ১১। রাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১২। রাধাচরণ দাস গোস্বামী, ১৩। হরেকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, ১৪। গোবিন্দচরণ দাস গোস্বামী, ১৫। বলভদ্র দাস গোস্বামী। বর্ত্তমান মহন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী। ইনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, ভক্তিমান্, বিদ্যোৎসাহী ও সজ্জন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
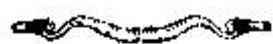
গম্ভীরা-মন্দির

শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। এই আশ্রমে সততই শত শত ভক্তের সমাগম হইত। কিন্তু সকলেই সকল সময়ে শ্রীপ্রভুর সন্দর্শন পাইতেন না। তিনি এক নিভৃত নির্জ্জন ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এখানে অতীব অন্তরঙ্গ লোক ভিন্ন অপর লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। যোগিগণের গুহার ন্যায় এই শ্রীগম্ভীরা-মন্দির সর্ব্বপ্রকার বৃথা শব্দ হইতে সুরক্ষিত থাকিত। মহাপ্রভু এই স্থানে বসিয়া নাম করিতেন, ব্রজলীলা স্মরণ করিতেন, আর দিনরজনী তাঁহার নয়নযুগল হইতে মুক্তাদাম-বিনিন্দিত অশ্রুমালা বহিয়া পড়িত। এই শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদস্বরূপ, বিপ্রলম্ভরসের প্রকটমূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনা-প্রশমনার্থ রুণুরুণুস্বরে ব্রজরসের গান করিতেন এবং শ্রীল রামরায় সুধাময়ী কৃষ্ণ-কথায় মহাপ্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিতেন। আর শ্রীগোবিন্দদাস প্রভুর নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন। এই নিভৃত নির্জ্জন শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠই গম্ভীরা নামে খ্যাত। এই গম্ভীরাই প্রভুর বিশ্রাম ও শয়ন-প্রকোষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—

১। এই মত বিলাপিতে অর্দ্ধরাত্র গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞী প্রভুকে শোয়াইল॥
প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরায় দ্বারে॥

১৯ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

২। এই মত অর্দ্ধ রাত্র কৈল নির্ব্বাহন।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥
রামানন্দ রায় তবে গেল নিজ ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ দুই শুইলা দুয়ারে॥

১৪ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

৩। গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদসংবাহন॥

* * * *

৪। সব ঘর জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন।
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥

* * * *

তবে গোবিন্দ বহির্বাস তার উপর দিয়া।
ভিতর ঘরে গেল মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥

১০ম পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

৫। গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তো মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥

২য় পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

এই সকল উক্তি দ্বারা জানা যায় শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরটী মিশ্রভবনস্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ এবং উহা তাঁহার বিশ্রামাগার বা শয়নাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার চারিদিকেও প্রকোষ্ঠ ছিল। মহাপ্রভু সেই সকল প্রকোষ্ঠে ব্রজরসের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইতেন। এই শয়নাগার একান্ত নিভৃত, নির্জ্জন ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বলিয়াই সম্ভবতঃ "গম্ভীরা" নামে খ্যাত হইত। গম্ভীরা শব্দের অপর অর্থও থাকিতে পারে।

এস্থলে আরও একটী বক্তব্য আছে। কেহ কেহ মনে করেন, গম্ভীরার তিনটী দ্বার ছিল। তাঁহাদের এইরূপ মনে করিবার হেতু এই যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে,—

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তেমুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধু নীরে॥
প্রভুর শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে,—প্রভু নাহি ঘরে॥

এইরূপ উক্তি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন গম্ভীরার তিনটী দ্বার। গম্ভীরা-প্রকোষ্ঠেরই যে তিনটী দ্বার ছিল, এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্টতঃ তাহা বুঝায় না। পরন্তু প্রভু যখন এক দিবস

পরিশ্রান্ত হইয়া গম্ভীরার ভিতরে দ্বার জুড়িয়া শয়ন করিলেন এবং গোবিন্দদাস প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দনার্থ ভিতরে বসিবার নিমিত্ত প্রভুকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই দ্বার ছাড়িয়া দিলেন না; তখন অগত্যা গোবিন্দ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া গম্ভীরার ভিতরে যাইয়া তাঁহার অঙ্গ-মর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি অপর দুইটী দ্বার থাকিত, তবে গোবিন্দ সম্ভবতঃ এইরূপ কার্য্য করিতেন না। অপিচ বর্ত্তমান সময়ে মিশ্রভবনে যেরূপ আকারে শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরটী সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও এক দ্বার ব্যতীত তিন দ্বার নাই। কিন্তু উহা পূর্ব্বে যেরূপ একটী অতিনিভৃত নির্জ্জন অন্তঃপ্রকোষ্ঠ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। তবে যে তিন দ্বারের উল্লেখ আছে তাহা সম্ভবতঃ শ্রীপাদ মিশ্রমহাশয়ের বিশাল ভবনের বহিঃখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও অন্তঃখণ্ডের দ্বারেরই পরিচায়ক।

শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার সম্ভবতঃ একবারেই বন্ধ করা হইত না। তাহা হইলে তাদৃশ ক্ষুদ্র কক্ষে বায়ুসঞ্চালন অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিশেষতঃ মহাপ্রভু একক গম্ভীরায় শয়ন করিতেন, দ্বারবন্ধ করিয়া শয়ন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হওয়া ও সম্ভবপর নহে। ইহাতে মনে হয় শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের বিশাল ভবনে অন্তঃখণ্ড হইতে রাজপথে আসিতে হইলে, তিনটী দ্বার ভেদ করিতে হইত। রাত্রিকালে এই দ্বারগুলি বন্ধ থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সকল দ্বারে কপাট বন্ধ থাকাসত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মহাপ্রভু, চিত্তের উদ্বেগে নিশীথে মিশ্রভবন হইতে অদৃশ্য

হইতেন, কথনও তাঁহাকে রাত্রিকালে বহু অনুসন্ধানের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার-সমক্ষে অথবা সমুদ্রতটে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ এই শ্রীমন্দিরটী অতি নির্জ্জন ও গূঢ়গভীর স্থানে অবস্থিত বলিয়াই এই প্রকোষ্ঠটী "গম্ভীরা" নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মিশ্রভবনের "তিন দ্বার" সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত আছে,—

তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেল বাহির হইয়া॥

*   *   *   *

এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপরে বোলাইলা কপাট খুলিয়া॥

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীপাদ স্বরূপ কাশীমিশ্রের ভবনেই থাকিতেন, কিন্তু অন্য প্রকোষ্ঠে বা অপর খণ্ডে থাকিতেন। শ্রীপাদ স্বরূপ যে অন্য স্থানে শয়ন করিতেন, তাহার আরও প্রমাণ আছে, যথা,—

একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধ রাত্রি পোহাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥

*   *   *   *

এই মত নানাভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হৈল।
গোসাঞীরে শয়ন করাইয়া দোঁহে ঘরে গেল।

১৭ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

"তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে" শ্রীচরিতামৃতে লিখিত এই পদ্যাংশ দেখিয়া যাহারা মনে করেন যে গম্ভীরা-মন্দিরেই তিনটী দ্বার ছিল, তাঁহাদের বিবেচনার্থ শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা,—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে প্রভু তিনটী দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়া এবং তিনটী উচ্চ ভিত্তি (দেয়াল) উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীপাদ কাশী-মিশ্রের ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মিশ্র মহা-শয়ের বৃহৎ বাড়ীর ক্রমান্তনিবিষ্ট তিনখণ্ড তিনটী উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার ভিতর খণ্ডে একটী গৃহের অভ্যন্তরেই এই গম্ভীরা-মন্দির সংস্থাপিত।

ইহাতে বুঝা যায় শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবনটী অতি বৃহৎ ছিল। আর সেই জন্যই চন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন, "কাশীমিশ্রের ভবনে প্রভুর যে বাসস্থান নির্ণয় করা হইয়াছে উহা উপযুক্তই হইয়াছে।" ফলতঃ শ্রীল প্রতাপরুদ্র দেব কাশীমিশ্রের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান-কালে প্রত্যহ মিশ্র মহাশয়ের পাদ-সংবাহন করিতেন যথা শ্রীচরিতামৃতে—

এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তার ঘরে॥

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদ-সংবাহন।
জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥
মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের পরমভক্তির পাত্র শ্রীপাদ কাশীমিশ্রের ভবন যে সুবৃহৎ ছিল, এবং উচ্চ তিনটী প্রাচীরে যে উহার বহিঃখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং অন্তঃখণ্ড পরিবেষ্টিত ছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গম্ভীরা-মন্দির কেমন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরটী কেবল নামমাত্রই মহাপ্রভুর শয়নাগার বা বিশ্রামাগার বলিয়া অভিহিত হইত। কার্য্যতঃ তাহা মহাপ্রভুর তীব্র শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনা বা বলবতী উৎকণ্ঠার লীলাস্থলীতে পরিণত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্ত্যলীলা-সূত্র

সন্ন্যাসগ্রহণান্তর তীর্থভ্রমণ সন্ন্যাসিগণের শাস্ত্রসম্মত চিরন্তনী রীতি। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও এই নিয়ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পরেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের অনুরোধে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে নীলাচলে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল, অতঃপরে তিনি যদিও গৌড়ের পথে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন, কিন্তু বিপুল লোকসঙ্ঘ তাঁহার অনুগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি শ্রীপাদ সনাতনের বাক্য স্মরণ করিয়া কানাইর নাটশালা নামক স্থান হইতে আবার ফিরিয়া নীলাচলে আসিলেন। অতঃপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি নীলাচল হইতে আর কুত্রাপি গমন করেন নাই। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা।
আঠার বর্ষ বাস, কাঁহা নাহি গেলা॥
প্রতিবর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥

নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ॥

এই সময়ে যাঁহারা প্রভুর নিত্যসহচররূপে বিরাজমান ছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাঁহাদেরও নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা,—

পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস॥
জগদানন্দ ভগবান্ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি॥

এই সময়ে প্রতি বর্ষেই গৌড়ীয় ভক্তগণ রথের সময়ে নীলাচলে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইতেন, আর নীলাচলে তখন প্রেম-ভক্তির সাগরতরঙ্গ বহিয়া চলিত। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস॥
প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁহা সভা লইয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস॥

এই সময়ে হরিদাসনির্য্যাণ, ছোট হরিদাসের দণ্ড, দামোদর পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড, শ্রীপাদ সনাতনের পুনরাগমন, গৌড়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রেরণ, শ্রীবল্লভভট্ট মিলন, প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-ব্যপদেশে শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহিমপ্রচার, গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ, মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-

জ্ঞানে স্তবন, শ্রীমদ্দাসগোস্বামীকে শ্রীপাদ স্বরূপের হস্তে সমর্পণ, জগদানন্দের অভিমান-ভঞ্জন ইত্যাদি ঘটনা অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অন্তর্গত।

শেষ-দ্বাদশ বৎসরের লীলা অতি গম্ভীর, অভূতপূর্ব্ব ভক্ত-হৃদয়বিদারক ও অতি অদ্ভুত। পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্ত্যেমুখ শির ঘষে—ক্ষত হয় সব॥
এমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে সদা হা হুতাশ॥
"কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥"

এমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

২য় পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ-বিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে॥
উৎকট বিয়োগ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণ-কথা স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভু রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে রয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখ দান হেতু তৈছে রামরায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোস্বামী রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ॥
এই দুই জনের সৌভাগ্য কহনে না যায়।
"প্রভুর অন্তরঙ্গ" বলি যারে লোকে গায়॥

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

অন্ত্যলীলায় শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের সেবা-ভার কি প্রকার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গম্ভীরায় প্রেমভক্তির যে তরঙ্গ উঠিত, এই অন্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদদ্বয় পূর্ণমাত্রায় তাহার আস্বাদন করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণের সহিত ইঁহাদের এই সুমধুর সম্পর্কের কিঞ্চিৎ ভাব প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীচরিতামৃতে পুনঃ পুনঃই এই ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা অন্যত্র :—

এইরূপে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে॥
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গ।
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ॥

৯ম পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

প্রেমিক ভক্ত-পাঠক উদ্ধৃত চারি পংক্তির শেষ দুই পংক্তির প্রতি মনোনিবেশ করুন, প্রভুর অন্তরে বাহিরে অনুক্ষণই কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ও মন নানাভাবে ব্যাকুল। এই অত্যদ্ভুত মহাগম্ভীর প্রেমচরিত্রের তুলনা বোধ হয় শ্রীবৃন্দাবনেও অপ্রাপ্য। শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত আছে—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামরায় যে এই অভূতপূর্ব্ব মহীয়সী লীলার প্রধানতম সাক্ষী, এই দুই ছত্রেও তাহার প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে।

এই সময়ের আরও গূঢ় রহস্যময় ঘটনার বিষয় শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে যথা,—

১। ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর॥
সপ্তদ্বীপে নব খণ্ডে বৈসে যত জন।
নানাবেশে আসি করে প্রভুর দর্শন॥
প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুক আদি মুনিগণ।
প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন॥
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।
"কৃষ্ণ কহ" বলে প্রভু বাহির হইয়া॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এই মত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে॥

৯ম পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

২। এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গের ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তনবিলাস॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥

এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে না সামায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার—রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রে দিনে করে দুঁহে প্রভুর সহায়॥

১১শ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

শ্রীচরিতামৃতে আরও লিখিত হইয়াছে—

এইরূপ মহাপ্রভুর বিরহ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর॥
"হা কৃষ্ণ, হা প্রাণনাথ, মুরলী বদন।
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"
রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥

১২শ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

সমগ্র অন্ত্যলীলা এইরূপ মহাভাবের অব্যক্ত অথচ বিশাল মহাপ্রবাহে পরিপ্লুত ও তরঙ্গায়িত—এ প্রবাহের বিরাম নাই,—এ তরঙ্গের বিশ্রাম নাই,—শ্রীরাধা-প্রেমসাগরের এমন অসীম অনন্ত কল্লোল, শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রীল চণ্ডীদাসের চিরস্মরণীয় প্রেমপদাবলীতেও প্রেমের এমন অদ্ভুত উচ্ছ্বাস, অবিরাম প্রবাহ এবং অনন্ত তরঙ্গ কল্লোল প্রত্যক্ষ করি নাই। পতিপ্রাণা সাধ্বীসতীর যৌবনে বৈধব্যজনিত বিষাদময়ী শোক-গীতি বহুবার

শুনিয়াছি, পুত্রশোকাতুরা স্নেহময়ী জননীর মর্ম্মভেদি করুণ-ক্রন্দনেও এ হতভাগ্যের কর্ণ বহুদিন জর্জ্জরিত হইয়াছে, কিন্তু গম্ভীরায়—কখন উচ্চরবে, কখন ক্ষীণ করুণ স্বরে কখন বা মহারবে কখন বা বিনাইয়া বিনাইয়া বিরহ-বেদনার যে তীব্র হাহাকার ও হা হুতাশের অবিরাম অনন্ত ধ্বনি উত্থিত হইত,—ফুল্লারবিন্দ-নয়ন-নিসৃত অশ্রুমালার যে অজস্র প্রবাহ প্রবাহিত হইত, জগতের অপর কোন স্থলে কখনও তাদৃশ ঘটনা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই। সেই ধ্বনির অতি অস্পষ্ট ও পরিক্ষীণ ঝঙ্কারাভাস শ্রীচরিতামৃতের প্রলাপ-পদবর্ণনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় সেই প্রেমাশ্রুমন্দাকিনীর অতি সুদুর্লভ চিত্রের ছায়াভাস কৃপা করিয়া জীবসাধারণের নিমিত্ত স্বীয় গ্রন্থে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিকভক্ত পাঠকমহোদয়গণ সেই চিত্রেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহাভাবের প্রতিচ্ছবির যৎকিঞ্চিৎ আদর্শ সন্দর্শন করিয়া এই মরজগতেও শ্রীবৃন্দাবনের সুধারসের আস্বাদনে অমরতালাভ করেন। আমরা এস্থলে প্রেমিক ভক্তগণের শ্রীচরণরেণু সম্বল করিয়া আত্মসংশোধনার্থ শ্রীল কবিরাজের বর্ণনার কণামাত্র স্পর্শ করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি। ভক্তগণ কৃপাশীর্ব্বাদ করুন, মনোবাঞ্ছা কিঞ্চিন্মাত্রও যেন ফলবতী হয়, ইহাই এ দীনের কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা ব্রজ-রসসুধার্ণবেরই উত্তাল তরঙ্গ। ব্রজ-রসসুধাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী কে, এই প্রশ্নের

উত্তম মীমাংসা এই দিব্যোন্মাদলীলাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই মহীয়সী লীলায় আমরা তিনটী অত্যুজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন পাই—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রামানন্দ রায়। শ্রীচরিতামৃতের বহুস্থানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

ব্রজরসাস্বাদনের অধিকারী।

১। স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥

২। এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ সনে॥
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক-পঠন॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥

৩। স্বরূপ গোসাঞীকে কহে—গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়েত সংবিৎ॥
শুনি স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা॥

৪। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

৫। কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপিকার বচন॥

৬। এতেক প্রলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায় ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপ রাত্রিদিন যায়॥

৭। রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সখীজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিল।
এই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল॥

৮। এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচল।
রজনী দিবস কৃষ্ণ-বিরহ বিহ্বল॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজনার সনে।
কৃষ্ণকথা কহে প্রভু আনন্দিত মনে॥

৯। যদ্যপিহ প্রভু কোটি-সমুদ্র-গম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদন দুই বন্ধু সনে॥

গম্ভীরা-লীলায় সর্ব্বত্রই এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের সুধামধুর প্রসন্নগম্ভীর মহাভাবের প্রতিচ্ছবি বিরাজিত। গম্ভীরা-লীলায় ব্রজরসসুধা-

আস্বাদনের গুরুগম্ভীর ব্যাপারে এই তিনজন ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায় ভিন্ন এমন সৌভাগ্য ও এমন অধিকার আর কাহারও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চিত্ত নির্ব্বিকার না হইলে—বিষয়বিরক্ত না হইলে—ভাবের সঞ্চার হয় না। ভাবের সঞ্চার ব্যতীত রসের উদ্রেক হয় না। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজরসের উদ্গম অসম্ভব। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত প্রেমিক সন্ন্যাসী, শ্রীপাদ রামরায় সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসীর উপদেষ্টা এবং কার্য্যতঃ নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক সন্ন্যাসী। কাম বা প্রাকৃত জগতের ভাব ইঁহাদের চিত্তের ত্রিসীমাতেও প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইঁহারাই এই রসের প্রকৃত অধিকারী।

সন্ন্যাসের কঠোরতায়, নির্ম্মল ব্রজরসের উৎস উৎসারিত হয়। যেখানে সন্ন্যাসের কঠোরতা নাই, সেখানে জীবের পক্ষে ব্রজরসের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। কিন্তু শুষ্ক সন্ন্যাস ব্রজরসের একান্ত প্রতিকূল। কঠোর সন্ন্যাসে ও শুষ্ক সন্ন্যাসে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রেমের সন্ন্যাস কঠোর হইয়াও সরস—নিত্য সরস। কেননা, "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতির বিষয় যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—তিনিই প্রেমিক সন্ন্যাসীর নিত্য উপাস্য এবং ধ্রুবতারার ন্যায় একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তাদৃশ সন্ন্যাসী বিষয়ব্যাপারে একান্ত বিরক্ত হইলেও তাঁহার চিত্ত ব্রজরসের পূর্ণ উৎসে নিরন্তরই পরিষিক্ত থাকে। শুষ্ক জ্ঞানীদের সাধ্য ও সাধনা ইহার বিপরীত—সুতরাং ব্রজরসের

সুধাস্বাদে বিষয়ী বা শুষ্ক সন্ন্যাসীর আদৌ কোন অধিকার নাই। কিন্তু ব্রজরসের কণামাত্র লাভ করিতে হইলেও যে বিষয়সন্ন্যাস একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কারণ নাই। বিষয়বিষে জর্জ্জরিত লোকের ভাগ্যে কথনও ব্রজরস সুধাস্বাদনের অধিকার হয় না। এমন কি তাদৃশ চিত্ত শ্রীভগবানের রাসলীলা-শ্রবণেও অধিকারী নহে। শ্রীভাগবতের রাসলীলার ব্যাখ্যার উপক্রমে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন,—

"অথমূলে শ্রীবাদরায়ণিরুবাচেতি বক্ষ্যমাণ মহামহিম্নঃ প্রসঙ্গস্যাস্য বলাৎ তদিদং লক্ষয়তি,—বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাৎ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ তচ্চতপঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনলক্ষণমেব সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরমোত্তমে তস্মিন্নেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ। তস্যচ তাদৃশস্তপঃফলরূপঃ পুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বশ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যদ্যপি স্ফুরতি তথাপি তন্নামনিরুক্তের্মাহাত্ম্যপর্য্যবসানমত্রৈব জাতং ততস্তাদৃশ ভক্তেরেবৈতচ্ছ্রোতব্যমিদমিতিব্যঞ্জিতম্।"

ফলতঃ কৃষ্ণোপাসনলক্ষণতপশ্চরতপস্যাজনিত যে ভক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তির আশ্রিত ভক্তজন ভিন্ন অপরের রাসলীলা-শ্রবণের অধিকার জন্মে না। যেরূপ শ্রদ্ধা সহকারে রাসলীলা শ্রবণ করিবার বিধি আছে, সে শ্রদ্ধা সহজে উপজাত হয় না। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে সাধনার একান্ত প্রয়োজন।

স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অন্ত্য দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া যে ব্রজরস আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে তিনি স্বীয় চরিত্রটীকে কি প্রকারে লোক-শিক্ষার্থ ভক্তসমাজে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন, এস্থলে

তাহার দুই একটী কথা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে,ব্রজরসাস্বাদনের নিমিত্ত চিত্তকে প্রস্তুত করিতে হইলে কি প্রকার সাবধানতা, কি প্রকার বিষয়-বৈরাগ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় কি প্রকার চিত্তাভি-নিবেশের প্রয়োজন।

মহাপ্রভু স্বয়ং স্বকীয় লীলাতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনিও ভক্ত-শাসনাধীন হইয়া চলিতেন। তিনি লোকশিক্ষার্থ প্রকারান্তরে রামচন্দ্রপুরীকে তাঁহার শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রভুর এই লীলায় রামচন্দ্রপুরী ভক্তগণের নিন্দাভাজন ও ক্রোধের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন; ফলতঃ উহাতে রামচন্দ্রপুরীর কোনও দোষ ছিল না, উহা প্রভুরই লীলামাত্র। পুরী মহাশয়ের কি কি কার্য্য ছিল শুনুন,—

প্রভুর স্থিতি-রীতি-ভিক্ষা-শয়ন-প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান"

পুরী বলিতেন—

সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়-বারণ॥

কিন্তু—

যত নিন্দা করে তেঁহ প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥

পুরীপাদের অনুসন্ধান বৃত্তিটা কেমন প্রখরা ছিল, তাহার একটা উদাহরণের কথা শুনুন,—পুরী মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে প্রভুর বাসগৃহে আসিয়া কয়েকটী পিপীলিকা দেখিতে পাইলেন। পুরী-পু

পাদের সম্ভবতঃ ন্যায়শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। নৈয়ায়িকেরা ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করেন। রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকা দেখিয়াই শর্করার অনুমান করিলেন। কেবল ইহাই প্রচুর নহে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে রাত্রিকালে চিনি খাইয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অনুমিতির অকাট্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, তিনি নিন্দা করিয়া বলিলেন,—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসা!"

অর্থাৎ "এই যে এখানে কতকগুলি পিপীলিকা দেখা যাইতেছে, রাত্রিকালে অবশ্যই এখানে চিনি ছিল। অহো বিরক্ত সন্ন্যাসীর এতই কি ইন্দ্রিয়লালসা!" মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সম্মুখে এই কথা বলিয়া পুরীমহাশয় চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর বাক্য শুনিয়া বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্য গোবিন্দদাসকে ডাকিয়া বলিলেন :—

আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের একচৌত্রিশ পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বহি আর অধিক কভু না আনিবা।
অধিক আনিলে আমায় হেথা না দেখিবা॥

ফলতঃ এই দিন হইতে মহাপ্রভু অর্দ্ধাশনে দিনরজনী যাপন করিতেন, ইহাতে ভক্তগণের দুঃখের অবধি ছিল না। রামচন্দ্র-পুরী কয়েকদিবস পরে এই কথা শুনিয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন, আসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—শুনিলাম তুমি নাকি আমার কথায় অর্দ্ধাশনে কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু দেখ—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ॥
তোমাকে ক্ষীণ দেখি, বুঝি কর অর্দ্ধাশন।
এহো শুষ্ক-বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥

ইহা বলিয়াই প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার "যুক্তাহারবিহারস্য" শ্লোক পাঠ করিলেন।

বিষম ব্যাপার! বেশী ভোজনেও দোষ, কম ভোজনেও দোষ, প্রভু নিরীহ ভাল মানুষ। তিনি ঢল ঢল চক্ষু করিয়া পুরীপাদের মুখের দিকে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিলেন—

—অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥

রামচন্দ্রপুরী আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্ত-মাত্রই রামচন্দ্রপুরীর নিন্দা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ ভক্তগণের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "পুরী-গোসাঞী ঠিক কথাই বলিয়াছেন তাহাতে তোমারা ক্রোধ কর কেন?" যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

সতে কেন পুরীগোসাঞীর প্রতি কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ॥
যতি হঞা জিহ্বা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতি ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥

এরূপ কত উপদেশ প্রভু নিজেও শ্রীমদ্দাসগোস্বামিমহোদয়কে প্রদান করিয়াছিলেন।

আবার প্রভুর অপর শাসনকর্ত্তার কথা শুনুন—ইনি দামোদর, স্বরূপদামোদর নহেন,—দামোদর পণ্ডিত। ইঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ-ব্যবহার॥
প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্য দণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন॥

ছোট হরিদাস ভক্তিময়ী মাধবী দাসীর নিকট হইতে প্রভুর সেবার তণ্ডুল পরিবর্ত্তন করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই জন্য প্রভু হরিদাসকে চিরদিনের তরে বর্জ্জন করিয়া বলিলেন :—

প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
—আমি তার না হেরি বদন॥

দামোদর পণ্ডিত এতাদৃশ যতীন্দ্রচূড়ামণিরও সতর্কতা-করণার্থ কিরূপ বাক্য-চ্ছটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও শুনুন। প্রভুর নিকট একটী উড়িয়া ব্রাহ্মণ বালক আসিত। প্রভু তাহাকে স্নেহ করিতেন, বালকদের প্রতি তাঁহার এইরূপ স্নেহই ছিল। বালকেরা যেখানে স্নেহযত্ন পায়, সেইখানে পুনঃ পুনঃ আসিয়া থাকে। কিন্তু মহাপ্রভুর নিকট এই বালকটীকে দেখিতে পাইয়া দামোদর পণ্ডিত মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতেন। একদিবস সেই বালকটী আসিল, মহাপ্রভু উহাকে প্রীতিময় সম্ভাষণে স্নেহ দেখাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালকটী চলিয়া গেল, তৎপরে দামোদর পণ্ডিত-মহাশয় প্রভুর প্রতি যে বাগ্‌দণ্ড প্রয়োগ করিলেন, তাহা অতি ভীষণ। দামোদর মুখ নাড়িয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিতেছেন—

অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞীর ঠাঁই।
গোসাঞী গোসাঞী এবে জানিব গোসাঞী॥
এবে গোসাঞীর গুণ যশ সব লোকে গাইবে।
তবে গোসাঞীর প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে॥

মহাপ্রভু সহসা দামোদর পণ্ডিতের মুখে এই মৃদু-বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, তিনি ইহার কোনও অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—"দামোদর, তুমি কি বলিতেছ! তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না!" দামোদর বলিলেন :—

—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে?
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকেরে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোকের কাণাকাণি বাদে দেহ অবসর?

দামোদর এই বলিয়া নীরব হইলেন, লোকাপেক্ষা রক্ষক প্রভু সেই দিন হইতে এবিষয়েও সাবধান হইলেন।

সাধন-মার্গাবলম্বীদের পক্ষে যে কতপ্রকার সাবধানতার প্রয়োজন, পরম দয়াময় প্রভু স্বীয় লীলায় এই সকল ঘটনা প্রকটন করিয়া শিক্ষা-বিধানের সদুপায় করিয়া রাখিয়াছেন। জগতের সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ লাভালাভ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রাগবিদ্বেষ পরিবর্জ্জন করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন ভিন্ন যে ব্রজরস-সম্ভোগ একেবারেই অসম্ভব মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় তাহার সম্যক্ উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত রসসম্ভোগী জনগণের পক্ষে শান্তিরস-লাভই অপ্রাপ্য—ব্রজরস লাভ তো বহু দূরের কথা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-নিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের বিষয়-লালসার বীজ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের অনল-শিখায় ভস্মীভূত হইয়া পরে, বৈরাগ্যের প্রবল প্রভঞ্জনে সেই ভস্ম-রাশি সুদূরে উড়িয়া যায়; অবশেষে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় হৃদয় পরিপ্লুত হইলে উহাতে কৃষ্ণ-প্রেমের উৎস উৎসারিত হয় এবং তাহার সঙ্গেসঙ্গেই ব্রজরস উথলিয়া উঠে।

বিষয়াসক্ত চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম স্থান পায় না। চিত্ত-বৃত্তি ভগবদ্বহির্মুখী হইয়া যতদিন বিষয়-সুখ-সম্ভোগে ব্যাপৃত থাকে, সুধাময় ব্রজ-রসাস্বাদনে ততদিন জীবের আদৌ অধিকার জন্মে না। তাই শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

> বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
> কবে হাম হেরিব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥

ভক্ত কবি বলিয়াছেন :—

> বিষয়াসক্তচিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
> বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের পদার্থ যেমন পশ্চিমদিকে যাইয়া খুঁজিলে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত-চিত্তেরও কৃষ্ণাবেশ অসম্ভব। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এ সম্বন্ধে নিজে কি বলিয়াছেন তাহাও শ্রবণ করুন, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত হইয়াছে :—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য।
পারং পরং জিগিমিষোর্ভবসাগরস্য
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।

অর্থাৎ ভব-সাগরপর-পারগামী ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসন্দর্শন ও বিষয়িসন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অশুভ ফলপ্রদ। এক মনে যুগপৎ দুই ভাবনা স্থান পাইতে পারে না। বিষয় ভাবনা ও ভগবদ্ভাবনা যুগপৎ সিদ্ধ হয় না। এক বিষয়ব্যাপারই অনন্ত ভাবনার সমষ্টি। উহার অন্তর্গত এক ভাবনার প্রকাশে অপর ভাবনা অন্তর্হিত হয়, এক ভাবনার পুষ্টিসাধনে অপর ভাবনা পরিক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্রজ-রসাস্বাদনের নিমিত্ত বিষয়-সন্ন্যাস অতি প্রয়োজনীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যেক ঘটনা হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমে সন্ন্যাসী সাজিলেন, তিনি জীব-শিক্ষার নিমিত্ত সন্ন্যাসের অতি তুচ্ছ নিয়মগুলি পর্য্যন্ত স্বকীয় লীলায় অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রতিপালন করিলেন। এস্থলে দুই একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন।

পরম প্রিয়তমা পতিব্রতা রমণী যেরূপ স্বামীর সেবা করেন, জগদানন্দ তাদৃশ নিষ্ঠার সহিত মহাপ্রভুর সেবা-ব্রতে লিপ্ত থাকিতেন। মহাপ্রভু যে নরলীলাবলম্বনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন, তিনি যে শাস্ত্রমর্য্যাদারক্ষণশীল এবং জীবগণের পারত্রিক শিক্ষা প্রদান করিতে অবতীর্ণ, প্রীতিময় জগদানন্দ প্রীতির আধিক্যে সে কথা ভুলিয়া যাইতেন। কি উপায়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্বচ্ছন্দে থাকে, কি প্রকারে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কোন ক্লেশ না হয়, পণ্ডিত জগদানন্দ অনুক্ষণ সেই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার মনের মত কার্য্য না করিলে, তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিলে, জগদানন্দ কোপবতী রমণীর ন্যায় মান করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী শ্রীমতী সত্যভামার ভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। পণ্ডিত জগদানন্দের প্রীতিময়ী সেবানুরাগের প্রধান লক্ষ্য ছিল—প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-পরিতর্পণ। কিন্তু প্রভু সন্ন্যাসী; জগদানন্দের সকল অনুরোধ ও সকল প্রকার সেবাগ্রহণ করিলে, পাছে বা শাস্ত্র-বাক্যের অমর্য্যাদা করা হয়, পাছে বা জীব-শিক্ষার পথে কণ্টকরোপণ করা হয়,—এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, পণ্ডিত জগদানন্দের বহুবিধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাসের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতেন এবং এতাদৃশ আচরণই যে ব্রজরস-প্রাপ্তির প্রধান পথ,—জীবদিগের নিমিত্ত এই উপদেশও প্রদান করিতেন।

পণ্ডিত জগদানন্দের সেবানুরাগ ও মহাপ্রভুর আচরণ সম্বন্ধে এখানে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীশচীমাতাকে দর্শন করার নিমিত্ত পণ্ডিত জগদানন্দ

নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নবদ্বীপ অঞ্চলের ভক্তগণের বাড়ীতে তাঁহার শুভাগমন হইয়াছিল। ভক্তগণ জগদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার উল্লেখ আছে, তদ্‌যথাঃ—

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তার মুখে।
আপনা পাসরে সভে চৈতন্য-কথা-সুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যান যেই ভক্ত ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেম-পাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যাঁরে মিলে সেই বলে "পাইল চৈতন্য॥"

এই সময়ে জগদানন্দ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের গৃহে আসিলেন। শিবানন্দ জাতিতে বৈদ্য। কবিরাজী তৈলাদি শিবানন্দের গৃহে প্রস্তুত হইত। জগদানন্দের চিত্তে অনবরতই মহাপ্রভুর চিন্তা। মহাপ্রভু দিবানিশি কৃষ্ণ-প্রেমে ব্যাকুল, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ রুক্ষ, তাঁহার অন্নজলে প্রবৃত্তি নাই। জগদানন্দ মনে করেন, মহাপ্রভু দিনযামিনী অনশনে ও অনিদ্রায় অতিবাহিত করেন, ইহাতে বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হয়। সুতরাং প্রভুর বায়ুপিত্ত-প্রশমনের নিমিত্ত পরমসেবা-পরায়ণ জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ হইতে প্রভুর নিমিত্ত চন্দনাদি তৈল লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত উহা গোবিন্দদাসের হস্তে অর্পণ করিলেন।

গোবিন্দদাস জগদানন্দের অনুরোধ প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু উত্তরে বলিলেন, "সে কি? আমি যে সন্ন্যাসী, তৈল মাখিবার

আমার কি অধিকার আছে? তাহার উপরে ইহা আবার সুগন্ধি তৈল, তৈল ও সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এই তৈল শ্রীজগন্নাথমন্দিরে রাখিয়া আইস—জগন্নাথের সেবকদিগকে বলিও, তাহারা যেন এই তৈল প্রদীপে ব্যবহার করে। এই তৈলে জগন্নাথের প্রদীপ জ্বলিলেই জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল, দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥

গোবিন্দদাস নীরবে চলিয়া গেলেন, পণ্ডিত জগদানন্দকে বলিলেন, "পণ্ডিত আপনার অভিলাষ সফল হইল না।" প্রভু বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।" জগদানন্দ দুঃখিত হইলেন। তিনি গৌড়দেশ হইতে তাঁহার জন্য তৈল বহন করিয়া আনিয়াছেন, প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না শুনিয়া জগদানন্দের মুখকমল পরিম্লান হইল, নয়ন প্রান্তে অভিমানের অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, পণ্ডিত জগদানন্দ নীরবে নয়নজল মুছিলেন, নীরবে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ জগদানন্দের দুঃখে দুঃখিত হইলেন। প্রভুর ভাব ব্যবহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অবিদিত ছিল না। তাঁহার দার্ঢ্য পর্ব্বতের ন্যায় অচল, অটল ও অলঙ্ঘ্য সকলেই তাহা জানিতেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে গোবিন্দ কয়েক দিবস পর্য্যন্ত আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু জগদানন্দের অভিমান, জগদানন্দের

পরিম্লান মুখচ্ছবি, জগদানন্দের যাতনা গোবিন্দদাসের চিত্ত-ক্ষেত্র জুড়িয়া বসিয়াছিল। দশ দিন পরে গোবিন্দ মহাপ্রভুর চরণ-সমীপে কিঞ্চিৎ তৈলসহ অগ্রসর হইয়া মাটির দিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"পণ্ডিতের মনের সাধ,—প্রভু এই তৈল অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া আপন মুখে সে সকল কথা বলিতে পারিতেছেন না।"

গোবিন্দদাসের মুখ হইতে তৈলের কথা বাহির হইতে না হইতেই মহাপ্রভু সক্রোধভাবে বলিলেন "শুধু তৈল আনিলে কেন? একজন তৈল-মর্দ্দক নিযুক্ত কর, নচেৎ এই তৈল রোজ রোজ মাখিয়া দিবে কে? এই সকল সুখ-ভোগ করার জন্যই তো আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি! দেখিতেছি আমার সর্ব্বনাশেই তোমাদের সুখ! পথে চলিবার সময়ে লোকে আমার দেহে সুগন্ধি তৈলের গন্ধ পাইবে। সন্ন্যাসীর দেহে তৈল,—ইহাতে যে লোকে আমায় "দারীয়া সন্ন্যাসী"* বলিয়া ঘৃণা করিবে, তোমরা তাহা ভাবিয়া দেখ কি?"

---

* মুদ্রিত দুই তিনখানি শ্রীচরিতামৃতে "দারী" পাঠ আছে। "দারী সন্ন্যাসী" এই পদের দারী শব্দের অর্থ কি? সংস্কৃতে স্ত্রীবোধক দারা শব্দ আছে, দার শব্দ নাই। যদি তাহা থাকিত তবে "দারী" অর্থ "উপপত্নীযুক্ত" হইতে পারিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় দার শব্দের অর্থ অন্যবিধ। সংস্কৃত ভাষায় "দারী" একটী শব্দ আছে, তাহার অর্থ রোগবিশেষ। হিন্দী ভাষায় "সমরে অপহৃতা রমণীকে "দারী" বলে। এই সকল স্ত্রী অপরের ক্রীতা হইয়া রক্ষিতা পত্নীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিত। কোন কোন হস্তলিখিত গ্রন্থে এই অর্থে "দারীয়া" অর্থাৎ

গোবিন্দদাস অপ্রতিভ হইলেন, তখন নিরাশ ও অকৃতকার্য্য হইয়া জগদানন্দের নিকট যাইয়া সকলকথা খুলিয়া বলিলেন, তাহাতে পণ্ডিত জগদানন্দের অভিমান আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি পরদিবস মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, উপস্থিত হওয়া মাত্রই সেই তৈলের কথা! প্রভু কহিলেন, "জগদানন্দ, তুমি গৌড় হইতে আমার নিমিত্ত তৈল আনিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার কি প্রকারে করিব, জগন্নাথ মন্দিরে এই তৈল পাঠাও, এই তৈল দিয়া জগন্নাথের প্রদীপ জ্বলিবে, তোমার পরিশ্রম সফল হইবে।"

জগদানন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া তৈলের হাড়ীটি আনিলেন এবং প্রভুর সম্মুখে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। জগদানন্দের এত সাধের ও এত শ্রমের সুগন্ধি তৈল মাটিতে পড়িয়া স্রোতের আকারে বহিয়া চলিল। তিনি অভিমানে গর্ গর্ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং দ্বারবদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

দৃঢ়স্বভাব শ্রীগৌরাঙ্গ-ভগবান্ ইহাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। জগদানন্দ তিন দিবস এই অভিমানে উপবাসী রহিলেন। অতঃপরে মহাপ্রভু বহু যত্নে তাঁহার মানভঞ্জন করেন বটে, কিন্তু কিছুতেই মহাপ্রভু সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই।

আবার আর একদিনের ঘটনার কথা বলা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-

"দ্বারীবিশিষ্ট" এই শব্দ লিখিত আছে। আমরা অপর অর্থ না জানায় এই অর্থেই উক্ত শব্দ গ্রহণ করিলাম।

বিচ্ছেদে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ অতি ক্ষীণ, কিন্তু তিনি কদলীপত্রের উপর শয়ন করেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার অপর কোন শয্যা নাই। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় দুঃখে জর্জ্জরিত হইত। জগদানন্দের পক্ষে প্রভুর এই শয়নক্লেশ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি গেরুয়া বস্ত্র দিয়া একখানি সূক্ষ্ম কাপড় রঞ্জিত করিলেন এবং উহাতে শিমুল তুলা দিয়া প্রভুর জন্য একখানি তোষক ও একটি বালিশ প্রস্তুত করিয়া স্বরূপের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার প্রতি সদয় হইয়া আপনাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। যাহাতে প্রভু এই তোষক ও বালিশটী ব্যবহার করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনি ইহাতে প্রভুকে শয়ন করাইবেন। তাঁহার শয়নক্লেশ দেখিয়া আমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। দয়া করিয়া এই কার্য্যটী করিবেন, দেখিবেন যেন অন্যথা না হয়।"

শ্রীপাদ স্বরূপ জগদানন্দের প্রদত্ত তোষক ও বালিশটী লইয়া গম্ভীরায় মহাপ্রভুর শয্যা রচনা করিবার নিমিত্ত গোবিন্দের হাতে দিলেন, স্বরূপের আদেশে গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শয্যা পাতিয়া রাখিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যাস্থলে শরলার পরিবর্ত্তে গৈরিক বস্ত্রের এক তোষক ও একটা বালিশ শোভা পাইতেছে। গম্ভীরার দ্বারের সম্মুখে স্বরূপ গম্ভীর ভাবে অবস্থান করিতেছেন। গোবিন্দও সেই স্থানে বসিয়া আছেন। শয্যা দেখিয়াই মহাপ্রভুর চিত্তে ক্রোধের উদয় হইল। তিনি গোবিন্দকে রুষ্টভাবে বলিলেন, "গোবিন্দ একি! এখানে এ তোষক বালিশ কেন, এ কার্য্য কাহার?" গোবিন্দ

ভীতভাবে বলিলেন ; "প্রভো, পণ্ডিত জগদানন্দ আপনার শয়নক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না, তাই তাঁহার একান্ত প্রার্থনা, আপনি এই শয্যায় শয়ন করুন।" শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর দেখিলেন, তাঁহার যাহা বক্তব্য, গোবিন্দ তাহা বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি কিছুই বলিলেন না। মহাপ্রভু জগদানন্দের নাম শুনিয়া সঙ্কুচিত হইলেন, জগদানন্দের অভিমান বড় সহজ নহে, প্রভু তাহা জানেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, তাঁহার যতই প্রিয়তমের অনুরোধ উপরোধ হউক না কেন, তিনি দৃঢ় বাক্যে ও বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গোবিন্দ এ সকল দূর করিয়া ফেল, কলার শরলা পাতিয়া দাও।" গোবিন্দ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিলেন। মহাপ্রভু শয়ন করিলেন।

স্বরূপ দেখিলেন এখন যদি তিনি দুই একটী কথা না বলেন, তবে পণ্ডিত জগদানন্দের অনুরোধ বিফল হয়। কিন্তু প্রভুর দৃঢ়তা স্বরূপের অবিদিত নহে। তথাপি কর্ত্তব্যতার দায়ে তিনি অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "দয়াময় তোমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই হইবে, ইহাতে আমাদের কিছু বলাই বাহুল্য। তবে একটা কথা এই যে, ইহাতে জগদানন্দের অত্যন্ত দুঃখ হইবে, সুতরাং তাঁহার মনের দিকে চাহিয়া এই শয্যা অঙ্গীকার কর।"

দৃঢ়চিত্ত প্রভু স্বরূপের অনুরোধে আরও উত্তেজিত হইয়া বক্র-উক্তিতে বলিলেন "স্বরূপ, শুধু তোষক বালিশ কেন, একখানি খাট আন, খাটে এই শয্যা করিয়া দাও, তবেত তোষক বালিশ শোভা পায়! জগদানন্দ আমাকে বিষয়ভোগ করাইতে অভিলাষী

হইয়াছে! আমি সন্ন্যাসী মানুষ; ভূমিতলই আমার উত্তম শয্যা। আমার খাট তোষক বালিশে কি প্রয়োজন! সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সকল শয্যা ব্যবহার করা পাপজনক। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট তুলা বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥

পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়। এদেশে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিলেই "মাথামুড়ানের" কথা বলা হয়। প্রভু এ স্থলে ঠিক্ তাহাই বলিতেছেন; "আমি সন্ন্যাসী, ভূমিতলই আমার শয্যা।" সন্ন্যাসীর পক্ষে খাট তোষক ও বালিশ ব্যবহার করা পাপজনক ও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

স্বরূপ আর বাক্য করিলেন না, তিনি জগদানন্দের নিকট আসিয়া প্রভুর কথা বলিলেন। জগদানন্দের মন ভারাক্রান্ত হইল, হৃদয় দুঃখে ও অভিমানে পরিপ্লুত হইল। জগদানন্দের মুখ-মণ্ডলে দুঃখের ছায়া প্রকটিত হইয়া পড়িল, পরন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অভিমান ও ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, নয়নকোণে সে আগু-নের জ্বলন্ত শিখা প্রকাশ পাইল; অন্তরঙ্গ ভক্তমাত্রই তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু উপায় নাই! শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

জগদানন্দ ও প্রভুর প্রেম চলে এই মতে।
"সত্যভামা কৃষ্ণের যেন শুনি ভাগবতে॥

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহোই উপমা ॥

যাহা হউক, জগদানন্দের দুঃখ-প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর শুষ্ক কদলীপত্র নখে ছিড়িয়া সূক্ষ্ম করিলেন এবং উহা প্রভুর বহির্বাসে ভরিয়া একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু প্রভু তাহা ব্যবহার করিতেও অসম্মত হইলেন, শত প্রকার আপত্তি তুলিলেন; অবশেষে অনেক অনুরোধ-উপরোধের পরে এই শয্যা অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতেও জগদানন্দ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একটুকু সামান্য তৈল বা একখানি সামান্য বিছানা ব্যবহার করিতেও প্রভু বিষয়ভোগের আশঙ্কার কথা তুলিতেন। এই প্রকার উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ভক্তির সাধনা না করিলে ব্রজরস আস্বাদনে আদৌ অধিকার জন্মে না।

অন্ত্যলীলা ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী। শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ-শ্লোকটী এই :—

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥

এই শ্লোকের তিন প্রকার টীকা দেখিতে পাওয়া যায়, একটী এইরূপ :—

১। অস্মিন্ বিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদে) গৌরস্য (শ্রীমহাপ্রভোঃ) কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজনিতপ্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে, ময়েতি শেষঃ। কিম্ভূতে—প্রভোঃ গৌরস্য অন্ত্যলীলাসূত্রানামনুবর্ণনং যস্মিন্ তস্মিন্।

আর একটী অধিকতর প্রাচীন টীকা এইরূপ :—

২। "অস্মিন্ বিচ্ছেদে (মধ্যখণ্ডস্থ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) অন্ত্য-লীলায়াঃ সূত্রবর্ণনে প্রভোঃ গৌরস্য কৃষ্ণবিরহ-জনিতপ্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে।—অর্থাৎ ময়েতিশেষঃ।"

বলা বাহুল্য, প্রথম টীকাটী অপেক্ষা দ্বিতীয় টীকাটীই অধিকতর পরিস্ফুট ও সুসঙ্গত। দ্বিতীয় টীকায় "অস্মিন্" পদটী পরিস্ফুট হইয়াছে। অপর কথা এই যে প্রথম টীকায় "অন্ত্যলীলা সূত্র-বর্ণনে পদটী "বিচ্ছেদ" (পরিচ্ছেদের) পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। উহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ দাঁড়াইতেছে :—"অন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণন আছে যাহাতে, এমন যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, তাহাতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-জনিত প্রলাপাদির অনুবর্ণন করা হইতেছে।" ইহাতে "অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে" এই পদটী বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়—শ্রীচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী যে অন্ত্য-লীলা-"সূত্রানুবর্ণন"-প্রধান, ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্ত্যলীলায় প্রভুর অনেক লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রলাপবর্ণন ও আছে। উক্ত প্রলাপাদিবর্ণন অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। ফলতঃ মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণন-ব্যপদেশে পরম কারুণিক বৃদ্ধ গ্রন্থ-কার মহানুভাব অন্ত্যলীলার প্রধানতম প্রতিপাদ্য বিষয় প্রলাপাদির অনুবর্ণন করিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এস্থলে তিনি ক্রম-ভঙ্গ করিলেন কেন? অন্ত্যলীলার বিষয় অন্ত্যলীলায় বর্ণন করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া তিনি এই মধ্যলীলায় দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া—অন্ত্যলীলায় বর্ণনীয় প্রলাপাদির বর্ণনা করিলেন কেন? মহানুভাব গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন, যথা :—

শেষ-লীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্র মধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীএে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছাভরি করিব বিচার॥

ইহাতে জানা যাইতেছে, বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামিমহানুভাব মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার প্রলাপাদির কথা ও ভ্রমময় চেষ্টাদির কথা শুনিয়া

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পাছে বা অন্ত্যলীলাসমূহের এই সার অংশ বর্ণনা করার পূর্ব্বে তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়, পাছে বা এই মহা-মহীয়সী লীলা অবর্ণিত থাকিয়া যায়, এই আশঙ্কায় লীলাসূত্রবর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তিনি নিজেই তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন :—

এই অন্ত্যলীলা সার সূত্র মধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ ধন॥

এই আশঙ্কায় মধ্যলীলার সূত্রবর্ণন-ব্যপদেশেই গ্রন্থকার প্রলাপাদির অনুবর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে লিখিয়াছেন :—

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল ইহ যাহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের এই হৃদয়ভরা বলবতী বাসনা মহাপ্রভুর কৃপায় পূর্ণ হইয়াছিল। দয়াময় প্রভু তাঁহাকে সুদীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যলীলায় সূত্রবর্ণনে যাহা লিখেন নাই, অন্ত্যলীলায় তাহা প্রাণ ভরিয়া বিস্তারিত করিয়াছেন। এই লীলা যে ভক্তগণের মহামূল্য সম্পত্তি প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ইহাই যে একমাত্র অবলম্বন, তাহা ভক্তমাত্রেই অনুভব করিতে সক্ষম।

যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম টীকাটী হইতে দ্বিতীয় টীকা-টীই অধিকতর পরিস্ফুট। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের শ্লোক সমূহের আরও একখানি টীকা গ্রন্থ আছে। এই টীকার নাম—বৈষ্ণব সুখদা। এই টীকায় লিখিত হইয়াছে :—

"প্রভো গৌরস্য অন্ত্যলীলায়াঃ শেষখণ্ডস্য যা লীলা তস্যা হৃৎ-সূত্রং দিগ্দর্শনরূপম্—নতু সম্যক্—তস্য অনুবর্ণনম্ যত্র এবম্ভূতেঽস্মিন বিচ্ছেদে প্রভোঃ কৃষ্ণস্যেতি শ্লিষ্টএকস্থানেকার্থত্বাৎ। যদ্বা প্রভোর্বিত্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধেনান্বয়ঃ, গৌরস্যেত্যস্য পরার্দ্ধেন॥"

"অন্ত্যলীলা সূত্রানুবর্ণনে" পদটী ইনিও বিশেষণ ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে এই ব্যাখ্যার উক্ত অংশটুকু আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। ফলতঃ শ্লোকটীর মর্ম্ম এই যে মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলা-সূত্রবর্ণনে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত প্রলাপাদির অনুবর্ণনা করা হইয়াছে।

আরও একটী কথা বলা প্রয়োজনীয়। মূল শ্লোকে "অনুবর্ণন" পদ লিখিত আছে। "অনু" শব্দটী নিরর্থক ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার অর্থ কি তাহাও বিচার্য্য। মেদিনী-কোষে লিখিত আছে :—

অনুর্হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি।
লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাযমুক্রমঃ॥

অর্থাৎ হীন অর্থে, সহার্থে, পশ্চাৎ অর্থে, সাদৃশ্য অর্থে, ভাগ অর্থে, বীপ্সা প্রভৃতি অর্থে অনু শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এখানে অনু শব্দ "হীন" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। "অনু বর্ণতে" পদের

অর্থ "সংক্ষেপে বর্ণিত হইল" বুঝিতে হইবে। গ্রন্থকার অন্যত্রও তাহাই বলিয়াছেন যথা :—

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।

তাহা হইলে এখন বুঝা যাইতেছে যে, মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তলীলার সূত্র-বর্ণন-ব্যপদেশে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত যে প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অন্ত্যলীলায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-মহানুভাব মধ্যলীলার দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে প্রলাপ-বর্ণনে যে সকল সংস্কৃত পদ্য ও বাঙ্গালা প্রলাপপদ্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, অন্ত্যলীলায় সেই সকল পদ্য-পদ্যাদির পুনরুক্তি নাই। সুতরাং এই প্রলাপাদির বর্ণনা করিতে হইলে এই পরিচ্ছেদটী অন্ত্যলীলার অন্ত্য পরিচ্ছেদ গুলির সহিত একত্র পঠিতব্য এবং তৎসহই সমালোচ্য ও সমাস্বাদ্য।

এস্থলে আরও একটী কথা বক্তব্য আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের পূর্ব্বে আরও কতিপয় পরমভক্তিভাজন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-লেখক শ্রীশ্রীচরিতামৃত লিখিয়াছেন। সকলের গ্রন্থে এই লীলা বর্ণিত হয় নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীমদ্দাস রঘুনাথের নিকটেই এই লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে :—

চৈতন্য-লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।

ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, "শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরের কড়চা বলিয়া যে একখানি গ্রন্থের নাম শুনা যায়, বাস্তবিক তাদৃশ কোন গ্রন্থ নাই। শ্রীপাদ স্বরূপ, শ্রীমদ্দাসরঘুনাথকে মুখে যাহা বলিতেন, রঘুনাথ তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তদ্ব্যতীত "স্বরূপের কড়চা" বলিয়া কোন গ্রন্থ কখনও ছিল না।" এ ধারণা ভ্রমাত্মিকা। শ্রীপাদ স্বরূপের যে একখানি কড়চা গ্রন্থ ছিল, শ্রীচরিতামৃতের বহু স্থান হইতেই উহার অতি স্পষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। "শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর গ্রন্থে" তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি। এস্থলে প্রাসঙ্গিক ভাবে এ সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে :—

স্বরূপ গোসাঞী আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা-প্রকাশ॥
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা-গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পঞ্জি টীকা-ব্যবহার॥

শ্রীপাদ স্বরূপ যে সূত্রাকারে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন,

তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামী, রামানন্দরায়মিলনও স্বরূপের কড়চা হইতে বিবৃত করিয়াছেন। এই লীলা-সম্বন্ধে যে শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কড়চাই কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ের একমাত্র অবলম্বন, তাহা শ্রীচরিতামৃতে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়াছে। অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের অন্ত স্থানে লিখিত হইয়াছে :—

রঘুনাথ দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

অন্ত্যলীলার এই প্রলাপাদি ঘটনাগুলি যে, ঐতিহাসিক সত্যের পাষাণ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এ স্থলে কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদচেষ্টা—এবং দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপাদি অতীব অলৌকিক এবং অতীব অদ্ভুত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীভগবানের আর কোনও অবতারের এরূপ ভাবের আবির্ভাব শাস্ত্রে পাঠ করেন নাই, কোনও প্রেমিক ভক্তের এরূপ দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা ও প্রলাপাদির বর্ণনা কুত্রাপি শ্রবণ করেন নাই, তাই লিখিয়াছেন :—

দিব্যোন্মাদ অদ্ভুত ও অলৌকিক।

এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকের লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখি, ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-শিরোমণি॥

শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ অন্ত্যলীলা।

আবার অন্ত্যলীলার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্ ॥

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীগৌরচন্দ্রের অত্যদ্ভুত অলৌকিক লীলা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদচেষ্টা লিখিত হইল। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী, তাঁহার মুখেই সেই লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া অন্ত্যলীলার এই সারভাগ বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে কবিকল্পনা নহে—ইহা যে ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসময় বর্ণনা-বিন্যাস নহে—তাহা সুনিশ্চয়। ইহা যে সত্যব্রত প্রেমিক ভক্তের প্রত্যক্ষদৃষ্ট দৃঢ় প্রমা,—তাহাও নিঃসন্দেহ।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদচেষ্টা ও প্রলাপ যে অদ্ভুত ও অলৌকিক, তাহাতে কাহারও বিতর্ক থাকিতে পারে না। যাহা নিত্য ঘটে না—যাহা অনিত্য, তাহাই আশ্চর্য্য—তাহাই অদ্ভুত। যাহা নিত্যই ঘটিতেছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে—অদ্ভুতও নহে।

বৈয়াকরণকেশরী পাণিনি বলেন :—"আশ্চর্য্য মনিত্যে।"

অর্থাৎ যাহা নিত্য ঘটে না, এইরূপ বিষয় বা ঘটনাই আশ্চর্য্য। পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিক করিয়া লিখিয়াছেন :—

"অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্"।

অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দটী কেবল অনিত্য বুঝাইতেই প্রযুক্ত হয় না ইহাতে অদ্ভুতও বুঝাইবে।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বার্ত্তিককারের অভিপ্রায় খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"ন বক্তব্যম্; অনিত্য ইত্যেব সিদ্ধম্"।

অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ-প্রকাশে আর "অদ্ভুত" বলিয়া স্বতন্ত্র শব্দ যোজনার প্রয়োজন নাই। কেন না—অনিত্য বলিলেই অদ্ভুত অর্থ বুঝায়। সুতরাং যে ঘটনা আর কোথাও দেখা যায় নাই, আর কোথাও শুনা যায় নাই—তাহা অতীব অদ্ভুত।

এই লীলা শুধু অদ্ভুত নহে—ইহা অলৌকিকী। এই জগতে কত মানুষ কত চমৎকার কার্য্য করিয়াছেন, অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ-দশায় যে মহীয়সী লীলা প্রকটন করিয়াছেন, তাহা লোকাতীত, জীবের ক্ষমতাতীত। এমন কি জীবসমূহের জ্ঞানেরও অগোচর। মানুষ যোগবিভূতিতে অনেক প্রকার অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক কার্য্য করিতে পারে,—জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে, আকাশে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু যোগের প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিয়াও যিনি যোগসাধ্য অদ্ভুত কার্য্য অবহেলায় সম্পন্ন করিতে

পারেন, যিনি যোগের অসাধ্য,—মহাযোগীন্দ্রেরও অপ্রাপ্য শ্রীশ্রী-রাধা-প্রেম প্রকটন করিতে পারেন, তাঁহার লীলা বাস্তবিক অলৌকিকী। তাই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্যশক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

ইহারই অনুবাদ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"এই প্রেমা সদা জাগে যাহার হৃদয়ে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥"

নবানুরাগের ভাব ও চেষ্টাদি বস্তুতঃই অলৌকিক ও তর্কাতীত তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেনঃ—

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিও, শুন বিশ্বাস করিয়া॥

প্রেমের আতিশয্যে যে প্রকার চেষ্টা ও প্রলাপাদি ঘটিয়া থাকে, তিনি তাহার উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ—

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ—শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেমালাপ ভ্রমর গীতাতে॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিত না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥

সুতরাং মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ কোনও ক্রমেই অপ্রমাণিক নহে।

কিন্তু ইহাতে সকলের বিশ্বাস না হইতে পারে। তাই তিনি লিখিয়াছেন :—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস।

যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ॥

অতঃপরে ফলশ্রুতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা শুনিলে শ্রোতার যে ফললাভ হয়, তৎজ্ঞাপনের নিমিত্ত পরমকারুণিক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিতে পাইবে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥

ইহার তুল্য সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর মহীয়সী মহালীলা অদ্ভুত ও অলৌকিক বলিয়া বহিরঙ্গগণের প্রত্যয়ার্থ এইরূপ অনেক প্রকার শাস্ত্র-যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এবং অতি প্রলোভনীয় ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উপক্রমে অন্ত্যলীলার সূত্র-সূচী। এই দিব্যোন্মাদ-লীলার সংক্ষিপ্ত অথচ সারমর্ম্ম প্রকটিত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্র্যে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে,—কভু সিন্ধু-নীরে॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে,—চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়,—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে সদা হা-হুতাশ॥
'কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥

কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥"
এই মত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর।
রায়ের-নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

উল্লিখিত পংক্তিনিচয়ে দিব্যোন্মাদ লীলার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। কবিরাজগোস্বামী অন্ত্যলীলায় ইহার বিস্তার করিয়াছেন। এই কয়েকটী ছত্র পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাসম্বন্ধে এখানে একটী সংক্ষিপ্ত সূচী করা যাইতে পারে, তদ্‌যথা—

১। শেষ দ্বাদশ বংসরকাল মহাপ্রভুর নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তি।

২। উদ্ধব-দর্শনে বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধিকার বিবিধ চেষ্টার ন্যায় মহাপ্রভুর বিবিধ দশা।

৩। বিরহোন্মাদ।

(ক) ভ্রমময়ী চেষ্টা।

(খ) প্রলাপময় বাদ।

৪। শ্রীঅঙ্গে ভাবের প্রচার ও প্রভাব—

(ক) ভাবাতিশয্যে রোমকূপে রক্তোদ্গম।

(খ) ভাবাতিশয্যে দন্ত-শিথিলতা।

(গ) ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গের ক্ষীণতা ও স্থূলত্ব।

(ঘ) অনিদ্রা।

(ঙ) ভিত্তিতে শ্রীমুখ-সংঘর্ষণ।

(চ) হস্তপদের অসাধারণ সন্ধি-শিথিলতা।

(ছ) হস্তপদ ও শিরের দেহাভ্যন্তরে সঙ্কোচনবশতঃ কূর্ম্মরূপবৎ প্রতীয়মানতা।

৫। প্রভুর দেহ চিদানন্দময়—প্রাকৃত নহে।

(ক) বাস-ভবনের প্রাচীরত্রয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নিশা ভাগে মহাপ্রভুর বহির্গমন,—সিংহদ্বার ও সিন্ধু-নীরে পতন।

৬। ব্রজভূমি-স্মৃতির প্রবল প্রভাব।

(ক) চটকপর্ব্বতে বৃন্দাবন-ভ্রম ও তদ্দর্শনে ব্যাকুলভাবে ধাবন।

(খ) উপবন দর্শনে বৃন্দাবন-জ্ঞান।

৭। স্বরূপের গান ও রামরায়ের কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ।

(ক) চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দের গান-শ্রবণে সান্ত্বনা।

(খ) রামরায়ের কৃষ্ণকথায় সান্ত্বনা।

৮। হৃদয়বিদারী বিরহ-প্রলাপ।

৯। বাহ্যজগৎ-বিস্মরণ ও অন্তর্দ্দশা-সম্ভোগের আধিক্য।

১০। প্রগাঢ় নীরব তন্ময়ত্ব বা ব্রজরসের পূর্ণাস্বাদন।

অন্ত্যলীলায় উপসংহারে কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং যে সূচী করিয়াছেন, তাহা আরও বিস্তৃত। তদ্যথা :—

চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর হেথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥
তহি মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥

চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তহি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান-বিলাসে।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে॥
তহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তহি মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ॥
সপ্তদশে গাবী মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাই উদ্গম॥
কৃষ্ণের রূপগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
"কাস্ত্র্যঙ্গতে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥
ভাবশাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণগোপী জলকেলি তাহা দরশন॥
তাহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইলা, প্রভু আইলা স্বভবন॥
ঊনবিংশে ভিত্ত্যে-প্রভুর মুখ-সঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি প্রলাপ-বর্ণন॥
বসন্ত রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ-বিবরণ॥

ইত্যাদি বহুবিধ অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারে ব্রজরস-সুধা-সিন্ধুর অনন্ত তরঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিরহ-বিভ্রম

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তিবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মনের দ্বারা শরীরের দ্বারা ও বুদ্ধিদ্বারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই সকল ব্যাপারের লেশমাত্র বলা যাইতেছে।

এই শ্লোকটীর অর্থ বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, কেবল উল্লিখিত বঙ্গানুবাদটী প্রচুর নহে। "কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তি" পদের অর্থ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং সেই বিভ্রান্তিবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কায়মনোবুদ্ধি দ্বারা যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহার লেশাভাস আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই ভাব-গম্ভীর অতি দুর্বোধ লীলারস আস্বাদন করা অতি ভাগ্যবান্ প্রেমিক ভক্তেরই শক্তির আয়ত্ত। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন :—

জয় জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন॥

প্রভুর বিরহোন্মাদ, ভাব-গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে, বর্ণে—চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥

মহানুভব কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি গ্রন্থের উপসংহারেও এই কথাই লিখিয়াছেন যথা :—

প্রভুর গম্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, না পারি বর্ণিতে॥

*   *   *   *

আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার।
জীব হইয়া কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণা ছুইল॥

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্বভাবতই অতি গম্ভীর। মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ লীলাবৈচিত্র্যই বুদ্ধির অগম্য। বিরহোন্মাদ অন্তরঙ্গ-লীলা—এই লীলা বর্ণনে জীবের সামর্থ্য নাই। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন॥

ফলতঃ এই ভাবগম্ভীর একান্ত অন্তরঙ্গলীলা-রসাস্বাদনে শ্রীশ্রী-

ভাগবতী কৃপাই জীবের একমাত্র ভরসা। সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগী, শ্রীগৌরলীলারসে নিমজ্জিত, একান্তী গৌরভক্ত শ্রীমৎ রঘুনাথের নিত্যসঙ্গী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কৃপাতেই এই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি তিনি ইহার গুরুত্ব ও দুরধিগম্যত্ব পদেপদেই অনুভব করিয়া শতধার নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভাবগম্ভীর বিষয়ে প্রবেশ-প্রয়াস আমার ন্যায় নরাধম বিষয়কীটের পক্ষে যে কত বড় দুঃসাহস, তাহা কে না বুঝিতে পারে। কুমারসম্ভবে উমাদেবী যথার্থই বলিয়াছেন :—

মনোরথানামগতি র্ন বিদ্যতে।

অর্থাৎ মনোরথের ত অগম্য স্থান নাই। তাই আমার ন্যায় হিতাহিতজ্ঞানবিহীন দুর্জ্জনের এই দুষ্প্রয়াস। ভক্ত পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন, আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং কৃপা করিয়া এ অধমকে কিঞ্চিৎ শক্তিপ্রদান করিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।

কবিরাজ গোস্বামীর রচিত যে "কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা" শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একটুকু বিশদ ব্যাখ্যা না করিলে "দিব্যোন্মাদ" পদের অর্থ প্রকাশ করা সহজ হইবে না, সুতরাং এস্থলে উহার একটুকু আলোচনা করা যাইতেছে।

"শ্রীস্বরূপদামোদর" গ্রন্থে লিখিয়াছি, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিপ্রলম্ভরসময়ী। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গোপীভাবে প্রেমময় "সত্যং শিবং সুন্দরম্" তত্ত্বের উপাসনা স্বীয় লীলায় প্রকটন করিয়াছেন। বেদান্তের "সত্যং শিবং সুন্দরম্" পদার্থ অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লীলারস-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই বাচক। ব্রজগোপীগণ এই সৌন্দর্য্যসার

রসময় বিগ্রহের উপাসনায় বিভোর থাকিতেন। শ্রীরাধিকা দিন-যামিনী উন্মাদিনীর ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাকিতেন, কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার জগৎস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদন—প্রেমজগতের অদ্ভুত অদ্বিতীয় ব্যাপার। কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ভাব ও রসাস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার। বিরহিণী শ্রীমতীর ন্যায় দিব্যোন্মাদেই গৌরাঙ্গ-লীলার পূর্ণবিকাশ। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই—ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার*॥
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানে প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
শেষ-লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥

* শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর।

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥
রাত্রে প্রলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥
যেই যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥

শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা-মাধুর্য্য রসাম্বুধির অনন্ত বিস্তার ও নিরন্তর উত্তাল-তরঙ্গ-মালার লেশভাসও হৃদয়ে ধারণা করা অসম্ভব। প্রভু, কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার ন্যায় দিবানিশি উন্মত্ত থাকিতেন, প্রবল অনুরাগ ও নিদারুণ উৎকণ্ঠায় বিরহিণীর ন্যায় কত প্রকার চেষ্টা করিতেন, শ্রীরাধিকার বিরহভাবে তিনি বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কত প্রলাপ করিতেন, এইরূপে দিবসের অনেক সময়েই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের বিবিধ স্থানেই মহাপ্রভুর "কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তির" ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মধ্য-লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইয়াছে, আমরা বহুবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি যথাঃ—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যথা উদ্ধব-দর্শনে।
সেই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

আবার অন্ত্য-লীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

অধিরূঢ় ভাব কাহাকে বলে, তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। দিব্যোন্মাদের লক্ষণ অতঃপর বলা হইবে। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের আভাস হৃদয়ে ধারণা করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধার অবস্থা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সখা, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীরাধার হৃদয়ে বিরহ-যাতনা যে অভিনব অদ্ভুত দশায় পরিণত হইয়াছিল, সেই বিবরণ শ্রবণ করা অতি প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতী রাধিকার যেরূপ দিব্যোন্মাদ ও বিভ্রান্তি ঘটিয়া ছিল, শ্রীভাগবতের সেই মধুময়ী লীলা-কথা প্রেমিক ভক্তমাত্রেরই নিরন্তর আস্বাদ্য। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ-লীলায় সেই ভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল।

প্রিয়তম প্রেমিকভক্ত পাঠকগণ, এস্থলে একবার শ্রীকৃষ্ণ-লীলার

মাথুর পদাবলীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসের কথা স্মরণ করুন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি অমরকবিগণের সুধামাখা মাথুর পদাবলীর প্রতি-পদেই যে বিরহ-গীতির হৃদয়বিদারী তপ্তশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে, জগতের অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। তেমন ব্যাকুলতা, তেমন গম্ভীরতা, তেমন সর্ব্বেন্দ্রিয়শোষী বিরহাতিশয্য-বর্ণন-মহিমা আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পদকর্ত্তাদের সেই সকল মাথুর পদাবলী হইতে দুই চারিটী পদ উদ্ধৃত করিয়া ব্রজগোপীদের বিরহ বর্ণনা না করিলে অন্য কোন প্রকারেই আমরা উহার ভাবলেশ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আধুনিক বৈষ্ণব কবি ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামিরচিত দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ হইতে এই সম্বন্ধে কয়েকটী গান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে তদ্‌যথা :—

সখি, কৃষ্ণপ্রেম-সুখসাগরে,—
সদা আমি মীনের মত ডু'বে রইতাম।
তখন আমি দুঃখের বেদন জানতেম না গো॥
ভাবতাম এ সাগর কি শুথাইবে?
আমার এমনি ভাবে জনম যাবে।
(এই বৃন্দাবন মাঝে।)

যখন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তখন কতইবা বাড়িত রঙ্গ।
—(বঁধুর মনে, আমার মনে)
ছিল প্রখর মুখর দুর্জ্জন নিকর,
শারদ ভাস্কর প্রায় গো;—(তখন কতইবা ছিল)

হ'য়ে প্রবলপ্রতাপ, সদা দিত তাপ
লা'গত না সে তাপ গায় গো।—
(কত জ্বালাইত)
তখন শ্যাম নব জলধরে।
সদা থা'কত শীতল ছায়া ক'রে।
—(তাদের সে তাপ লাগবে কেন?)—
সে যে লীলামৃত বরষিয়ে
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে।
ছিল প্রেমবিবাদিনী পাপ ননদিনী
কুম্ভীরিণীর মত ফি'রত ;—
(সে সাগরের মাঝে)
সদা থা'কত তাকেবাকে দেখত তা'কে বাকে
আপনি বিপাকে পড়িত। (পাপ ননদিনী)
আমি ভাসিয়ে বেড়াতাম সখি,
একবার চাইতাম না পালটী আঁখি।
(পাপ ননদিনীর পাশে)
হায় এমন সময়—
দারুণ অক্রূর আসিয়ে অগস্ত্য হইয়ে
গণ্ডুষে গ্রাসিয়ে গেল গো ;
(আমার সুখের সাগর)
সেযে হ'রে নিল ইন্দু, শুখাইল সিন্ধু,
একবিন্দু না রহিল গো। (আমার কপাল দোষে)

সেই সুখের সাগর সখি শুখাইল,

এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল ॥

(তৃষিত চাতকের মত)

আর একটী গানের ভাব এইরূপ :—"সখি, শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ের ধন। তিনি আমায় উপেক্ষা করিয়া কোথায় গেলেন। তিনি যে আমার প্রাণবল্লভ। সখি, আমার একি হইল, কৃষ্ণ-বিরহে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। এখন কি করিয়া প্রাণ ধারণ করি? যাহারে না দেখিলে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও কোটিযুগ বলিয়া মনে হয়, চিত্তে কত উদ্বেগ হয়, এখন তাঁহার মুখখানি না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব। যদি তিনি ছাড়িয়া গেলেন, তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি? এখন আমি কি করি, কোথা যাই।"

নিত্যসহচরী ললিতা পার্শ্বে বসিয়া শত প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীরাধার সান্ত্বনা হইল না, সান্ত্বনার শিশির-সম্পাতে বিরহের ভীষণ দাবানল নিভিল না, বালুকার বাঁধে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস থামিল না। শ্রীরাধার বিরহ-যাতনা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তিনি নয়নজলে বদনকমল পরিষিক্ত করিয়া গদ্‌গদস্বরে ললিতাকে বলিতেছেন :—

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল, সজনি!

আমার বিচ্ছেদ জ্বালায়, প্রাণ জ্বালায়

কিবা দিবা কি রজনী, গো সজনি।

কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্য জীবন হলো প্রেমশূন্য

আমার যথা গৃহ তথারণ্য

মরিলে বাঁচি এখনি—গো সজনি।

শ্রীরাধা, গত সুখসৌভাগ্যের কথা মনে করিয়া হৃদয়ের দ্বার উঘাড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—

সখি, আমি এই ব্রজমাঝে রমণী সমাজে

ছিলাম শ্যামগরবিনী গো, সজনি ;

হলো দারুণবিধি বাম, হারাইলাম শ্যাম

হ'লাম প্রেম-কাঙ্গালিনী গো—সজনি।

সখি গরল খাইয়ে মরি কিংবা বিষধর ধরি

নইলে অনলে প্রবেশ করি

ত্যজিব জীবন এখনি, সজনি।

যখন বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে দেখি

তখন যেন প্রাণ সই গো।

ও সে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি"

দিয়ে গলে পীতাম্বর বলে পীতাম্বর

"রাধে বিধুমুখি

একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি"

অমনি দেখি ব'লে যদি আঁখি মেলে দেখি

দেখি দেখি করি পুন নাহি দেখি

না দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি

একি দেখি, বল দেখি!

এই বলিয়া কাননাভিমুখে শ্রীরাধা পাগলিনীর ন্যায় ধাবিতা

হইলেন, তিনি কিয়দ্দূরে যাইয়া কুররীর ন্যায় কাতরস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন :—

কোথা রহিলে প্রাণনাথ, ওহে নিঠুর মুরলীবদন।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, ওহে নিঠুর মুরলীবদন॥

প্রেমিক ভক্ত-পাঠক, এস্থলে একবারে সেই শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর রচিত "অয়ে দীনদয়ার্দ্রনাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্যসে" পদটী স্মরণ করুন।

ললিতা শ্রীরাধার নিত্যসহচরী। গৃহে ও অরণ্যে বিরহে ও মিলনে ললিতা শ্রীরাধার মর্ম্ম-সখী। ললিতা শ্রীরাধার প্রেমমহিমা দেখিয়া বলিতেছেন:—

দেখ দেখি বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা।
ত্রিভুবনে রাধাপ্রেমের কেবা পায় সীমা॥
বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে।
কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহ-বলে॥
কিন্তু কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর।
দেখ না চলিতে প্যারী কাঁপে থর-থর॥
এলায়ে পড়েছে ধনীর সুদীঘল কেশ।
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী বেশ॥
চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায়।
ডেকে বলে প্রাণনাথ রহিলে কোথায়॥

শ্রীরাধা বাহ্যজ্ঞানহীনার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ললিতা বলিলেন :—

ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনী।
অমন্ করে ধ'াসনে ধ'াসনে ধ'াসনে গো ধনি।
(তোরে বারে বারে বারণ করি রাই !)
(ধীরে ধীরে চল গজগামিনী)
একে বিষাদে তোর কৃশতনু
মরি মরি হাটিতে কাঁপিছে জানু গো
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণপাবি
(চঞ্চলা হইলি কেন !)
না জানি কোন গহনবনে প্রাণ হারাবি ॥
কত কণ্টক আছে গো বনে
ও রাই ফুটিবে দুটি চরণে
কত বিজাতী ভুজঙ্গ আছে
ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো।
(গহন-কানন মাঝে)
হলো নয়নধারায় পিছল পথ :—
(আর কাঁদিসনে গো, বিনোদিনী)
বলি ধ'াসনে রাধে এত দ্রুত গো।
মোদের কাঁধে দুটি বাহু থুয়ে ;—
কমলিনী চলগো পথ নিরখিয়ে ॥
(আমরা তো তোর সঙ্গে যাব)

এ স্থলে শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত নিম্নলিখিত পংক্তি নিচয়ে প্রিয় পাঠকগণ একবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিত্র দর্শন করুন তদ্‌যথাঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটক পর্ব্বত দেখিল আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধন-শৈলজ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইঞা চলিলা॥

*　　　*　　　*

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥

*　　　*　　　*

প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব যেন হৈল চলিতে নাই শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তাহার উপরে রোমোদ্গাম কদম্ব-প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর,—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনার ধার॥
বিবর্ণ, শঙ্খের প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা॥

মহাপ্রভুর মহাভাব অতি গম্ভীর,—এ চিত্র অতি অদ্ভুত অলৌকিক ও বিস্ময়জনক। আমরা এই সকল কথা অতঃপর বলিব।

এ স্থলে কৃষ্ণকমলের "দিব্যোন্মাদ" যাত্রা গানের আরও দুই একটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কৃষ্ণকমল গোবিন্দ দাসের একটী পদের অনুকরণে লিখিয়াছেন :—

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে।
(যা যা করতে যে হবে গো,—
সখি আমার বঁধুর লাগি।)
জানি প্রেম করে রাখালের সনে,
ফিরতে হবে বনে বনে গো
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্কমাঝে।—(সখি আমার
যেতে যে হবে গো ;—রাই বলে বাজালে বাঁশী)
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতাম ;—
(সখি আমার চলতে যে হবে গো ;—
বঁধুর লাগি পিছল পথে)
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে, শিখিতাম।

(সদা আমার ফিরতে যে হবে গো,

কত কণ্টক-কানন মাঝে)

এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,

তন্ত্রমন্ত্র শিখে ছিলাম কত।

(কত যতন করে গো, ভুজঙ্গ দমন লাগি)

বঁধুর লাগি করলেম যত, এক মুখে কহিব কত

হত বিধি সব কৈল হত।

(হায় সে সব বৃথা যে হল গো,—

সখি আমার করম দোষে)

অতঃপরে রাসোৎসবে কৃষ্ণান্বেষণের ন্যায় শ্রীরাধা বৃক্ষবল্লরীগণকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইহা দিব্যোন্মাদেরই প্রয়াস।

অতঃপরে কুসুমিত কানন সন্দর্শনে শ্রীমতীর পূর্ব্বসুখ-স্মৃতি উছলিয়া উঠিল। তিনি ললিতাকে বলিলেন, "সখি এই কাননে কানু গোধেনু চড়াইতেন, এই কদম্বমূলে তিনি বেণু বাজাইতেন।" যথা—

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে

চাঁদের হাট মিলাইত গো।

(সেরূপ মনে জাগিল,—এই বনে এসে)

কভু প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলাইয়া শ্রীঅঙ্গে,

ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত গো। (বঁধু কতই রঙ্গে)

যত সহচর সনে, ফুল ফলে দলে দলে,

কি কৌশলে সাজাইত গো।

তখন সে মুরলীধরে, সে মুরলী ধরে,
নাম ধরে বাজাইত গো।
তখন শুনিয়ে মুরলী-ধ্বনি,
আমি হইতাম যেন পাগলিনী,
পথবিপথ নাহি জানি,
(অমনি বের হতাম গো, সখি বঁধুর লাগি)
সখি চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত
মণিময় নূপুর মানি।
(ফিরে চাইতাম নাগো চরণ পানে)
আমি আসিতাম বাঁশরীর টানে।
তখন কেবা চাইত পথ-পানে॥
(মনের কতই বা সুখে)

শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি সহস্রধারায় প্রবাহিত হইল, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবের তরঙ্গ উঠিল, তিনি পূর্ব্বস্মৃতির সুখময়ী কথা বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তিনি বিবশা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া ললিতা বলিলেন :—

দেখ না বিশাখে রাইয়ের কি ভাব হইল।
কি ভেবে শ্যামভাবিনী নীরব রহিল॥
শতমুখে কইতে ছিল পূর্ব্ব সুখ কথা।
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যাথা॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লক্ষ্য করিয়াই যেন দিব্যোন্মাদ-যাত্রা-কাব্যের গ্রন্থকার শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল শ্রীরাধার এই বিপুল ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাই হউক, বিশাখা বলিতেছেন—

শুন গো ললিতে, রাধা প্রেমের সাগর।
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর॥
সারস পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ।
মুরলীর ধ্বনি তাঁর হৈল উদ্দীপন॥

শ্রীমতী সারস পক্ষীর ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হইলেন, মুরলীর ধ্বনি মনে করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, আবার কৃষ্ণান্বেষণে ধাবিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—

আমার বিলম্ব না সহে প্রাণে।
আমি বের হলেম শ্যাম দরশনে॥

কিন্তু দুই পদ যাইতে না যাইতে তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন, গগনপটে শ্যামজলধর দেখিয়া তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইল। ললিতা, বিশাখাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশাখিকে, মেঘ দেখিয়া শ্রীমতীর এ দশা হইল কেন, শ্রীরাধা কথা বলিতে বলিতে নীরব হইলেন, চলিতে চলিতে চরণ থামিয়া গেল, মেঘের পানে স্থিরনয়নে চকিতের ন্যায় তাকাইয়া রহিলেন।

প্রাচীন একটী গানে বর্ণিত আছে স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দর্শন করিয়া শ্রীরামরায়কে বলিতেছেন—

বল দেখি ভাই রামানন্দ প্রভু কেন এমন হৈল।
কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে মেঘ দেখিয়া ঢলে পৈল॥

শ্রীগৌরাঙ্গের এই ভাবচ্ছবি কবি কৃষ্ণকমলের দিব্যোন্মাদ গ্রন্থে শ্রীরাধিকায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রেম-রস-নিধি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভ্রান্তি উপজাত হইয়াছিল, সেই মহাভাব অভিব্যক্ত করা মানবভাষার ক্ষমতাতীত। শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদিনী হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিনি চারিদিক্ কৃষ্ণময় দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসে পরিষিক্ত হইয়া গেল। কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ-ধ্যান, তাঁহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিল; বাহ্যজগতের অস্তিত্ব কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধিকার নিকট তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে ব্রজের গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কুসুমকোমল চরণে কাননের কঠিন কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট অনুভব করিলেন না। বিষধর ভুজঙ্গ ভীষণফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার পুরোভাগে গর্জ্জিয়া উঠিল, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না। শ্রীরাধা জানেন না তিনি কোথায় যাইতেছেন, তিনি জানেন না বধূর হইতে কতদূর আসিয়াছেন। তিনি কেবল এক কৃষ্ণ ভাবনায় নিমগ্ন, তাঁহার চিত্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যই ব্যাকুল।

প্রিয় পাঠক! আপনি শতগুলির যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, যোগীর যোগের একতানতার কথা শুনিয়াছেন, বেদান্তীর অদ্বৈত-সিদ্ধির অবস্থার কথাও শুনিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধার এই মাধুর্য্যময়ী একতানতার গাম্ভীর্য্যময় মহাভাব কোন দর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাইয়াছেন কি? এমন ভাব মহামাধুরীময়ী একতানতা অন্য কুত্রাপি

পরিলক্ষিত হয়না। বেদান্তের সাধকগণ হৃদয়ের মূল উন্মূলন করিয়া, হৃদয়ের স্বাভাবিকী কুসুমকোমলা বৃত্তিগুলিকে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। এই প্রকার সাধনা যে অস্বাভাবিক তাহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের আদর্শ উপাসিকা শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধনা কেমন সুন্দর, সুমধুর অথচ বিশ্ববিস্মৃতিকরী, তাহা কৃষ্ণলীলা-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

যাহা হউক, শ্রীরাধা কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন হইয়া যখন গহনবনে অভিসার করিলেন, তখন সুদূরে নীলাকাশে একখানি অভিনব শ্যামল মেঘ দেখা দিল। সহসা শ্রীরাধা আকাশপানে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর অমনি তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তির এক গূঢ়গভীর প্রবল প্রবাহ খরতরবেগে প্রবাহিত হইল। শ্রীরাধা চলিতে চলিতে আর চলিতে পারিলেন না, তাঁহার গতি স্তম্ভিত হইল, তিনি একদৃষ্টে মেঘপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে মণিমুক্তার মোহনমালাবিনিন্দী অশ্রুমালা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তখন বিশাখা শ্রীরাধার এই স্থগিত, চকিত, স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া বলিলেন—

দেখ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,
কত ধার বহে তিলে তিলে।
দে'খে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর,
অতঃপর আসি দেখা দিলে॥
ইন্দ্রধনু দেখে ধনী, ভাবে শিখি-পুচ্ছ-শ্রেণী
শোভে কিবা চূড়ার উপর।

বকশ্রেণী বায় চলে, ভাবে মুক্তাহার দোলে
বিদ্যুৎ দেখি ভাবে পীতাম্বর ॥
হেমতনু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল কদম্ব জিত
যথোচিত শোভিত হইল।
ক্ষুব্ধ দেহে লুব্ধ মনে, অনিমেষে দুনয়নে,
মেঘপানে চাহিয়া রহিল ॥

প্রিয় পাঠকমহোদয়! বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে যে কি গূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নয়। প্রকৃতির সহিত মানুষের মন একটী অতি সূক্ষ্মবন্ধনে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। ভাবপ্রবণ হৃদয় বাহ্যজগতে নিজের ভাবযোগ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যমুনা-জাহ্নবীর কলকলকুলুকুলুনাদ কাহারো হৃদয়ে শান্তির নির্ম্মল-সুধা সেচন করে, আবার কাহারও হৃদয়ে অতীত সুখ-স্মৃতির মর্ম্মদাহী বৃশ্চিক—দংশন-জ্বালা জ্বালিয়া দেয়। ঐ কুসুমকাননের কোমলপ্রাণ, সরলতামাখা সুস্নিগ্ধ যূথিকার কোমল লাবণ্য, কাহারও হৃদয়ে ভগবৎ-প্রীতির পবিত্র ভাব উদ্রেক করে, আবার কেহ উহার সেই ঢলঢল লাবণ্যমাখা সলজ্জ হাসির রেখা দেখিয়া বিগত সুখস্মৃতির মুর্ম্মুরদাহে অধীর হইয়া উঠে।

গগনপটে নবীন মেঘের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণভ্রান্তি উপস্থিত হইল, তিনি মনে করিলেন তাঁহার সেই হারানিধি, নয়নমণি, প্রাণ-বল্লভ শ্যামসুন্দর বুঝি এতদিনে দেখা দিলেন। তিনি ললিতাকে ডাকিয়া বলিলেন—"সখি যাহার জন্য দুঃখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে এই গহনবনে উপস্থিত হইয়াছি, এতদিন পরে,

সেই কঠোর নির্দ্দয় ঐদেখ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দর্শন দিয়াছেন, ঐ দেখ—

কিবা দলিত কজ্জল, কলিত উজ্জ্বল,
সজল জলদ-শ্যামল সুন্দর,
যেন বকালী সহিত ইন্দ্রধনুযুত
তড়িত জড়িত নব জলধর।
স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বকপংক্তি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনী কান্তি ধরে পীতাম্বর।

শ্রীরাধা মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ-ভ্রমে বলিতে লাগিলেন—

এস এস গোপীর জীবন
দাও গোপীগণে জীবন
এস দেখে জুড়াই জীবন
ওষ্ঠাগত হয়েও জীবন
কেবল দেখ্‌ব বলে যায় নাই জীবন।

কিন্তু কৃষ্ণমেঘ নিকটে আসিলেন না, তিনি যেখানে ছিলেন, সেইখানেই রহিলেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন ঃ—

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়ায়ে ওখানে ; এস হে,
একবার নিকুঞ্জকাননে কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে
জানবে, সবে কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীবন।

ভাল ভাল বঁধু, ভাল ত আছিলে,
ভাল ভাল সময় আসি দেখা দিলে;
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা
দেখা হত না।
তোমার বিরহে সবার হত যে মরণ।
আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি;
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
কিন্তু কমলিনীগণের একই দিনমণি;
দেখ নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত বাজে দেখা সাজে কি তাহাকে,
বঁধু যাহোক দেখা হলো, দুখ দূরে গেল,
যাক্ হে, এখন গত কথায় আর নাহি প্রয়োজন॥
আমার হৃৎকমলে রাখিয়ে শ্রীপদ,
তিল আধ ব'সো ব'সো হে শ্রীপদ,
না সেবিয়ে পদ হল যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ;
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হবে পদদ্বয়,
কোটি শশি-সুশীতল, তোমার পদতল,
একবার পরশেই শীতল হইবে এখন॥

শ্রীরাধা কাতরপ্রাণে ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণভ্রমে মেঘকে সম্ভাষণ

করিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর না পাইয়া বলিলেন—

এই যে নবভাব সব দেখালে বৃন্দাবনে,
বঁধু মান করে কি মৌনী হয়ে দাড়ায়ে
রলে ওখানে।
মানে যে কাঁদায়েছিলাম,
পায়ে ধরে সাধায়েছিলাম,
কেঁদে কি তা শোধ করিলাম,—
এখন ধরতে হবে কি চরণে। * * *
পুরুষ হয়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধরে,
হবেনা তা ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে॥

মেঘ ধীরে ধীরে গগনপথে চলিয়া যাইতে লাগিল, উহা দেখিয়া শ্রীরাধার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সখি ঐ দেখ নিঠুর ধীরে ধীরে অন্তদিকে যাইতেছে, আমরা ত উহাকে ধরিতে পারিলাম না! তবে এই কৃষ্ণ উপেক্ষিত জীবনধারণে আর প্রয়োজন কি? মেঘের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—

ওহে তিলেক দাঁড়াও দাঁড়াও হে,
অমন করে যাওয়া উচিত নয়।
—(দাঁড়াও হে দুখিনীর বঁধু)
ওহে যে যার শরণ লয়,
নিঠুর বঁধু, বল তারে কি বধিতে হয়।

* * *

একবার বিধুবদন তুলে চাও

—(জন্মের মত দেখে লই হে)—

গোপীগণের প্রেমের মরণ দেখে যাও।

বলিতে বলিতে শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলেন। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ অতি ব্যস্তভাবে শ্রীরাধাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

রাই গো, অঙ্গের অম্বর সম্বর সম্বর,

ও তুই বাঁচলে পাবি তোর সে পীতাম্বর।

বলি শুন বিনোদিনী, গেছে এত দিনই

রাধে কেন উন্মাদিনী হয়ে ত্যজিবি কলেবর।

—(সে বঁধুর লাগি)

—(কেন মেঘ দেখে রাই এমন হলি)

—(কাল মেঘ বুঝি, তোর কাল হইল)

—(তোরে কেন বনে মোরা এনেছিলাম)

—(বুঝি বনে এনে তোরে হারাইলাম)

শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। তখন সখীগণ বহুযত্নে শ্রীকৃষ্ণ ধ্বনি করিয়া,ক্ষণেকের নিমিত্ত শ্রীরাধাকে সচেতন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। এই সময়ে শ্রীরাধার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, সখীদের একটী গানে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্‌যথা—

মরি কি হল, কি হল, হায় হায় সখি,

ত্বরা এসে তোরা দেখ দেখ দেখি,

ওমা একি দেখি বুঝি বিধুমুখী,
দুখিনীগণে কি উপেখিয়া যায়।
খ'সে প'লো ধনীর বসন ভূষণ,
দেখনা লেগেছে দশনে দশন।
প'ড়ে ধরাসনে বিচ্ছেদ হুতাশনে,
রসময়ীর রস নাই রসনায়।
শীর্ণ কলেবর কাঁপে থরথর,
হ'লে একি জ্বর করলে জ্বরজ্বর;
দু নয়নে ধারা বহে দরদর,
সত্বর ইহার উপায় কর কর,
ধনীর প্রতি লোমকূপ যেন ব্রণরূপ,
রুধির উদ্গম তাহার উপর;
গোবিন্দ বলিতে চাহে উচ্চৈঃস্বরে,
মুখে নাহি সরে কেবল গো গো করে;
বিধুমুখ হেরে হৃদয় বিদরে,
আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।
সুবর্ণ জিনিয়ে সুবর্ণ যে ছিল,
দেখ সে সুবর্ণ বিবর্ণ হইল;
কর্ণকূপে ধনীর না পশিল ধ্বনি,
কমলিনী নয়নকমল মুদিল।

শ্রীরাধার বিরহবিধুর ভাবচ্ছবি শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত দিব্যোন্মাদ বা রাই-উন্মাদিনী গ্রন্থে এইরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থ হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করাই এ স্থলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বিরহবিভ্রান্ত গৌরচন্দ্রের চিত্র মানসনেত্র-সমক্ষে রাখিয়াই এই দিব্যোন্মাদ-বিভ্রান্তা শ্রীরাধার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন কি তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘে কৃষ্ণভ্রান্তির পদটী শ্রীচরিতামৃতের পদেরই প্রতিধ্বনি। এরূপ ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি উক্ত গ্রন্থের বহুস্থলেই পরিলক্ষিত হয়।

আরও দেখুন :—

"গোবিন্দ বলিতে চাহে বারবারে,
মুখে নাহি সরে শুধু গো গো করে,
বিধুমুখ হেরি পরাণ বিদরে,
আজ বুঝি রাধারে বাঁচান না যায়।"

শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর চিত্র দেখুন :—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
রাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥

এতদ্ব্যতীত আরও বহুস্থলে শ্রীচরিতামৃতের ভাব ও শব্দসম্পত্তির বর্ণসৌন্দর্য্যে কৃষ্ণকমলের এই দিব্যোন্মাদ গ্রন্থ চিত্রিত হইয়াছে। কবি কৃষ্ণকমলের রচিত গানগুলি শ্রীচরিতামৃতের ভাষ্য, বিবৃতি ও বার্ত্তিক স্বরূপ।

কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের ভাবগাম্ভীর্য্য দিব্যোন্মাদগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণ-বিরহ-বিভ্রান্তা শ্রীরাধার চিত্র কৃষ্ণ-বিরহবিভ্রান্ত মহাপ্রভুর ছায়াভাস মাত্র। শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রম আকাশের ন্যায় অনন্ত প্রসারী, সাগরের ন্যায় অনন্ত গম্ভীর এবং সাগরতরঙ্গের ন্যায় বিশাল ও মহান্। শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতটবর্ত্তী নিভৃত নিকুঞ্জের ভাবোচ্ছ্বাস, নীলাচলে সুনীল জলধি-তটে বিপুল সাগর-তরঙ্গে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহবিভ্রম বিশাল ও মহান্। আকাশে শ্যামল নবঘন দেখিলে শ্রীমতীর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিত; নীলা-চল-চরণপ্রান্তবাহী উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল নীলাম্বুরাশি দর্শন করিলে এখনও ভাবুক ভক্তগণের হৃদয়ে কিয়ৎপরিমাণে তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহ-বিভ্রান্ত মহাপ্রভুর প্রেম-তরঙ্গের লীলাস্মৃতি সমুদিত হয়। উহা সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত বিস্তার এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত ভাবের উত্তাল-তরঙ্গে নিরন্তর বিক্ষুব্ধ। এ চিত্র তুলিকায় অঙ্কিত হয় না, এই চিত্রের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ও অনন্ত মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশিত হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিরহ-গীতি

শ্রীমদ্ভাগবতের ভাব অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র কবি ভারত-বর্ষের বিবিধ ভাষায় শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে এখনও সেই সকল কবিতার কি-জানি-কেমন এক উন্মাদিকা শক্তি নরনারীর হৃদয় উদাস করিয়া তোলে, —সে ঝঙ্কারে যেন কোন অজ্ঞাত অথচ চিরপরিচিত ভুবনমোহন প্রাণরাম প্রাণের সখাকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এখনও সেই সকল পদাবলী কত শত নরনারীর হৃদয়নিহিত ভাব-সিন্ধুর তরঙ্গ-লীলা প্রকটন করিয়া দেয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই, সকল ভাষাতেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলার এই বিরহগীতিকার বিষাদ-ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। প্রেমময় প্রাণবল্লভের বিরহে বিরহ-বিধুরার প্রাণের সেই আকুলব্যাকুল-ভাব-ব্যঞ্জক মর্ম্মোচ্ছ্বাস সকল দেশের কবিদেরই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের উচ্চাঙ্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সকলেই এই শ্রেণীর কবিতায় পাঠকের ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের চিত্তে বিরহ-বিষয়ক বর্ণনানিহিত ভাবের ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিধ্বনির সঞ্চার করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে বঙ্গীয় কবিগণের আসনই সর্ব্বোপরি। প্রেম-গীতির কোমলপ্রবাহ বঙ্গের কোমল ভূমিতে যেরূপ গৌরবময় তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, জগতের অন্যত্র কোথাও সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে বঙ্গদেশই জগতের প্রেমধর্ম্ম-শিক্ষাদীক্ষার শ্রীপাটস্বরূপ। এখানে প্রেম-গীতি,—আমোদ-প্রমোদ উপভোগের সঙ্গীতাঙ্গ নহে;—এখানে উহা উপাসনার প্রধানতম অঙ্গ,—উহা প্রেম-ধর্ম্ম-শিক্ষার মহামন্ত্র। ইহাতে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবমোহ-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, শ্রেয়রূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, উহা বিদ্যাবধূ সরস্বতীর জীবন স্বরূপ। উহাতে আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদিত হয়, এবং সকলের আত্মাই এতদ্দ্বারা স্নপিত হয়। যাঁহার আবির্ভাবে জগৎ প্রেম-ধর্ম্মের সারমন্ত্র শিক্ষা পাইল, এই সকল সার-গর্ভ সত্যবাক্য প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিজের উক্তি। তিনিই বলিয়াছেন :—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমোহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনম্ পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্॥

প্রেমময় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের নিমিত্ত স্বীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে, এদেশে সুধামধুর অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম-গীতি-রচয়িতা শত শত কবি প্রেরণ করেন। প্রেমিক-ভক্ত ও হৃদয়বান্ বাঙ্গালী কবিরা এদেশে প্রেমকবিতার যে মন্দাকিনী-স্রোত-ধারা

প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও সহস্র সহস্র ভক্তের তাহাই আস্বাদ্য এবং তাহাই উঁহাদের অন্তরাত্মার একমাত্র উপজীব্য। এস্থলে পদ-রচয়িতৃবর্গের মোহনমাধুর্য্যময় সরস পদ-কবিত্বের সার-ভাগ;—বিরহবিধুরা শ্রীরাধার বিরহবর্ণনাত্মক কতিপয় পদ উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য বিষয়ের পুষ্টিসাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন এই সংবাদেই শ্রীরাধার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অক্রূরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই শ্রীরাধা বিরহভয়ে অধীর হইয়া উঠিলেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস নিম্নলিখিত পদে এই ভাব বর্ণনা করিয়াছেন :—

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আওল
তাহে হেরি কাহে জীউ কাঁপ।
তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥

সখি, মথুরা হইতে কি-জানি-কে আসিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়াছে, সেই হইতেই আমার দক্ষিণ পয়ো-ধরে স্পন্দন হইতেছে, নয়নজলে নয়ন ঝাঁপিয়ে পড়িতেছে। ইহা অবশ্যই ঘোরতর অমঙ্গলের লক্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু—

সজনি অকুশল শত নাহি মানি;
বিপদক লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু-বিচ্ছেদ হোয় জানি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ন্যায় কোন অকুশলই শ্রীরাধার নিকট ক্লেশ-জনক নহে, তিনি, অন্যান্য লক্ষ লক্ষ বিপদকেও তুচ্ছ করেন।

পাছে বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদ হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদকেই তৃণের ন্যায় মনে করেন। কিন্তু শ্রীরাধার হৃদয় আজ বিচলিত হইয়াছে। বিপৎপ্রতনোন্মুখ ব্যক্তির হৃদয়ে, বিপদ্ উহার পূর্ব্বাভাস পূর্ব্বেই প্রতিফলিত করিয়া দেয়। শ্রীরাধার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুলভাবে ব্যাকুল হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

সজনি—কিয়ে ঘর বাহির   চিত না রহে থির
জাগরে নিন্দ না ভায়।
গড়ল মনোরথ   তৈখনে ভাঙ্গত
কিয়ে সখি করব উপায়॥

প্রিয়জনের বিরহ-ভাবনায় চিত্তের যেরূপ ব্যাকুলতা অধীরতা ও অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়, গোবিন্দদাস এ স্থলে অল্পাক্ষরে তাহার পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

উপসংহারে লিখিত হইয়াছে :—

কুসুমিত কুঞ্জে   ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে
সঘনে রোয়ত শুকসারী।
গোবিন্দদাস কহ   আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিধিনী বিথারী॥

গোবিন্দদাসের এই ভাবাত্মক আরও একটি পদ আছে। শ্রীরাধা বিষাদিনী সখীর সমক্ষে বলিতেছেন :—

ঝাঁপল উতপত লোরে [illegible]।
কৈছে করত হিয়া [illegible]॥

শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন, সখি নয়নজলে আমার নয়ন ঝাঁপিয়া যাইতেছে, হৃদয় যে কেমন করিতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না" এই বলিয়া শ্রীমতী নীরব হইয়া ব্যাকুলভাবে সখীর মুখের পানে চহিয়া রহিলেন। সরলা ব্রজবালিকা ভাবিবিরহ-বেদনায় একবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি সখীর নিকট আশ্বাস পাইবেন মনে করিয়া মনের দুঃখ জানাইলেন। কিন্তু সখী তাহার কোন কথার উত্তর না দিয়া বিষণ্ণভাবে অবনতমুখে ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমতী সখীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

তুঁহু পুনঃ কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন দুহুঁ মুঁঝে দেওত সাখী॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয় ?॥
জানলু রে সখি মৌন কি ওর।
পিয়া পরদেশিয়া চলব পোহে ছোড়॥

সখি, নীরব রহিলে কেন ? তুমি গোপন করিয়া আর কি করিবে ? কপালে যাহা ঘটিবে, আমার শরীর ও মন এই উভয়ই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। হাত দিয়া কি বজ্র নিবারণ করা যায় ? আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার প্রিয়তম প্রাণবল্লভ আমাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছেন।"

গোবিন্দদাসের আরও কয়েকটী পদ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলু
কিয়ে নাহি কেল।

যাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপলু
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি, জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান ॥
যো মঝু সরস সমাগম-লালসে
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি ॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণি
মণি মঞ্জীর মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
বিছোরব ইহ অনুমানি ॥

কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণকলঙ্কিনী শ্রীরাধার এই ভাবী বিরহভাবনাত্মক পদটী প্রতপ্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাসের একটী অত্যুচ্চ দীর্ঘনিশ্বাস। ইহার অক্ষরে অক্ষরে শত শত মর্ম্মগাথা বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শ্রীরাধা লোকাপেক্ষা ত্যাগ, গুরুগঞ্জনায় ও দুর্জ্জন নিন্দায় উপেক্ষা, কুলবতী ব্রতপরিহার, এমন কি রমণীর আন্তরিক ধর্ম্ম লজ্জা-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত, করিয়াছিলেন,—এমন যে যুগযুগান্তসঞ্চিত বাসনার একমাত্র ধন,—তাঁহার অভাবে তিনি কি করিয়া জীবনধারণ করিবেন? শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন সংবাদ শ্রবণমাত্রই তাঁহার প্রাণ বাহির না হইল কেন? তাই তিনি বলিতেছেন, "সজনি, আমার

পরাণ কি কঠিন, হরি ব্রজপুরী পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরী যাইবেন, একথা শুনামাত্রই আমার প্রাণ বাহির হইল না কেন? যিনি আমার সরস-সমাগম-লালসে মণিময় মন্দির ত্যাগ করিয়া আমার জন্ত কণ্টকময় কুঞ্জে আসিয়া আমার গমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিতে চাহিতে সারানিশি প্রভাত করিতেন, আজ সেই প্রাণের প্রাণ—প্রাণবল্লভকে হারা হইয়া আমি কি করিয়া প্রাণধারণ করিব?"

বিগত সুখস্মৃতির কি তীব্রজ্বালা! সুখ চলিয়া যায়, সুখের স্থলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখের স্মৃতি ঘনীভূত হইয়া দুঃখের তীব্রতা অধিকতর বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ স্থলে বিস্মৃতির অনুভব-বিলোপী সুশীতল প্রলেপই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনস্তত্ত্বের কঠোর নিয়ম এই যে, এই অবস্থায় গত সুখস্মৃতি শত অগ্নিশিখা লইয়া হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়, আর উহার প্রবল দাহনে হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে থাকে। শ্রীরাধা আরও বলিতেছেন—

মো যদি কখন ঘুমের আলসে
গুতিয়ে সে তনু লাগি।
শ্র অঙ্গ জল বসন মোছয়ে
রজনী পোহায় জাগি॥
সখি এই সে বুঝিনু সাচি।
সে হেন মাধব দূরদেশে যাবে
মুঁই সে রহিনু বাঁচি॥

সে সব পিরীতি আরতি চরিত
সে কথা কহিব কায়।
সোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী
পরাণ ফাটিয়া যায়॥

গত সুখস্মৃতির তীব্রজ্বালা অতীব দুঃসহ। উহাতে প্রাণ আকুল ও অস্থির হইয়া উঠে। তাই মিথিলার অমরকবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার মুখে বলিতেছেন—

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুঃখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥*

---

* শ্রীরাধার এই ব্যাকুলভাব এইরূপ ভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষার পদকর্ত্তারা বিরহ-বেদনার তীব্রভাব প্রকাশ করার নিমিত্ত যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অপর ভাষায় তাদৃশ ভাবব্যঞ্জক শব্দ প্রকৃতই সুদুর্লভ। জ্ঞানদাসের "হিয়া দগদগি পরাণপোড়নী কি দিলে হইবে ভাল।" বাসুঘোষের "অন্তরে অন্তরে ধিকি ধিকি" "হিয়া দহ-দহ মন ঝোরে"

শ্রীরাধার সখী নিম্নলিখিত পদে শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অবস্থা প্রকাশ করিতেছেন ;—

মাধব, বিধুবদনা
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা।
তুহু পরদেশ যাওব শুনি ভব ক্ষীণা
প্রেম পরতাপে চেতন হইল দীনা॥
কিশলয় ত্যজি ভূমি শুতলি আয়াসে ;
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে।
লোরেহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল,
কৃশ ভুজ ভূষণ ক্ষিতিতলে মেল।
আনত বয়ানে রাই হেরত গীম,
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছিন ;

"চিত করে আনছান, ধক্‌ধক্ করে প্রাণ" ইত্যাদি পদ ও বাক্যগুলি বিরহব্যাকুলতা-প্রকাশের এতই উপযুক্ত যে সাধুভাষায় ঠিক ইহার অনুরূপ শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। প্রাগুক্ত বিশুদ্ধবাঙ্গালায় লিখিত পদের ন্যায় কবিতা বিদ্যাপতির পদাবলীতে আরও অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এইসকল পদ বিদ্যাপতির রচিত কিনা, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভূয়সী গবেষণা করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থেও এই পদগুলি দৃষ্ট হইল। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনও কথা বলিবার নাই। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে রসভাবের ক্রমবিচার না করিয়া যেখানে-সেখানে যে-সে পদবিন্যাস করা হইয়াছে। মৃত কাব্যবিশারদসম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতেও এই দোষ যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উক্ত সম্পাদকের গ্রন্থে এই ভাবিবিরহের পদটী মথুরা গমনের পর সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত,

সো সব গণইত ভেল মুরছিত॥

অর্থাৎ মাধব বিধুবদনা শ্রীরাধা কখনও তো বিরহবেদনা জানেন না। তুমি বিদেশে যাইবে—ইহা শুনিয়াই তাহার শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চেতনাও লোপ পাইয়াছে। প্রেম-বিবশা কৃশাঙ্গিনী কমলিনী কিশলয়-শয্যা ত্যাগ করিয়া এখন ভূতলে বিলুণ্ঠিতা হইয়াছেন। কোকিলের কলরব শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিতেছেন, নয়ন-জলে তাঁহার কুচের কুঙ্কুম ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি সহসা এত কৃশ হইয়াছেন যে হাতের ভূষণ খসিয়া মাটিতে পড়িতেছে; তিনি তোমার চিন্তায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন।"

শ্রীরাধার এই অবস্থা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্যামসুন্দরের প্রেমমাখা মুখখানির দিকে চাহিয়াই শ্যাম-সোহাগিনী ফুকরিয়া ফুকরিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার নয়নযুগল হইতে বর্ষার অবিরাম পলল-ধারার ন্যায় নয়নজল ঝর-ঝর ঝরিতে লাগিল, যথা—

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।

ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥

প্রিয়তম পাঠক, একবার আপন হৃদয়ে ভাবি-বিরহ-ব্যাকুলা সজলনয়না শ্রীরাধার এই চিত্রখানি মানসচক্ষে অবলোকন করুন; বিপ্রলম্ভ রসের এতাদৃশ প্রীতিচ্ছবি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তিতে অতি স্পষ্ট ও অধিকতর উজ্জ্বলরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু প্রবাস-গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের সাহস দেখুন; এই অবস্থাতেও

তিনি বিদায়ের অনুমতি চাহিতে উদ্যত হইয়াছেন! কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই ভীষণ বিপদ ঘটিয়া গেল :—শ্রীরাধা তাঁহার বিদায়ের অনুমতির কথা শুনামাত্রই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন যথা—

অনুমতি মাগিতে বরবিধুবদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥

রাধাবল্লভ শ্রীরাধার মোহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, কি প্রকারে শ্রীরাধার চেতনা হয় তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিভাবান্ প্রেমিক, তিনি তখন কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে তোমার ভয় নাই, আমি এখন মথুরায় যাইব না।"

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সুধামধুর সঞ্জীবনী কথা শুনিয়া শ্রীরাধা চেতনা পাইয়া যাহা করিলেন, কবি বিদ্যাপতির ভাষায় তাহা শুনুন—

নিজ করে ধরি দুহু কানুর হাত।
যতনে ধরিল ধনী আপনাক মাথ॥

পাঠক মহোদয় শ্রীরাধার এই নীরব অনুরোধের মর্ম্ম অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন "যে তুমি শপথ করিয়া বল যে আমাকে ছাড়িয়া মথুরায় যাইবে না।" অনুকূল সদয় প্রাণবল্লভ প্রেমময়ীর ভাব বুঝিলেন, বুঝিয়া কি করিলেন তাহাও শুনুন—

বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥

ফলতঃ ইহা বৃথা আশ্বাসবাক্য মাত্র। কিন্তু শ্রীরাধা উহাতেই পরিতৃপ্ত হইলেন।

শ্রীরাধাকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া অতঃপরে কৃষ্ণ মথুরায় গমন করেন। কিন্তু মথুরায় গমনের পূর্ব্বে শ্রীরাধার হৃদয়ে যে বিরহের আশঙ্কা জ্বলিয়া উঠিল, উহা প্রকৃত বিরহ অপেক্ষা কম তীব্র নহে। রসশাস্ত্রে এই বিরহ "ভাবী বিরহ" নামে অভিহিত। প্রবাস নিমিত্ত বিরহ ঘটে। এই প্রবাস বুদ্ধিপূর্ব্ব ও অবুদ্ধিপূর্ব্বভেদে দুই প্রকার। বুদ্ধিপূর্ব্ব প্রবাস আবার দ্বিবিধ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। এই সুদূর প্রবাস তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত। যে সকল পদ আলোচিত হইল, তৎসকল ভাবী প্রবাসজনিত বিরহব্যাকুলতার উদাহরণ।

ভাবী বিরহ।

প্রবাস ও প্রবাসজনিত বিরহ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে নিম্নলিখিত লক্ষণাদি লিখিত আছে ;

পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্ যূনো র্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥
তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যতে।
হর্ষগর্ব্বমদব্রীড়া বর্জ্জয়িত্বা সমীরিতাঃ॥
শৃঙ্গারযোগ্যাঃ সর্ব্বেঽপি প্রবাসে ব্যভিচারিণঃ।
স দ্বিধা বুদ্ধিপূর্ব্বঃ স্যাৎ তথৈবাবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ॥
দূরে কার্য্যানুরোধেন গমঃ স্যাদ্বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
কার্য্যং কৃষ্ণস্ত কথিতং স্বভক্তপ্রীণনাদিকম্॥

কিঞ্চিদ্দূরে সুদূরে চ গমনাদপ্যয়ং দ্বিধা।
ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥
পারতন্ত্রোদ্ভবো যস্তু প্রোক্তঃ স বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্রমনেকধা॥

আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবাসজনিত ভাবিবিপ্রলম্ভের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি। অতঃপর বর্ত্তমান ও অতীত বিরহের উদাহরণ প্রদর্শিত হইবে। এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে যে দশদশা ঘটিয়া থাকে উজ্জ্বলনীলমণিতে তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্‌যথা—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

অর্থাৎ এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু এই দশদশা পরিলক্ষিত হয়। পাঠকমহোদয়গণ আমাদের আলোচিত ও আলোচ্য পদগুলিতে এইসকল দশার অনেকগুলিই যুগপৎ দেখিতে পাইবেন।

পদ-কর্ত্তাদের মধ্যে ভাবী বিরহ-বর্ণনে গোবিন্দদাসের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দদাসের পদাবলী কাব্যসৌন্দর্য্যে রচনা-মাধুর্য্যে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে ব্রজ-রসের অফুরন্ত উৎস উৎসারিত করিয়া রাখিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের একটী পদও শুনুন।

সখী বলিতেছেন—

প্রাতরে তুহুঁ চলবি মথুরাপুর
যবহুঁ শুনল ব্রজনারী।

বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে
মোচত উতপত বারি ॥
মাধব, ভাল তুহু ব্রজ অনুরাগী।
অব সব বল্লবী জমু বিরহানলে
কো পুন ইহ বধভাগী ॥
গিরিবর কুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দীকেলী কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাঁহা করু অবলম্ব ॥
ব্রজপতি নেই অতএব চল আকুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দ দাস কহ অব ঐছন নহ
আগে চলু বলরাম ॥

প্রেমিক পাঠকমহোদয়! গোবিন্দদাসের এই শ্রীবৃন্দাবন-কাব্য-রসময়ী কবিতার সৌন্দর্য্য-সুধা-সার আস্বাদন করুন। ভক্ত গায়কের সুমধুর কণ্ঠে এই গান গীত হইলে ইহার মাধুর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পায়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। গোবিন্দদাসের আর একটী পদের মর্ম্ম এইরূপ—

"হায়, বিধি আমাকে অবলা করিয়া এত বাম হইলেন কেন? শ্যামলসুন্দর বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা যাইতেছেন, ঐ হাসি-মাখা মধুর অধর দেখিয়া—ঐ মুখচন্দ্র দেখিয়া,—ঐ বাঁকা নয়নযুগল দেখিয়া—সুধারসে পরিপূরিত ঐ মৃদুমধুর বচন শুনিয়া,—এখন

আর কি উহাকে ভুলিতে পারিব? যাহাকে না দেখিলে অর্দ্ধ-নিমেষ কাল শত শত যুগের ন্যায় বোধ হয়, তিনি এখন অন্যত্র যাইবেন। আমার প্রাণ কি কঠিন, প্রাণবল্লভের প্রবাস-গমনে এখনও এদেহে রহিয়াছে। হায় সখি, আবার কি তাঁহার দর্শন পাইব।" এই সকল কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার নয়ন-যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, বাক্যনিরুদ্ধ হইল, তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিপ্রলম্ভরসের এমন সুন্দর প্রতিচ্ছবি অপর কোন ভাষার সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার পরের অবস্থা যদুনন্দনদাসের একটী পদে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌যথা—

মুরছিত রাই হেরি সব সখীগণ
হোয়ল বিকল পরাণ।
উরপর কত শত, করাঘাত হানই
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান॥
হরি হরি কি আজু দৈবক খেলি।
রাইক শ্রবণে শ্যাম দুই আখর
উচ্চৈঃস্বরে সব জন কেলি॥
বহুক্ষণ চেতন পাইয়ে সুধামুখী
কাতরে চৌদিকে চাহ।
বেড়ি সব সহচরি করয়ে আশ্বাসন
কানু কাহে যাবে পুরমাহ॥
তুরতঁহি সঙ্কেত কুঞ্জে তঁহি মিলব
হোয়ব অধিক উল্লাস।

তাকর সংবাদ জানাইতে তৈখনে

চলু যতুনন্দন দাস ॥

পদকর্ত্তারা আবেশে ব্রজ-লীলা দর্শন করিতেন, তাঁহাদের ভাবনাময়ী তনু সখীদের অনুগা হইয়া যুগলসেবা করিতেন। উঁহারা প্রত্যক্ষবৎ লীলা সন্দর্শন করিয়া তদুপযোগী পদ-চনা করিতেন এবং পদের ভণিতায় স্বীয় স্বীয় কার্য্যভাব অভিব্যক্ত করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদিগের ভাবিবিরহের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা অতি সুগম্ভীর। নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সেই শ্লোক কয়েকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

গোপ্যস্তা স্তদুপশ্রুত্য বভূভুর্ব্যথিতা ভৃশং।

রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥

কৃষ্ণৈকজীবনা গোপাঙ্গনা সকল যখন শুনিলেন, কৃষ্ণবলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত অক্রূর-ব্রজে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ।

স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥

এই দুঃসংবাদে শোকের প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে কোন কোন গোপীর মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল, এবং কাহারও কাহারও বসন বলয় ও কেশগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল।

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।

নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণানুধ্যাননিবন্ধন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিখিলবৃত্তি নিরস্ত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে যাইবেন, কোথায় কি প্রকারে থাকিবেন ইত্যাদি ভাবনায় উঁহারা মুক্তাত্মাদিগের ন্যায় নিজ নিজ দেহকেও জানিতে পারিলেন না।

স্মরন্ত্য শ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ॥

শ্রীমতী রাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই হাসিমাখা মুখের হৃদয়স্পর্শী বিচিত্র বাক্যাবলীর কথা উদিত হইল। তিনি শ্যাম-সুন্দরের প্রীতিমাখা কথাগুলি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনুরাগের আতিশয্য এতই প্রবল যে, প্রাণবল্লভের স্মিতশোভিত শ্রীমুখের প্রীতিময়ী কথাগুলি স্মরণমাত্রেই শ্রীমতীর বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। গুরুতর প্রেম-বেগে তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পদকর্ত্তারা এই ভাব হইতে শত শত সুধামধুর পদ-রচনা করিয়া বাঙ্গালাভাষার পদকাব্যে কাব্যসৌন্দর্য্যের মাধুরীময় অমৃত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও প্রেমিক ভক্তগণ সেই কাব্য-মন্দাকিনীর সুধা-তরঙ্গে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ভাবিবিরহ প্রকৃতপক্ষে বিরহের আশঙ্কা মাত্র।

এখন "ভবন্" বিরহের কথা বলা যাইতেছে। ঘটিতেছে যে, বিরহ তাহাই ভবন্ বিরহ। ভূ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

ভবন্ বিরহ।

কিন্তু বিরহের এই আশঙ্কা এতই সমীপবর্ত্তিনী যে উহা স্পষ্টতঃই

প্রকৃত বিরহরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এখন শ্রীবৃন্দাবনের ঘটনা শুনুন। ভাবিবিরহের ভীষণ যাতনায় গোপীগণের মধ্যে অনেকেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন, আবার সেই বিরহ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিরহ-বিলাপ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

বিপ্রলম্ভরসে স্মৃতির অত্যাচার সাক্ষাৎ বিরহ অপেক্ষাও তীব্রতর। শ্রীকৃষ্ণ অদ্য মথুরায় যাইবেন, গোপীরা এই মর্ম্মদাহিনী বেদনা লইয়া চেতনা পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতি, সুললিত চেষ্টা, সুললিত সুস্নিগ্ধহাস্যময় অবলোকন, শোকনাশন পরিহাস, নিকুঞ্জ-বিলাস-লীলায় প্রোদ্দামচরিত, এবং গাঢ়ানুরাগময়ী সুরত-লীলার কথা যুগপৎ তাঁহাদের মনে উদিত হইয়া বিরহবেদনাকে শতগুণে বাড়াইয়া তুলিল; শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-আশঙ্কায় তাঁহারা অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে সকলে একত্র সম্মিলিত হইলেন। তখন অশ্রুপূর্ণনয়না গোপবালারা বিরহ-বিলাপ করিয়া সমগ্র ব্রজধামকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন যথা শ্রীভাগবতে—

> অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
> সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
> তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
> বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা।

'হে বিধাতঃ! তোমার কিছুমাত্র দয়া নাই। তুমি দেহিগণকে

মৈত্রী ও প্রণয়ে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই আবার তাহাদিগকে অনর্থক বিযুক্ত কর। কেনই বা ভোগ-বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই উহাদিগকে বিযুক্ত কর? তোমার এ চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায়।

বস্তং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশ সুন্দরং
করোষি পরোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥

হে বিধাতঃ এই সংযোগে সহসা যে বিয়োগবিধান করিতেছ, ইহা সামান্যতঃ তোমার পক্ষে নিন্দনীয়, কিন্তু তোমার সবিশেষ নিন্দার্হ কার্য্য এই যে স্মিতলেশসুন্দর, কৃষ্ণকুন্তলাবৃত সুকপোল ও সুন্দর নাসাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি দেখাইয়া আবার তাহা আমাদের নয়নান্তরাল করিলে! ইহা অতীব অসাধু কার্য্য।

ক্রূরস্ত্বমক্রূর সমাখ্যায় স্ম ন
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বৃথাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ॥

হে বিধাতঃ তুমি অতি ক্রূর। আমাদিগকে তুমিই চক্ষু দিয়াছিলে সেই চক্ষু দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের একদেশে তোমার সৃষ্টির নিখিল সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতাম, এক্ষণে তুমি আমাদের নেত্রোৎসব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া অজ্ঞজনের ন্যায় আমাদের সেই চক্ষু অপহরণ করিলে?

পূজ্যপাদ টীকাকারগণ এই পদ্যটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে উহার রসমাধুর্য্য শতধারায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামিজী যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—হে বিধাতঃ তুমিই সেই চক্ষু হরণ করিলে, তুমি দত্তাপহারী—সুতরাং তুমি অতি ক্রূর। যদি বল অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিতেছেন, এজন্য আমাকে দোষী কর কেন? আমরা এ কথায় বিশ্বাস করি না, অন্যে কখনও এরূপ কার্য্য করিতে পারে না। তুমিই অক্রূর নাম ধারণ করিয়া আসিয়াছ। যদি বল "ভাল আমি যেন শ্রীকৃষ্ণকেই লইয়া যাইতেছি, তোমাদের চক্ষুত হরণ করি নাই। তুমি ইহাও বলিতে পার না শ্রীকৃষ্ণই আমাদের চক্ষুস্বরূপ। আমরা তোমার প্রদত্ত চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের যে কোন অংশে তোমার সমগ্র সৃষ্টিনৈপুণ্য সন্দর্শন করিতাম, ইহাতে সম্ভবতঃ তোমার মনে হইল যে ইহারা বুঝি আমার সৃষ্টির সকল রহস্যই বুঝিয়া লইল, এই অমর্ষণে কি তুমি শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের নেত্রান্তরাল করিয়া আমাদিগকে অন্ধ করিলে?"

পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর এই টীকার ভাব শ্রীচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপে একটী পদ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

"না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম, বৃথা করিস পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে তবে তোর শিক্ষা দিয়ে
আর হেন না করিস বিধান॥

আরে বিধি তো বড় নিঠুর।

অন্যোন্যদুর্লভ জন প্রেমে করাঞা সম্মিলন

অকৃতার্থান্ কেনে করিস দূর॥

অরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন

নেত্র-মন লোভাইলি আমার।

ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলে অন্য স্থান

পাপ কৈলে দত্ত অপহার॥

"অক্রূর করে এই দোষ আমায় কেন কর রোষ,"

ইহা যদি কহ দুরাচার।

তুই অক্রূর রূপ ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি

অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয় পুরাণান্তর হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে জন্য পুরাণেও বিধাতার প্রতিই শ্রীকৃষ্ণবিয়োগের হেতু অর্পিত হইয়াছে, যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে :—

সারং সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিং।

প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা।

অহো গোপীজনস্যাস্য দর্শয়িত্বা মহানিধিং।

উৎকৃত্তান্যস্য নেত্রাণি বিধাত্রাকরুণাত্মনা॥

শ্রীপাদ সনাতনের টীকার মর্ম্ম এইরূপ—বিধাতঃ, যে জন অজ্ঞ, যে পাপাপাপ জানে না, সেই ব্যক্তি দত্তাপহরণ করে, কিন্তু তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিতেছ,—আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ দেওয়া ব্যতীত ইহার তাৎপর্য্য আর কি হইতে পারে? অপিচ

যে জন জানিয়া শুনিয়া দত্তাপহরণ করে এবং তজ্জন্য লোকের চিত্তে ঘোরতর দুঃখের উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহার পাপ অত্যন্ত অধিক। যদি বল "আমি কৃষ্ণের বিয়োগ সাধন করিতেছি, স্বীকার করিলাম; কিন্তু তোমাদের চক্ষু অপহরণ করিলাম কি প্রকারে?" প্রকৃত পক্ষেই তুমি আমাদের চক্ষু হরণ করিয়াছ। আমরা শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গের যে কোন স্থানে তোমার নিখিল সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখনেত্রসৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুর বিন্দুর বিন্দু অংশও পদ্মচন্দ্রাদির সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হয় না। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের অন্য কোন দর্শনীয় বিষয় নাই, অন্য কিছুতেই আমাদের চক্ষুর অভিরুচি নাই, আমাদের নেত্র এক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে চাহে না। এক শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নেত্রের উৎসব—শ্রীকৃষ্ণই আমাদের দর্শনানন্দের একমাত্র পদার্থ। সুতরাং তাঁহাকে হরণ করিলেই আমাদের চক্ষু হরণ করা হইল।"

শ্রীমদ্ গোস্বামিপাদ এস্থলে "মধুদ্বিষঃ" পদটীর অর্থগৌরব ও ভাবগাম্ভীর্য্য-প্রদর্শনের নিমিত্ত অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নারায়ণ মধু নামক দৈত্যের বিনাশ করেন। এই নিমিত্ত নারায়ণকে মধুসূদন বলা হয়। নারায়ণে সর্ব্বাতিশয়গুণশালিত্ব আছে এই অর্থেও এই পদের ব্যবহার হইতে পারে। অথবা পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ তদীয় ভক্তগণের হৃদয় হইতে কেবল কৃষ্ণ-ভক্তি-সুধারস ব্যতীত প্রাকৃতাপ্রাকৃত মধুবৎ সুমধুর নিখিলবাঞ্ছনীয় পদার্থসমূহের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি বিদ্বেষের উদ্রেক করেন এই জন্য ইহার নাম মধুদ্বিট্। কিংবা কংসই মধু, কেননা তিনি মধুপুরীপতি এবং

মধু দৈত্যের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হন্তা সুতরাং তিনি মধুদ্বিষ্।

এই তিনটী পদ্যে বিধাতার প্রতি আক্রোশ করিয়া ব্রজবধূগণ যে বিলাপ করেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

ব্রজ-রমণীগণ প্রথমে বিধাতার প্রতি অক্রোশ প্রকাশ করিলেন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন এ ধারণার কোনও সময়ে তাঁহারা মনে করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিঠুর নহেন, তিনি তাঁহাদের প্রণয়ী। তাঁহার মধুর বাক্য ও হাসি-মাখা মুখখানি নিরন্তর তাঁহাদের হৃদয়ে জাগিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিমাখা চাহনির কথাও তাঁহাদের মনে পড়িতেছিল। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
সেহেন রসিক পিয়া পীরিতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সনেহ॥
চল চল সহচরি অকুর চরণে ধরি
তিলে এক হরি বিলম্বহ।
করুণা ক্রন্দন শুনাইতে ঐছন
জানি ফিরয়ে বর নাহ॥

গোবিন্দদাসের এই পদাংশ প্রেমের দর্শনশাস্ত্রের এক গূঢ়গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছে,—প্রেমতত্ত্বের এক সূক্ষ্ম মর্ম্ম প্রকটিত করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় প্রীতিতে এই সকল রাগময়ী ব্রজগোপীদের প্রথমতঃ আস্থা ছিল। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদের হেতুভূত বিধাতাকে নিন্দা করেন। কিন্তু প্রণয়াসক্ত হৃদয় একদিকে যেমন সমুদ্রের ন্যায় গভীর, অপরদিকে তেমনি সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। তাঁহাদের হৃদয়ে ক্ষণপরেই সন্দেহের তরঙ্গ উঠিল। তাই তাঁহারা বলিতেছেন :—

> ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
> সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
> বিহায় গেহান্ স্বজনান সুতান্ পতীং
> স্তদাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥*

অর্থাৎ নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্দ অস্থির, আমরা তাঁহারই কার্য্যে,—তাঁহারই গূঢ়-হাস্যে বশীভূত হইয়া, গৃহ, স্বজনপুত্র ও স্বামী-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহারই দাসী হইয়াছি, কিন্তু তিনি আর আমাদিগকে চাহিয়াও দেখিলেন না। কেননা তিনি নব নব প্রণয়িণীদিগকেই ভাল বাসেন।"

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে মথুরাবাসিনী পুরনারীগণের যে সুখ-

---

* টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিমহোদয় ব্যাখ্যার মুখবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—"বিধাতাপুরুষ উদাসী, তিনি তো আমাদের আপন নহেন, তাঁহাকে নিন্দা করিয়া আর ফল কি? যে কৃষ্ণ আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, সেই শ্রীনন্দনন্দনের নিকটেই যখন আমরা উপেক্ষার পাত্রী হইলাম, তখন বিধাতাকে নিন্দা করিয়া আর ফল কি?" "ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ" শব্দটী অতীব সুপ্রযুক্ত। শ্রীধরস্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন—"ক্ষণভঙ্গং অস্থিরং সৌহৃদং

শশীর উদয় হইবে, গোপীরা সেই সকল কথা মনে করিয়া পাঁচটী পদ্যে ঈর্ষাসহ বিলাপ করেন। তাহার পরে অক্রূরের প্রতি আক্রোশ করিয়া তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন যথা :—

মৈতদ্বিধাস্যাকরুণস্য নামভূৎ
অক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণং।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ॥*

যস্য সঃ" অর্থাৎ যাহার সৌহার্দ্দ অস্থির। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

ক্ষণমাত্রেণৈব ভঙ্গো যস্য তথাভূতং সৌহৃদ্যং যস্য সঃ"

কুমারসম্ভবকাব্যে রতি পতিশোকে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন :—

কৃত্য মাং তদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

* শ্লোক—চতুর্থ সর্গ।

অর্থাৎ "হে প্রিয়তম, আমার জীবন তোমারই অধীন। তুমিই আমার জীবিতেশ্বর। হায়, ক্ষণ কালের মধ্যেই তাদৃশ সৌহার্দ্দ ভঙ্গ করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? সেতুভঙ্গ হইলে জলরাশি যেমন তদাশ্রিতা তদগতজীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করে, তুমিও আমাকে ত্যাগ করিয়া সেইরূপ দ্রুতবেগে কোথায় গেলে?" বিপ্রলম্ভরসে "ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ" পদটী অর্থ-চমৎকারিত্বব্যঞ্জক।

* ব্যাখ্যাকারগণের অভিপ্রায় এই যে "যিনি এমন ক্রূর তাঁহার নাম অক্রূর কেন? ইনি আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, আবার অতি সত্বরে যে ইঁহাকে দেখিতে পাইব সে আশাও আমাদের নাই; এই

অর্থাৎ "যাহার এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার, যাহার দয়ার লেশও নাই, তাহার নাম হইল অক্রূর। এমন লোকেরও কি অক্রুর নাম শোভা পায়? এই নিদারুণ অক্রূর ব্রজবাসীদিগকে দুঃখিত করিয়া ইহাদিগকে কিছুমাত্র আশ্বস্ত না করিয়া ইহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অতিদূরে লইয়া যাইবে।"

অতঃপরে বিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ আত্মধিক্কার করিয়া বলিতে-ছেন—দেখ, অক্রূর কংসদূত; কংসদূত যে ক্রূর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু উহার আগমনে পরমকৃপকোমলচিত্ত শ্রীকৃষ্ণও আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন। ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ শকটে আরোহণ করিতেছেন, গোপসকলও শকট লইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া উহার শকট-গতি আরও দ্রুততর করিয়া তুলিতেছে। এই গোপসকলও কি উন্মত্ত হইয়া উঠিল? শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় কালাতিপাত করিবেন, আর বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না তখন ইহারা কিরূপে প্রাণধারণ করিবে, এখন সে বুদ্ধিও ইহাদের মনে আসিতেছে না। বৃদ্ধগণই বা কেমন, তাহারাও নিবারণ করিতে ছেন না। দৈবও ত আমাদের অনুকূল হইতেছেন না। তাহা হইলে কোন-না-কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইত। কিন্তু তাহাও তো হইতেছে না। তবে আর কাহার দিকে তাকাইব? কাহার নিকট

অবস্থায় আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাওয়াই অক্রূরের উচিত ছিল। কিন্তু একথাটীও ইনি বলিলেন না যে, "তোমাদের প্রিয়তমকে আমি লইয়া যাই-তেছি, আবার তোমাদের ধন তোমাদিগকে দিয়া যাইব।" সুতরাং এমন নিদারুণ ক্রূর ব্যক্তির অক্রূর নাম নিতান্তই অশোভনীয়।

সাহায্য পাইব? এখন আমাদের প্রাণের প্রাণ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, এখন আর আমাদের লজ্জা সঙ্কোচই বা কি, ভয়ই বা কি? চল সখি আমরাই তাঁহার নিকটে যাইয়া, শ্রীহস্ত ধরিয়া এখনই তাঁহাকে নিবারণ করিব। কুলবৃদ্ধগণ বা পত্যাদি আমাদের কি করিবেন? আমাদের এখন আর ভয় কি, কাহাকেই বা ভয় করিব? মুকুন্দ সঙ্গ অর্দ্ধ নিমিষের নিমিত্তও দুস্ত্যজ্য। দুর্দৈব-বশতঃ যদি তাহাই ঘটিল, তবে আর আমাদের চিত্তে কি সুখ রহিল? এখন আমাদের মরিতেই বা ভয় কি?

যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইতে পারি, আর তাহাতে বন্ধুগণ আমাদিগকে ত্যাগ করেন তবে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বনে বনে বনদেবীর ন্যায় কালযাপন করিব। যদি গৃহস্বামীরা দণ্ডবিধান করেন বা আবদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমরা মনে করিব শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক গ্রামে আছি তো! তাহা হইলে সখীজনের চাতুরীলব্ধ তন্নির্মাল্যাদি দ্বারা রুদ্ধাবস্থাতেও পরম সুখে দিনযাপন করিব। আর যদি শ্রীকৃষ্ণকে একান্তই ফিরাইতে না পারি, তবে মরণই আমাদের মঙ্গলস্বরূপ। সুতরাং চল আমরা বাহির হই। ঐ রথের নিকট ধাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি। যাঁহার সানুরাগসুললিত হাসিতে, মনোহর লীলাবলোকনে, পরিরম্ভণে ও রাসক্রীড়াকৌতুকে,—আমরা সুদীর্ঘ রজনী সকল ক্ষণবৎ অতি-বাহিত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার বিরহ আমরা কি প্রকারে সহ্য করিব? যিনি দিনশেষে ধূলিজালে ধূসরিতঅলককুন্তলশোভিত মুখে গোপগণের সহিত বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে এবং হাসিমাখা

কটাক্ষবিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদের চিত্ত হরণ করিতেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব ?"

এস্থলে পূর্ব্বোদ্ধৃত গোবিন্দদাসের পদটীর উপসংহার করা যাইতেছে। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করিব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জলতহি অনুখন
কো সহ এহেন সন্তাপ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্চল ভরি
পিবইতে জীউ করি সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস-বাদ॥

এমন অমৃতময়ী কবিতা অন্যত্র একেবারেই সুদুর্ল্লভ। "কানু বিনে জীবন, জলতহি অনুখন, কো সহে এহেন সন্তাপ, ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্চল ভরি, পিবইতে জীউ করি সাধ"—এরূপ কাব্যসুধার তুলনা নাই। সৌন্দর্য্য-সুধাপানের এমন অনাবিল ব্যাকুল তৃষ্ণা,—বঙ্গীয় কাব্যের একাধিপত্য মহামূল্য বৈভব। ধন্য বঙ্গীয় কবি গোবিন্দদাস, ভাবুক প্রেমিক ভক্তগণকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই বুঝি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে পদ কর্ত্তাদের আরও দুই চারিটি কবিতা এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

খেনে ধনি রাই রোই ক্ষিতি লুঠই
ক্ষণে গিরত রথ আগে।
ক্ষণে ধনি সজল নয়নে হেরি হেরি মুখ
মানই করম অভাগে॥
দেখ দেখ প্রেমিক রীত।
করুণা সাগরে বিরহ বেয়াধিনী
ডুবায়ল সবজন চিত॥
ক্ষণে ধনি দশনহি তৃণধরি কাতরে
গড়লহি রথ সমুখে।
শিবরাম দাস ভাষ নাহি কুরায়
ভেল সকল মন দুখে॥

শ্রীরাধার বিরহবিধুরতার চিত্র দেখুন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে মাটীতে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে রথের আগে লুটাইয়া পড়িতেছেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে তাকাইতেছেন, আবার কখন বা দাঁতে তৃণ করিয়া কাতর ভাবে রথের সম্মুখে গড়াইয়া পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া পদকর্ত্তা শিবরাম দাসের আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না; কাহারই বা হয়? এমন দারুণ ব্যাকুলতা দেখিয়াও কি কেহ স্থির থাকিতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যে এক্ষণে ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাই-তেছে। শ্রীমৎশুকদেব বলিতেছেন

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিষক্তমানসাঃ

বিহজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি চ ।*

শ্রীকৃষ্ণাসক্তচিত্তা গোপীগণ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া "গোবিন্দ, দামোদর ও মাধব" বলিয়া উচ্চৈঃ-

---

* "গোবিন্দ" "দামোদর" ও "মাধব"—এইরূপ নাম করিয়া বিলাপ করা হইল কেন, টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন। গোস্বামিমহাশয় বলেন গোবিন্দ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে "হে কৃষ্ণ, তুমি গোকুলেশ, তোমার বিহনে এই গোকুল পশুকে বিলয়প্রাপ্ত হয়।" দামোদর নামটী শ্রীশ্রীব্রজেশ্বরীর স্বকৃতানুতাপ-স্মারক। দামোদর বিহনে তাঁহার যে কীদৃশী অবস্থা ঘটিবে এতদ্দ্বারাই তাহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। "মাধব" বলিবার হেতু এই যে স্বয়ং নারায়ণ-রমণী লক্ষ্মীও তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, তিনি সততই তোমার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিব ?"

শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় বলেন, "গোপীরা বলিতেছেন আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগণ গবীশ্বরূপিণী, ইহারা তোমার সঙ্গে চলিল, তুমি স্বীয় মনরূপ-বৃষভেন্দ্র দ্বারা কৃপা করিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ কর, উপেক্ষা করিও না। তোমার সঙ্গলাভের অনুপযুক্ত আমাদের দুর্ভাগ্য দেহ, এখানে পড়িয়া রহিল। যদি প্রত্যাবর্ত্তন না কর, তবে দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে, সুতরাং স্ত্রীবধ করিও না ইহাও ব্রজগোপীদের বিজ্ঞাপনার বিষয়। গোবিন্দ শব্দদ্বারা ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল। দামোদর বলার তাৎপর্য্য এই যে "ব্রজেশ্বরী যশোদামাতার প্রেমবন্ধনে তুমি দামবন্ধনও স্বীকার করিয়াছিলে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি একান্তই যাও, তবে শরষ আসিবে, তাহা না করিলে তোমার জননীর প্রাণ রহিবে না, সুতরাং মাতৃবধ করিও না।" মাধব বলার তাৎপর্য্য এই যে হে, কৃষ্ণ, তুমি আমাদের স্বামী নহ,

স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃত হইতে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত ভবন্ বিরহের মর্ম্মবাঞ্জক পদের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে শেষংশ উদ্ধৃত করিয়া ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাইতেছে। শ্রীরাধিকা স্বীয় কর্ম্মদোষের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

আপনার কর্ম্মদোষ, তারে কিবা করি রোষ
তায় মোর সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ একত্র করি যার সাথ
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর॥
সব ত্যজি ভজি যারে সে আপন হাথে মারে
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি উলটি না চাহে ফিরি
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥
কৃষ্ণকে না করি রোষ আপন দুর্দ্দৈব দোষ
পাকিল মোর এই পাপ ফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥

(মা—না, ধব—স্বামী)—কিন্তু আমাদের সখা। স্বামী হইলে আমরা তোমার স্ববস্তু হইতাম, সে ক্ষেত্রে তুমি ইচ্ছামত সকলই করিতে পারিতে। পালনে বা তাড়নে কোনও বাধা হইত না, কিন্তু আমরা পরদ্রব্য। পরের দ্রব্য নাশ করিও না" এই অর্থে মাধব বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

এই মত গৌররায় বিষাদে করে "হায় হায়
আহা কৃষ্ণ তুমি গেলা কতি।"
গোপীভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলপয়ে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥

ঘনশ্যাম দাসের একটী পদে ভবন্ বিরহের উপসংহার করা যাইতেছে :—

না দেখিএে রথ আর না দেখিএে ধূল।
নিশ্চয় জানিনু মোহে বিধি প্রতিকূল ॥
কহি ভেল মুরছিত রাই ভূমিতলে।
শ্যামরহিত দেখি সখী করু কোলে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি কহে ওহে রাই প্রাণ।
শ্রবণে ঐছে কোই কহে ঘনশ্যাম ॥

শ্রীরাধার এই ভবন্ বিরহের মর্ম্ম স্পর্শী ভাব লইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ ভাষায় শত শত কবি সহস্র সহস্র গীতি রচনা করিয়া এদেশ-বাসী প্রেমিক ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেম-সুধারাশিতে পরিসিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; ইহা হইতেই সহস্র সহস্র গ্রাম্যবিরহ-গীতির সৃষ্টি হইয়াছে, এই ভাবের আভাস লইয়া অনেক মর্ম্মকথা ও বিরহ-ব্যথা প্রকাশ পাইয়া বিরহী ও বিরহিণীদের প্রাণের ভার লঘুতর করিতেছে।

অতঃপরে ভূতবিরহের আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর দিব্যোন্মাদের লেশাভাস বুঝিতে হইলে শ্রীরাধার অন্তর্গূঢ় বিরহবেদনা ও বিরহোচ্ছাসের লেশাভাস জানিয়া লওয়া একান্ত

প্রয়োজনীয়। ইহার প্রধান উপায় মহাজনী পদাবলী। স্বয়ং মহাপ্রভুই এই পথের প্রদর্শক। শ্রীচরিতামৃতে

ভূত বিরহ।

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ জয়দেব ও চণ্ডীদাস ঠাকুর প্রভৃতির পদে ব্রজরস আস্বাদন করিতেন। "রসো বৈ সঃ" উপনিষদের সার তত্ত্ব। "আনন্দং ব্রহ্ম" বেদান্তের বিপুল পদার্থ। এই আনন্দ ও রস উপনিষদে ও সমগ্র বেদান্তে নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। উহাতে এই পদার্থের সূত্র আছে কিন্তু ভাষ্য নাই, ব্যাখ্যা নাই, বিবৃতি নাই, টীকা কারিকা নাই, বার্ত্তিক ত একেবারেই নাই; আস্বাদের নাম আছে বটে, আস্বাদক নাই, আস্বাদনের উপায়ও বিবৃত হয় নাই।

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী এই আনন্দরস-তত্ত্বের পূর্ণবিবৃতিসমন্বিত ভাষ্য ও মহাবার্ত্তিক। ইহাতে আমরা "সত্যং শিবং সুন্দরম্" "আনন্দ মমৃতরূপং যদ্ বিভাতি" ও "রসো বৈ সঃ" পদার্থটীকে লীলা-বৈচিত্রী সহ, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যসহ পূর্ণমূর্ত্তিতে পূর্ণাবয়বে সন্দর্শন করিতে পাই। কি প্রকারে এই চরমতত্ত্বের অনুভব করিতে হয়, কি প্রকারে এই মাধুর্য্যময় বিগ্রহের রসাস্বাদন করিতে হয়, কি প্রকারে সেই আনন্দময়মূর্ত্তির লীলামাধুরীতে মজিয়া থাকিতে হয়, আমরা বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হই। এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পদাবলীর মধ্য দিয়া বৈষ্ণবগণের চরমভজনের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, নিজে আস্বাদন করিয়াছেন, ভক্তদিগকেও সেইপথে অনুরাগের ভজনপ্রণালী শিক্ষালাভের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমরা পদাবলীর সাহায্যেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যো-

স্বাদময় বিরহরসাস্বাদনের লেশাভাস বুঝিতে প্রয়াস পাইব। কেননা ইহাই জীবের আনন্দসম্ভোগের প্রকৃত অবস্থা। যিনি "রসো বৈ সঃ" বা "আনন্দমমৃতম্" তত্ত্বের নিত্যআস্বাদিকা, সেই শ্রীরাধিকার নয়নতারা "আনন্দ অমৃত মূর্ত্তি" শ্রীকৃষ্ণ লীলাবৈচিত্র্যের নিমিত্ত তাঁহার নয়নের অন্তরাল হইলেন, আর তখন তাঁহার নিকট সেই রসময় আনন্দময় বিগ্রহের রঙ্গস্থলী, সুখময় শ্রীবৃন্দাবনধাম কি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল, শ্রীলবিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদে তাহার আভাস গ্রহণ করুন—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহল হিল্লোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥
কৈছনে যায়ব যমুনাক তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা করল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি না নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুক ছাপিত তহি রহ কান॥

শ্রীকৃষ্ণবিহনে গোকুলে করুণার রোল উথলিয়া উঠিল, বিরহ-বিধুরা গোপিকাদের নয়নজলে তরঙ্গ বহিয়া চলিল; ঘর, বাড়ী, পথ

ঘাট, বাট ও নগর শূন্য-শূন্যবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। এখন কি করিয়াই বা শ্রীরাধা যমুনাতীরে যাইবেন, কি করিয়াই বা আর সেই কুঞ্জকুটীর দেখিবেন? শ্রীরাধার হৃদয়ে বিরহের অনল তুষানলের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, সুখকর স্থানসমূহ তাঁহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতিভাত হইল, শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে আজ কৃষ্ণ-আহ্লাদিনীর নিকট সমস্ত বিশ্ব শূন্য-শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের একটী পদও এখানে উল্লেখযোগ্য, তদ্‌যথা—

চললহু মাথুর চলল মুরারি।
চলতহি পেখনু নয়ন প্রসারি॥
পালটী নেহারিতে হাম রহি হেরি।
শূন্যহি মন্দিরে আয়লু ফিরি॥
দেখ সখি নিলাজ জীবন মোই।
পিরীত জানাওত অব ঘন রোই॥
সো কুসুমিত নব কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুন জল মলয় সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে উপতঙ্ক!
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥
তাহে অতি দুরজনে আশকিপাশ।
সমতি না পাওত গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ঠাকুর মহাশয়ের ভাবানুগত পদ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহার কবিতায় বিদ্যাপতির ভাব উজ্জ্বলতর ও প্রস্ফুটতর হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি ভাবের আরও মধুরতর অভিনব মূর্ত্তি দিয়া বিদ্যাপতিঠাকুরের পদাবলী সমূহকে বঙ্গীয় পাঠকগণের মানসক্ষেত্রসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উক্ত পদের মর্ম্মার্থ এইরূপ :—শ্রীমতী বলিতেছেন,

"শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমনের সময়ে রথে আরোহণ করিলেন, তিনি আমার দিকে চাহিতেই আমি তাঁহার পানে তাকাইলাম, কিন্তু চক্ষুর নিমেষে রথ কোথায় চলিয়া গেল, আমি শূন্যমনে শূন্যহাতে শূন্য মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।"

কি সুন্দর বর্ণনা—যেন একেবারেই প্রত্যক্ষ দেখা! ভাবাবেশ ভিন্ন এরূপ কবিতা অসম্ভব। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণবিহনে আবার সেই সুখময় পদার্থ সমূহের দুঃখজনকতার কথা—'সখি এখন কানু নাই, সেই এত সাধের, এত সুখের, কুসুমিত কুঞ্জকুটীর—সেই যমুনাজল,—সেই মলয় সমীর,—আকাশের সেই হাসিমাখা চাঁদ যাহা দেখিয়া এক সময়ে কত সুখ পাইতাম এখন সে সকল দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। যিনি সুখস্বরূপ, যিনি সর্ব্বসুখ-দাতা, যাঁহাকে লইয়া জীবনের সর্ব্বসুখ,—তাঁহাকে ছাড়া জীবনের সকলসুখকর পদার্থই দুঃখকর। এমন কি জীবনই কলঙ্কস্বরূপ।" পদাবলী প্রকৃতই প্রেমের দর্শনশাস্ত্র। মনস্তত্ত্বের এই মধুময় বিভাগ বুঝি কেবল পদাবলীতেই আলোচিত হইয়াছে। গোবিন্দ-দাসের আর একটী পদ শুনুন—

প্রেমক অঙ্কুর আতজাত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ নব ভৈগেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি পরমাণ॥
পাপ পরাণ মম আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর॥

এইরূপ শত শত পদে শ্রীরাধার বিরহচিন্তার ভাব পদকর্তৃগণ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর আরও একটী পদে এই ভাবগম্ভীর বিরহবেদনা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্‌যথা—

হরি কি মথুরাপুরে গেল।
আজ গোকুল শূন্য ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥

অব সোই যমুনাক কূলে।
গোপগোপী নাহি বুলে॥
স্থাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহে নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥

প্রিয় প্রেমিক পাঠক মহোদয়, একবার এই পদটির শেষার্দ্ধে মন নিবেশ করুন,—আমি সাগরে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কামনা সাগরে কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে নাকি বাসনা সফল হয়, আমি আর জন্মে যেন কানু হইয়া জন্মগ্রহণ করি, এবং কানু যেন রাধা হন এই কামনা করিয়া কামনা সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। কানু যখন রাধা হইয়া জন্মিবেন তখন তিনি আমার বিরহ বেদনা জানিতে পারিবেন।' অন্য একটী পদে লিখিত আছে—

(আমি) কামনা সাগরে কামনা করিয়া
পুরাব মনের সাধা।
আপনি হইব শ্রীনন্দনন্দন
কানুরে করিব রাধা॥

বাঞ্ছাকল্পতরু প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রণয়িনী প্রেমময়ীর এই বাসনা কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সফল করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,অন্যূন ৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রেমিককবি বিদ্যাপতির হৃদয়-দর্পণে

এই অভিনব রসরাজ-মহাভাবময় বিগ্রহের ছায়াভাস প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুরের হৃদয়সরসীতেও এই রাধাপ্রেমে গড়াতনু প্রেমমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর ভাবচ্ছায়া প্রতিফলিত হইয়া মৃদুল লীলাতরঙ্গে মৃদুল মধুর ভাবে নাচিতেছিল। শ্রীরাধার বিরহবেদনার রসাস্বাদনার্থই শ্রীগৌরাঙ্গ রূপের প্রকটন। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর, স্বীয় আবির্ভাবের ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি ঠাকুরের হৃদয়ে আবিভূ্ত হইয়া স্বকীয় রসাস্বাদনের ঘোষণা প্রচার করেন। ইহার শত বৎসর পরে তদীয় ভক্তগণ বুঝিতে পান যে শ্রীরাধার বিরহ-রসাস্বাদনার্থই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শেষ দ্বাদশবর্ষে মহাপ্রভু স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সমক্ষে যে মাধুরীময়ী মহালীলা প্রকটন করেন তাহা শ্রীরাধার বিরহ-রস-আস্বাদন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেই ব্যাকুলতা, সেই উচ্ছ্বাস, সেই হা-হুতাশ! শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপী একটি সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া যেন সাক্ষাৎ বিরহবিধুরা শ্রীমতী রাধিকা মহাবিরহের অনন্ত ভাবপ্রবাহ বাহিরে অভিব্যক্ত করিতে ছিলেন।

এস্থলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের বিরহবিধুরা শ্রীরাধার একটি চিত্র দয়াময় পাঠকগণ দেখিয়া রাখুন ঃ—

সজলনয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগচারি।
বিধি বড় নিদারুণ তাহে পুনঃ ঐছন
দুরহি করল মুরারি॥

একবার এস্থলে সজলনয়ন, উৎকণ্ঠ ও আশাবদ্ধ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির চিত্র স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেখুন ; দেখিতে পাইবেন—"সজলনয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি" শ্রীরাধার এই মূর্ত্তি এবং দিব্যোন্মাদগ্রস্ত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তিতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই, বৈষ্ণবপদাবলীর বিপ্রলম্ভ-রসের পদ সকল যেন মহাপ্রভুর মহা-বিরহের ভাবচ্ছায়াবলম্বনেই বিরচিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর আবি-র্ভাবের পরবর্ত্তী অন্যান্য কবিগণের হৃদয়েও তাঁহার দিব্যোন্মাদের অপরিস্ফুট চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। ব্রজরসের গীতিকাব্যে শ্রীরাধিকার বিরহ-বর্ণনায় মহাপ্রভুর মহাভাবমূর্ত্তিই তাঁহাদের কাব্য-কল্পনার সহায় হইয়াছিল। ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ না হইলে শ্রীরাধিকার মহাভাবের অনুভব ভক্তগণের পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়িত, তাই শ্রীপাদ সরস্বতী প্রকাশানন্দ লিখিয়াছেন—

প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথিগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

এ সম্বন্ধে অতঃপর শ্রীরাধা ও শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ এই উভয়ের সাদৃশ্য বা একত্ব প্রদর্শন করিয়া সবিস্তার আলোচনা করা যাইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধা ও মহাপ্রভু

পূজ্যপাদ শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে লিখিয়াছেন :—

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্ নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং
মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুহুরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতম্ ।
উচ্চৈঃক্রন্দন্ করুণকরুণোদ্গীর্ণ হাহেতি রাবো
গৌরঃ কোঽপি ব্রজবিরহিণীভাবমগ্নশ্চকাস্তি ॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রজ-বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার গণ্ডস্থল পরিমৃদিতকমলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি বামকরে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, নয়নজলে তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলী ভাসিয়া যাইতেছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে-ছেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

১। এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, সদা বাক্যে হা হুতাশ ॥
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঁও ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥

কাঁহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥

২। শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥
পুন কহে হায় হায় শুন স্বরূপ রামরায়
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার হয় নয় কর সার
এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥

৩। যে কালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন দেখিনু পদ্মলোচন
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দ কি কহিব ব'লে।
গরুড়স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্নখালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥
তাহা হৈতে ঘরে আসি মাটির উপরে বসি
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হাহা কাহা বৃন্দাবন কাহা গোপেন্দ্রনন্দন
কাঁহা সেই শ্রীবংশীবদন॥

কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম কাঁহা সেই বেণুগান
কাঁহা সেই যমুনা পুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস কাঁহা নৃত্য গীত হাস
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥"
উঠিল নানা ভাববেগ মনে হইল উদ্বেগ
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য হৈল টলমলে
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥
৪। "মোর বাক্য নিন্দা মানি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম তুমি মোর প্রাণধন
হাহা পুন দেহ দরশন॥"
স্তম্ভকম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িলা মূর্চ্ছিত॥
৫। প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সোঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের করে ধরি কহে হাহা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥

এইরূপ আরও বহুস্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, শ্রীমৎ প্রবোধানন্দবর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীর ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের

বিরহপাণ্ডুর গণ্ডস্থলের অশ্রুসিক্ততা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, এবং করুণস্বরে হাহাকারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণবিরহে উচ্চরোদন,—বিপ্রলম্ভ-রসময়ী গৌর-লীলার নিত্য ব্যাপার।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বৈকল্য-জনিত এই চিত্রখানি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ, পূর্ব্বোদ্ধৃত একটিমাত্র পদ্যে অতি পরিস্ফুটরূপে আঁকিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত পদ্যটীর মর্ম্ম বাঙ্গলাভাষায় নিম্নলিখিত-রূপে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

বাম করতলে কপোল রাখিয়া
বিষণ্ণ গৌরাঙ্গ রায়।
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে নয়ান
গণ্ড ভাসিছে তায়॥
ঘন হা-হুতাশ ঘন দীর্ঘশ্বাস
ঘন ঘন হাহাকার।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গৌরাঙ্গসুন্দর
ভাবে মগ্ন শ্রীরাধার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় ব্রজবিরহ অধিকতর পরিস্ফুট এবং ভক্তবর্গের অধিকতর হৃদয়ঙ্গমোপযোগী হইয়াছে। তাই প্রবোধানন্দ লিখিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতম্
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাস-প্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধা-কেলিনাগর-রসাস্বাদৈকতদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর স্বীয় নিগূঢ় লীলামাধুরী প্রচারার্থই অবতীর্ণ

হন। মহামুনি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা-রস-সন্দর্ভের কেবল উদ্দেশ্যমাত্র পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু উহাতে নিগূঢ় লীলা-রসের বিস্তার করা হয় নাই। প্রগাঢ় অনুশীলন ভিন্ন উক্ত রস কোন প্রকারেই অধিগম্য হয় না। স্বীয় রস-মাধুরী আস্বাদন ও জগতে উহার প্রচার করার নিমিত্তই শ্রীগৌরহরি অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীপাদ স্বরূপের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার-তত্ত্বের সুবিখ্যাত পদ্যটীর মর্ম্মানুসারে শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন:—

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে যেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ না হইল।
শ্রীরাধার ভাবসার আপনি করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥
আপনি করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥

শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিলুঁ বিবিধ প্রকার॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥

রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

এই সকল তত্ত্ব বহুবার উক্ত হইলেও প্রত্যেক বারই নব-নবায়মান ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় ব্রজ-বিরহের সকল চিত্রই সুস্পষ্টতররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ অন্ত্য-লীলায় লিখিয়াছেন—

বিরহে দশদশা

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে এই দশ দশার বিবৃতি আছে তদ্‌যথা—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশাদশ॥

অর্থাৎ বিরহে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, দেহের কৃশতা, অঙ্গের মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভূতবিরহবর্ণনায় শ্রীরাধার চিন্তাদশার অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ-অবলম্বনে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। চিন্তা কাহাকে বলে? পরম কারুণিক শ্রীপাদ গ্রন্থকার বলেন—

অভীষ্টব্যাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্ত্তিতা।
শয্যাবিবৃত্তিনিঃশ্বাসো নির্লক্ষপ্রেক্ষণাদিকৃৎ॥

অভীষ্ট-প্রাপ্তির উপায়সকলের যে ধ্যান তাহাকেই চিন্তা বলে।

চিন্তায় শয্যাকণ্টকত্বানুভব, নিঃশ্বাস ও নির্ম্মক্ষদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই চিন্তা পূর্ব্বরাগজনিতা। অপর পক্ষে ভূতবিরহে যে চিন্তার উদয় হয়, তাহা স্বতন্ত্র। ভূতবিরহে যে প্রকার চিন্তার উদয় হয়, পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে তাহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্যথা—

যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্।
তদামাঙ্ক্ষীচিন্তাসরিতিঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধাবিরহিণী॥

আনন্দচন্দ্রিকা টীকার মর্ম্ম হইতে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। "যখন গোপীদের হৃদয়ানন্দ মুকুন্দ গান্দিনীতনয় অক্রূরের অনুরোধে নন্দালয় হইতে মধুপুরীতে গমন করেন, তখন বিরহিণী শ্রীরাধা বাধাময় জলযুক্ত অগাধ নদীর ঘূর্ণাপাকে নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা স্বীয় মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—"আমি কি আশাপাশে বদ্ধ হইয়া বিরহজ্বালা সহিবার নিমিত্তই এই প্রাণ রক্ষা করিব ? যদি প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তবে কি আগুনে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, অথবা যমুনাজলে নিমজ্জিত হইব ? তবে প্রাণ পরিত্যাগ করিব কি ? আচ্ছা, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাণবল্লভ যদি আমাকে মনে করিয়া এই ব্রজপুরে আগমন করেন, আর আমাকে না দেখিতে পান, তবে তিনি কি করিবেন ?—ইহাও এক বিষম ভাবনা ! তিনি আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন কিংবা প্রাণরক্ষা করিবেন, তাই বা কি করিয়া বুঝিব ? তিনি কি

প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন?—তিনি যে মহাপ্রেমী, আমার শোকে তিনি কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবেন? তাহা হইলে আমি কেনই বা মরিব? আমি মরিব না—আশায় আশায় জীবনধারণ করিয়া রহিব, আবার বঁধুয়ার সুন্দর মুখখানি দেখিব। যদি বঁধুর বিরহানলে এ প্রাণ না যায়, তবে ইচ্ছা করিয়া মরিব না"—শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। "মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব" পদটীও চিন্তার উদাহরণ।

শ্রীমতীর চিন্তাব্যঞ্জক অন্য এক প্রকার পদ বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে প্রদত্ত হইতেছে। তদ্‌যথা—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়নু
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশনহু সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি সবহু কুসুমে রমি
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশা নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়াণ॥

বিদ্যাপতি কহ আশাহীন নহ
আওব সো বর কান ॥

এই পদে চিন্তা, উদ্বেগ, ও তানব ইত্যাদি দশা অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। উক্ত পদে শ্রীরাধা বলিতেছেন "মাধব আর কত দিন মথুরাপুরে থাকিবেন, কতদিনেই বা বিধাতার বিমুখতা ঘুচিবে? দিন গণিতে ভূমিতে আঁকে পাতিয়া পাতিয়া নখর ক্ষয় করিলাম, কিন্তু মাধব এখনও আসিলেন না। হায় তিনি কি গোকুলের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন?"

এখন মহাপ্রভুর দশা দেখুন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

১। প্রাপ্ত রত্ন হারা হঞা ঐছে ব্যগ্র হৈল।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইল ॥
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে ॥
"পাইনু বৃন্দাবন নাথ পুন হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইনু ॥

২। প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া তার গুণ সোঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে, "হা হা হরি হরি"
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥
"শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়ি লোকবেদধর্ম্ম
যোগী হইয়া হইল ভিখারী ॥

এইরূপ চরিতামৃতের বহুল পদদ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিন্তা উদ্বেগ প্রভৃতি দশা স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

উদ্বেগ, জাগরণ ও তানব প্রভৃতি দশাসূচক অসংখ্য পদ আছে। এস্থলে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

হরি গেও মধুপুরে হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল যৈছে মালতীমালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও, বয়নক হাস।
সুখে গেও পিয়াসঙ্গে, দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণ-বিরহে বিধুরা হইয়া বলিতেছেন, "সখি তুমি আমায় আর কি বলিয়া প্রবোধ দিবে? আমি এখন কি করিয়া দিনযামিনী যাপন করিব? তুমি আমাকে হাসিমুখী দেখিতে চাও! হায়, আমার মুখের হাসি, চখের ঘুম ও মনের সুখ বঁধুয়ার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, কেবল অনন্ত যাতনাই আমার এখন নিত্য সহচরী।" মর্ম্ম-বেদনায় কেমন সরল অভিব্যক্তি! জ্ঞানদাসের একটী পদও শুনুন—

পুন নাহি হেরব সে চাঁদবয়ান।
দিন দিন ক্ষীণ তনু, না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়াগুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হলো পিয়া না দেখিয়া॥

উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখসম্পদ মোর কোথা কারে গেল।
পরাণপুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে ফাটি যায় মোর হিয়া॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন সজনি, "দিনে দিনে তনু ক্ষয় হইতেছে, শ্যামবিরহে বুঝি এ প্রাণ আর এ দেহে রহিবে না। আর সে মুখখানি দেখিতে পাইব না, চোখে ঘুমনাই, আর কতকাল এইরূপ জাগিয়া জাগিয়া নিশি পোহাইব? সজনি, বড় সাধে সাধে যমুনাকূলে যাইতাম, আর শ্যামযমুনার শ্যামলতটে প্রাণের প্রাণ শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইতাম! আমার সে সাধ ফুরাইয়াছে,—হায়, আমার সে পরাণ-পুতলীকে কে হরণ করিল,—হায় হায়, আমার সে সুখসম্পদ কোথায় গেল, আমার নিলাজ প্রাণ এখনও দেহে রহিয়াছে।"

এ পদেও জাগর তানব এবং উদ্বেগাদি সুস্পষ্ট। জাগরণের আরও একটি পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদবয়ান।
আখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কালরাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥

উঠি বসি আর কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
প্রিয় বিনা শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুঃখ জানাইতে চলে বলরাম দাস॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন—"সখি, আর কতকাল "উঠ বোস" করিয়া রাতি পোহাইব, প্রিয়তম প্রাণবল্লভ বিনা ত্রিভুবন শূন্য-শূন্য বোধ হইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জাগরণদশাদি সম্বন্ধেও এইরূপ সুস্পষ্টতর প্রমাণ শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

১। সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি কহে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ১৪শ পঃ অন্ত্য।

২। শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাঁহা লঞা রহে জাগরণ॥
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

৩। গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন॥
১৭ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

৪। এই মত বিলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥

প্রভুকে শোঞাইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে, বসি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিল।
গম্ভীরার ভিত্তো মুখ ঘষিতে লাগিল॥

১৯ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

৫। সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রিজাগরণ॥

২০ পরিচ্ছেদ, অন্ত্যলীলা।

৬। দিবাভাগে ভক্ত সঙ্গে থাকে অন্তমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥
৭। গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘসে—ক্ষত হয় সব॥

২ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

পদকর্ত্তা নরহরি লিখিয়াছেন :—

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥

খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোন যদি না রহ পহুঁ পাশে॥
ঘন কান্দে তুলি দুই হাত।
"কোথায় আমার প্রাণনাথ॥"
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

রাত্রিকালে সর্ব্বপ্রকার যাতনারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রজনীতেই বিরহ-যাতনার বৃদ্ধিকাল। মহাপ্রভুর বিরহ-যাতনা ও বিরহোন্মাদ শ্রীমতীর ন্যায় রাত্রিকালেই অধিকতর বাড়িয়া উঠিত। নীলাকাশে চাঁদের হাসি, কাননে কাননে কুসুমরাশি, অনন্ত বিস্তৃত অপার নীলাম্বুধির তরল তরঙ্গে চন্দ্রকিরণের মধুর নৃত্য,—উদ্দীপনার ব্যপদেশে শ্রীগৌরচন্দ্রের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ অধিকতর জাগাইয়া তুলিত,—তিনি কখনও কাননের কুসুমশোভায় শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে চটকপর্ব্বতের অভিমুখে ধাবিত হইতেন, কখনও বা শ্রীযমুনার শ্যামসলিল-ভ্রমে সমুদ্রজলে পতিত হইতেন। অন্ত্যলীলায় আমরা এই সকল অদ্ভুত অলৌকিকী লীলা দেখিতে পাই। এই অন্ত্যলীলাতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের হেতু সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, শ্রীরাধার প্রেম-মাধুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পূর্ণরূপে বিভোর হইয়াছিলেন, শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার দশা পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা! জীবের মধুর ভজনপথ শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, আর কোথাও তাহার লেশাভাসও দেখা যায় না।

ভূতবিরহে শ্রীমতীর চিন্তা, জাগরণ ও উদ্বেগের উদাহরণস্বরূপ কতিপয় পদ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে চিন্তার যে উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে এখন শ্রীমতীর বিরহজনিত জাগরাদির উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্‌যথা—

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তা সখি যোষিতঃ।
অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী॥

এই শ্লোকটী পদ্যাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ—শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন, সখি, যে সকল স্ত্রী স্বপ্নে প্রিয়তম প্রাণবল্লভকে দর্শন করে তাহারা ধন্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন পরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাও আমাদের বৈরিণী হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

হংসদূত হইতে উদ্বেগের উদাহরণ গৃহীত হইতেছে যথা ঃ—

মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ
ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ।
ইদং বন্দে মূর্দ্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে
পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতি-কণিকয়াপি ক্ষণিকয়া। *

---

* শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর লোচনরোচনী টীকায় এই শ্লোকটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইল না। তাহাতে কেবল চতুর্থ চরণের "পরামৃশ্যে" পদের অর্থ "স্পৃষ্টা ভবামি" এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথের আনন্দচন্দ্রিকায় লিখিত হইয়াছে ঃ—"শ্রীরাধা ললিতামাহ মন ইতি। অস্তমহাসন্তাপাদ্ধৃতিকলিকয়া কর্ত্র্যা পরামৃশ্যে স্পৃষ্টা ভবামীত্যর্থঃ।"

শ্রীরাধা প্রবলতর বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ধৈর্য্য-ধারণের উপায় লাভের নিমিত্ত ললিতাকে বলিতেছেন, "ললিতে আমার একি হইল, নিদারুণ বিরহানলে দিনরজনী আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, এখন কি করি? আমি যে এই বাড়বানলপূর্ণ দুঃখসাগরের আর পারাবার দেখিতেছি না। ললিতে তোমার পায়ে পড়ি, যাহাতে আমি এই ভীষণ উদ্বেগে অতি অল্পক্ষণও ধৈর্য্যধারণ করিতে পারি, আমায় তাহার উপায় বলিয়া দাও।"

"করবৈ" পদের অর্থ "করোমি"। সূত্র—কৃক্রোঃস্মৃড়ত্তমোক্তে। ধৃতির লক্ষণ এই যে—

জ্ঞানাভীষ্টাগমাদৈস্তু সম্পূর্ণস্পৃহতা ধৃতিঃ।
লৌহিত্যবদনোল্লাসসহাসপ্রতিভাদিকৃৎ॥

শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তিমহোদয় হংসদূতের অতি বিস্তৃত টীকায় এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্ট পুঁথিতে এই শ্লোকটীর কিঞ্চিৎ পাঠান্তরও দৃষ্ট হইল। চতুর্থ চরণের পাঠে যথেষ্ট বৈষম্য আছে যথা—

"পরামৃষ্টা যৎ স্যাং ধৃতিকণিকয়াপেক্ষধিকয়া।"

শ্রীল গোপাল চক্রবর্ত্তি মহাশয় এই পাঠাবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তং উপায়ং কথয় মে মহ্যং যেনোপায়েন ধৃতিকণিকয়া ধৈর্য্যলেশেন পরামৃষ্টা স্যাং যুক্তা স্যাং ভবামি। কীদৃশ্যা—অপেক্ষতে অসৌ অপেক্ষণী (কর্ত্তরি উনট্ ততঃ স্বার্থে কঃ প্রত্যয়ে কেংন ইতিহ্রস্বঃ স্ত্রীয়ামাং তয়া অপেক্ষার্হয়েতি যাবৎ।" আমরা যে পাঠ মূলে উদ্ধৃত করিয়াছি শ্রীল গোপালচক্রবর্ত্তিমহাশয়ের সে পাঠও অবিদিত ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "পাঠান্তরমহৃদয়ঙ্গমম্" অর্থাৎ এই চরণের পাঠান্তর আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু শ্রীজীবের টীকায় যখন উক্ত পাঠ ধৃত হইয়াছে উহাই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

তনুতা ও মলিনাঙ্গতা প্রভৃতির উদাহরণ পদাবলীতে অতি পরিস্ফুট। এস্থলে পদকল্পতরু হইতে মলিনতার একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

যে মোর অঙ্গের পবন পরশে
অমিয়াসাগরে ভাসে।
এক আধ তিলে মোরে না হেরিলে
যুগ শত হেন বাসে॥
সোই সে কেন এমন হল।
কঠিন গান্ধিনী- তনয় কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল॥
পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জন
তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা নগরে, থুইল কার ঘরে
সোঙরি জীবন ক্ষীণ॥
কেমনে গোঙাব এ দিন রজনী
তাহার দরশ বিনে।
বিরহ দহনে যে দেহ মলিন
আকুল হইনু দিনে॥
অন্তর বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বিয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর দাস॥

বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতে বৈষ্ণব কবিগণ যেমন সিদ্ধহস্ত, এমন আর অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে যাতনার উৎস উৎসারিত হয়, দুখের দুঃখী না হইলে অপরের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ত দূরের কথা,—অপরের উহা হৃদয়ঙ্গম করাই দুঃসাধ্য। বৈষ্ণবপদকর্ত্তারা যেরূপ সজীব সরস, পরিস্ফুট ও যথাযথভাবে ব্রজভাবের চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে ব্রজরসের কাব্য লেখা ইহাদের কবিখ্যাতির যশোলিপ্সার কণ্ডুয়নজনিত নহে—ইহাঁরা ব্রজভাবের মহাসাগরে স্বীয় হৃদয় বিসর্জ্জন করিয়া,—তদ্ভাবে দিবানিশি নিমজ্জিত থাকিয়া—নিরন্তর তদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া সখীদের পার্শ্বচরীর ন্যায় যেন ব্রজলীলা সন্দর্শন করিতেন।

শ্রীল শঙ্কর দাসের রচিত উদ্ধৃত পদটী অতি উচ্ছ্বাসময়। শ্রীরাধার পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে অতি ভীষণ ক্লেশের উদয় করিয়া দিতেছে। তিনি বলিতেছেন—"সখি, সে আমায় কতই ভালবাসিত। আমার অঙ্গের বায়ুস্পর্শে যে অমিয়সাগরে ভাসিত, আধতিল আমাকে না দেখিলে যে শতযুগ বলিয়া মনে করিত, আজ সে এমন হইল কেন? অক্রূর কি গুণে তাহাকে এমন উদাসী করিল। যাহার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত বাঁধা, অক্রূর তাহাকে ভিন্ন করিয়া, এখন মথুরা নগরে কার ঘরে লুকাইয়া রাখিল—তার কথা ভাবিতে ভাবিতে জীবন অবসন্ন হইতেছে—তাহাকে না দেখিয়া কি করিয়া দিন রজনী গোঙাইব? দারুণ বিরহানলে আমার অন্তর বাহির পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, আমার আর জীবনের আশা নাই।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই—

হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ
খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী।
অবহরশরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী
তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা॥

উদ্ধবসন্দেশে শ্রীবিশাখার মলিনতা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার দূতীর মুখে প্রকাশ করিতেছেন, "হে অঘহর, তোমার বিরহে বিশাখার মুখ খানি শিশিরপরিমৃদিত কমলের ন্যায়—অধরোষ্ঠ খরতর বায়ুর উত্তাপে বিশুষ্ক বন্ধুজীবের ন্যায়,—এবং শারদসূর্য্যোত্তাপে কুমুদের ন্যায়,—বিশুষ্ক ও বিমলিন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শ্রীরাধার অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার।"

এই অবস্থাপ্রকাশক শত শত মর্ম্মস্পর্শী পদ ও গান বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল। শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর এই সকল দশাপ্রকাশক প্রমাণ শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বহুস্থলে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে প্রলাপের একটী উদাহরণ ললিতমাধব নাটক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদাহরণটী এই—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখিজীবরক্ষৌষধি
র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্‌বিধিম্‌।

শ্রীরাধিকা বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—"সখি নন্দকুলচন্দ্রমা

কোথায়, সেই শিখি-শিখণ্ডভূষণ কোথায়,—সেই সুগম্ভীরমুরলীরব-কারী প্রাণবল্লভ কোথায়,—সেই ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি কোথায়,—সেই রসরসতাণ্ডবী কোথায়,—আমার প্রাণরক্ষার সেই মহৌষধি কোথায়,—হায় হায়, আমার সেই দরিদ্রের নিধি সুহৃত্তম কোথায়,—হাহা এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধাতাকে ধিক্।" শ্রীচরিতামৃতেও এই পদ্যটী মহাপ্রভুর প্রলাপে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সখিজন॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিল।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিল॥

অতঃপর উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিতরূপে উহার ব্যাখ্যানুবাদ করিয়াছেন যথা—

ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোড়।
যার কান্ত্যামৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়া জীয়ে
ব্রজজনের নয়নচকোর॥
সখি হে, কোথা কৃষ্ণ! করাও দরশন।
ক্ষণেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন॥
এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্তকুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া দান।

প্রফুল্লিত করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥
কাঁহা সে চূড়ার ঠাম কাঁহা শিখিপুচ্ছ উড়ান
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥
একবার যে হৃদয়ে লাগে সদা সে হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা।
নারীর মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে—সেঁয়া কুলের কাঁটা ॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি ইন্দ্রনীলমণিকান্তি
যেই কান্তি জগৎমাতায়।
শৃঙ্গাররস-সার আনি তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না ছানি
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুগর্জ্জন জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃতধার ॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষায় মহৌষধি
সখি, মোর তিঁহ সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ এই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥

যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেন জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধে শোক।
বিধিকে করে ভৎর্সন কৃষ্ণে দেয় ওলাহন
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

এই পদটী এ স্থানে উদ্ধৃত মাত্র করা হইল। মহাপ্রভুর বিরহ-দশা-বর্ণনে ইহার ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইবে। পদকর্ত্তা শ্রীল রাধা-মোহনও এই শ্লোকটীর মর্ম্মানুবাদ করিয়াছেন, যথা :—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদবদন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটীকাম॥
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু-শীতল।
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধানিরমল॥"
ঐছন প্রলাপিতে ভেল মূরছিত।
এ রাধামোহন প্রভু বিরহচরিত॥

পদকল্পতরুগ্রন্থে বিরহবিধুরা শ্রীরাধার এইরূপ উচ্ছ্বাসময় বিলাপের পদগুলি যখন পদগায়কগণ দ্বারা গীত হয়, প্রেমিক ভক্তগণ সেই সকল পদ শ্রবণে উহাদের রস-মাধুর্য্য কিয়ং-পরিমাণ আস্বাদন করিয়া ভগবদ্বিরহ-ভাবাতিশয্য কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীল নরোত্তমের রচিত একটী প্রলাপ পদকল্পতরুতে দৃষ্ট হয়, যথা—

নবঘনশ্যাম প্রাণবন্ধুয়া

আমি তোমায় পাশরিতে নারি।

তোমার বদনশশী অমিয় মধুর হাসি

তিল আধ না দেখিলে মরি॥

তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতাম যদি

তবে তোমা দেখিতাম সদাই।

এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি

এবে তোমা দেখিতে না পাই॥

এমন ব্যথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়

তবে মোর পরাণ জুড়ায়।

মরম কহিনু তোরে পরাণ কেমন করে

কি কহব কহনে না যায়॥

এবে সে বুঝিনু সখি পরাণ সংশয় দেখি

মনে মোর কিছু নাহি ভায়।

যে কিছু মনের সাধ বিধাতা পাড়িলে বাদ

নরোত্তম জীবন-সংশয়॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "নবঘনশ্যাম—আমার প্রাণবঁধুয়া—আমি কিছুতেই ত তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না, তোমার সেই মুখশশী, তোমার সেই অমিয় মধুর হাসি তিলমাত্র না দেখিলেই প্রাণ ছটফট করে, আধতিল না দেখিলেই যেন মরিয়া যাই।" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন আত্মগত হইয়া

শ্রীরাধা বলিতেছেন, "হায়, হায়, আমার এমন প্রিয়তম কোথায় গেল, কে তাহাকে হরিয়া লইল। আমার এমন ব্যথার ব্যথিত কে আছে যে প্রিয়তমকে আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ শীতল করে।" বলিতে বলিতে তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইল, সম্মুখে সখীকে দেখিয়া বলিলেন—"সখি মর্ম্মের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্যামবিরহে আমার যে কি দশা হইয়াছে, প্রাণ যে কেমন করিতেছে, তাহা আর কি কহিব—উহা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে ; কিছুই ভাল লাগিতেছে না, আমি কোন প্রকারেই প্রাণধারণ করিতে পারিতেছি না।"

বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার বিচ্ছেদভাবের বৈচিত্র্য অসীম ও অপার! এক্ষণে তিনি অন্তর্দ্দশায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট বিরহ ব্যথার কথা বলিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন আবার পরক্ষণে কিঞ্চিৎ বাহ্যদশায় একাকিনীবৎ বোধে আপনার দুঃখের কথা আপনি বলিয়া প্রলাপ করিতেছেন, যথা—

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহ রহিল॥
মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুঃখ।
নিচয় মরিব পিয়ার না হেরিয়া মুখ॥

এই কথা বলিতে বলিতে লীলাস্থলীর পূর্ব্বস্মৃতি শ্রীরাধার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। লীলাস্থলী দেখিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—

এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ।
কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগীয়া আগে যাইব মরিয়া॥

প্রেমিক পাঠক একবার উদ্ধৃতাংশের—

"এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগররাজ।
কেবা নিল, কিবা হৈল, কে পাড়িল বাজ॥

এই দুইটী ছত্রের ভাবগাম্ভীর্য্য আস্বাদন করিয়া দেখুন, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনার কি প্রবল আতিশয্য এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই দুই ছত্রে বিরহব্যাকুলা শ্রীরাধার মর্ম্মবেদনা যেন তরলভাবে ফুটিতে ফুটিতে আবার গুরুগম্ভীর ভাবে পরিণত হইয়াছে। ভাষা, ভাবপ্রকাশে অবশ ও অসমর্থ হইয়াছে। এই অবস্থায় অন্তরের অন্তরতম দেশে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরস্থ জ্বালামালার ন্যায় বিরহানলের শিখা অন্তরে থাকিয়া অন্তর্দ্দাহে হৃদয় ভস্মীভূত করিতে থাকে। পদকর্ত্তারা দিব্যোন্মাদে এই ভাব অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়াছেন। অতঃপরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

প্রলাপের বহুতর পদাবলী দ্বারা পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে সেই সকল পদাবলীর

কতিপয় পদ যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। এস্থলে রসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রলাপের পরেই ব্যাধিদশার আলোচনা করা যাইতেছে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে ব্যাধির যে উদাহরণ আছে, তাহা এই—

উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো
দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি।
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী
মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতিবিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন "সখি, গোকুলপতির বিচ্ছেদজনিত জ্বর পুটপাক হইতেও অধিকতর উত্তাপদায়ী, গরলসমূহ হইতেও অধিকতর ক্ষোভজনক, বজ্র হইতেও দুঃসহতর, হৃদয়বিদ্ধ শল্য অপেক্ষাও কষ্টদায়ক এবং তীব্র বিসূচিকারোগ হইতেও তীব্রতর। সখি, এই জ্বরে আমার মর্ম্মসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে।

এই শ্লোকটী ললিতমাধব নাটক হইতে উদাহরণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। পদকল্পতরু হইতেও দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

রাইক ব্যাধি শুনহ বরকান।
যাহা শুনি গলি যায় দারুণ পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বাজছে দশনা।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল, কি আর ভাবনা॥
কণ্টকীর ফল যেন পুলকমণ্ডলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকুতার গুলি।

নয়ানের জল বহে নদী শতধারা।
পাণ্ডুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুয়ানাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সখী।
শুনিতে বিকল হিয়া না মেলে যে আঁখি॥
সখীগণ বেড়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে।
কি কহিতে কি কহব রসময় দাসে॥

এই পদে কম্প, কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, পুলক প্রভৃতি ব্যাধির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কম্প, এই কণ্ঠ-ঘড়ঘড়ি, এই দন্ত কড়মড়ি, এই কণ্টকীকণ্টকবৎ পুলককদম্ব—এই শতনদীধারাবৎ নয়নাশ্রু,—শ্রীমুখের এই পাণ্ডুতা—শ্রীঅঙ্গের এই জড়িমা প্রভৃতি লক্ষণগুলির কথা শুনামাত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রথমেই মহাপ্রভুর কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভুরও এইরূপ ভাবোদ্গম হইত, যথা—শ্রীচরিতামৃতেঃ—

পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দ বিহ্বল॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া আনিল ভক্তগণ॥

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
বহুক্ষণ মহাপ্রভু পাইল চেতন॥

ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতর লক্ষণসকল শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ঃ—

প্রথম চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর,—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা যমুনার ধার॥
বিবর্ণ শঙ্খের প্রায় হল শ্বেতঅঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা।
করোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংব্যাজন॥
স্বরূপাদি গণ তাহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হইল চমৎকার॥

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনে॥
এই মত বহুবার করিতে করিতে।
হরিবোল বুলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥

পূর্ব্বোক্ত মহাজনী পদে শ্রীরাধিকার বিরহদশার ব্যাধিবর্ণন এবং শ্রীচরিতামৃতের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দশা বর্ণন বর্ণে বর্ণে এক। মহাপ্রভুর এইরূপ ভাব-বিকার কবির কল্পনায় লিখিত হয় নাই, ইহাতে অতি-রঞ্জনের লেশাভাসও নাই। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অন্তলীলায় পূর্ণভাবে রাধাভাব প্রকটন করিয়া শ্রীরাধার প্রেমরসসুধা আস্বাদন করিয়া ছিলেন, তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া একেবারেই ভাবদেহে শ্রীমতীতে পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ও প্রেমরসাস্বাদনের পথ ভক্তসমাজের নিকট প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ভাব-বিকার তাহারই সাক্ষী।

অতঃপর মোহ-দশার কথা বলা যাইতেছে :—

মোহ অর্থে মূর্চ্ছা। মোহ কি প্রকারে ঘটে, বৈদ্যকশাস্ত্রে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুশ্রুত বলেন—

সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ।
তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ॥
সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তাং প্রাহুঃ ষড়্‌বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

৪৬ অধ্যায়—উত্তরতন্ত্র।

অর্থাৎ বাতাদি দ্বারা সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহ (Sensory nerves)

পিহিত হওয়ায় সহসা সুখদুঃখনাশক তমোভাবের আবির্ভাব হয়। এই জ্ঞানের অভাবে মানুষ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। ইহারই নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। ভাবাতিশয্যে বাতাদির প্রকোপে সংজ্ঞাবহা নাড়ীসমূহে তমের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। উহা হইতেই মোহের সঞ্চার ঘটে।

বিরহবেদনার আতিশয্যে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় ইহা স্বাভাবিক। পুত্রশোকে শোকাতুরা স্নেহময়ী জননীর মূর্চ্ছা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পতি-বিরহিণী প্রণয়িনী পত্নী নববৈধব্য-যাতনায় মোহাভিভূতা হইয়া পড়েন, ইহাও প্রায়শই দৃষ্ট হয়। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মোহ যে কত গভীর, ইহা হইতেই তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীমতীর মোহ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

> নিরুন্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তাপরিভবং।
> বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্।
> ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং।
> বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহ-মূর্চ্ছা সহচরী॥

মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণকে ললিতাপত্রী লিখিয়া শ্রীরাধার অবস্থা জানাইতেছেন—"কংসনিসূদন, এক্ষণে তোমার বিরহজনিত মূর্চ্ছাই শ্রীরাধার সহচরী। ইনিই এখন শ্রীরাধার উপযুক্ত সচিবতায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার দীনতাসমুদ্র নিরোধ করিতেছেন, গুরুতর চিন্তা-পরিভব হরণ করিতেছেন, উন্মাদ দূরীকৃত করিতেছেন,—এমন কি যাতনায়

যাতনায় শ্রীরাধা যে নয়নজলে বক্ষঃসিক্ত করিতেন, সে নয়নধারাও স্থগিত করিয়া ফেলিতেছেন।" কি গম্ভীর ভাব!

এস্থলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তদ্‌যথা :—

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ-বিবৃতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই॥
মরকত স্থলী সুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণদেহ।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচবাণে
কষিত কনক রেহা॥
বয়ান মণ্ডল লুঠয়ে ভুবনে
তাহে সে অধিক শোহে।
রাহু ভয়ে শশী ভুমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে॥
বিরহ-বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥

বিদ্যাপতি ঠাকুরের এই পদে যদিও পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত উদাহরণটীর ন্যায় মোহ-লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই, কিন্তু এই পদে মোহদশার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই হৃদ্‌বিদারক। শ্রীরাধা-বিরহে

বিরহে বিবশা হইয়া মরকতস্থলীতে পতিতা। তাঁহার ক্ষীণদেহ যেন নিকষ-পাথরে স্বর্ণরেখার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার চাঁদের মত মুখখানি নিষ্প্রভভাবে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, যেন রাহুভয়ে গগনের চাঁদ ভূতলে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছে। এ দৃশ্য প্রকৃতই হৃদয়বিদারি ও মর্ম্মান্তিক ক্লেশজনক।

এস্থলে কবি ভূপতির একটি পদও উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

মাধব সুন্দরী পেখলু তাই।
চৌদশী চাঁদ জনু অনুখন ক্ষীয়ত
ঐছনে জীবয়ে রাই॥
নিরতে সখীগণ বচন যে পুছত
উত্তর না দেয়ই রাধা।
হা হা হরি হরি কহতহি অনুখন
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চাঁদের মত দেহের ক্ষীণতা ও তৎসহ মোহ, ভাবুক-হৃদয়ে যে কি বিষাদময় ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়, প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণ তাহা আপন মনে অনুভব করিয়া থাকেন!

মাধবদাসের একটি পদ শ্রবণ করুন:—

তেজল গুরুকুল গৌরব লাজ।
তেজল গৃহ গৃহপতিক সমাজ॥
তেজল লোক নগর ঘর বসতি।
তেজল ভূষণ আসন রস-পিরীতি॥

তেজল হৃষিককরণঅভিলাষ।
তেজল বদনে অমিয়ময় ভাষ॥
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম।
তেজল কিসলয় শয়নক নাম॥
শুন শুন বজর কঠিন পীতবাস।
তেজল অব ধনী জীবন-আশ॥
তেজল বিরহিণী সবহুঁ গেয়ান।
নবমী দশা ভেল করু অনুমান।
অব যদি যাই করহ অবসাদ॥
মাধব তেহারি চরণ ধরি কাঁদ॥

মোহ যে সুখ ও দুঃখানুভূতির অবঘাতক, মাধবদাস তাহা এই পদে পরিস্ফুট করিয়াছেন। মোহ মৃত্যুরই ছায়া। তাই দশদশায় মোহের পরেই মৃত্যু-দশার বর্ণনা করা হইয়াছে। হংসদূত গ্রন্থ হইতেই এই দশার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদ্‌যথা ঃ—

অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা
পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়-লহরী হন্ত গহনা।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্তমসি ধিগিমাং তূলসকলং
যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আছেন। হংসকে দূত কল্পনা করিয়া ললিতা উঁহাকে বলিয়া দিতেছেন, "হংস, শ্রীকৃষ্ণকে তুমি বলিও, অয়ে রাস-ক্রীড়ারসিক, তুমি যে পূর্ব্বে আমার প্রিয়সখী শ্রীরাধাতে নবনব নিবিড় প্রণয়লহরী বন্ধন করিয়াছিলে, সেই তুমিই যদি আজ উদাসীন

স্তায় আচরণ কর, তবে এই শ্রীরাধাকেই ধিক্ দিতে হয়। কেননা এখনও উহার প্রাণবায়ু বহিতেছে কিনা, নাসারন্ধ্রে তুলা খণ্ড দিয়া তাহার পরীক্ষা করা হইতেছে।

শ্রীরাধার এই দশমী দশার পদ বিখ্যাত পদকর্ত্তারা গভীর করুণ ভাবে ও সুকোমল মর্ম্মস্পর্শিভাষায় রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

তুয়া পথ যাই, রো দিনযামিনী,
অতি দুবরী ভেল বালা।
কি রসে বুঝাইব, কৈছে নিঝারব,
বিষম কুসুমশরজ্বালা॥
মাধব, ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ কলা সম ক্ষীয়ত,
তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল,
নীর-নিবেশিত চিরে।
কুবলয় কুমুদ, কমলদল কিশলয়
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
নবনিক পুতলী, মহীতলে শুতলী,
দারুণ বিরহহু-তাপে।
জীবন আশ, শ্বাসহু না রহু,
পরীখত গোবিন্দ দাসে॥

বিরহে বিগ্রহে ননীর পুতলী শ্রীরাধার মৃত্যুদশার চিত্র অমর

কবি গোবিন্দদাসের তুলিকায় কি প্রকার পরিস্ফুট হইয়াছে, প্রেমিক পাঠকগণ নিম্নলিখিত পদ্য গুলিতে তাহার আরও অধিক-তর প্রমাণ পাইবেন—

মাধব, তুহু যব নিরদয় ভেল।
মিছুই অবধি দিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ-জীবন-শেল॥
কোই ধরণীতল, কোই যমুনা জল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এতদিনে বিরহে মরণপথ পেখলু,
তোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান॥

দূতী বলিতেছেন, "মাধব, তুমি যখন নির্দ্দয় হইয়াছ, তবে আর মিছা দিন গণিয়া ব্রজবধূগণকে কত কাল প্রবোধ দিয়া রাখিব? ব্রজের অবস্থা আর কি বলিব? কেহ ধরণীতলে, কেহবা যমুনা-জলে কেহ বা নিকুঞ্জে লুটাইয়া লুটাইয়া দিনযামিনী যাপন করিতেছে; এখন বিরহে বিরহে তাহারা মরণের পথ দেখিতে পাইতেছে। এখন আর ব্রজবিরহিণীগণের জীবনের আশা নাই। ইহাতে তোমার শত শত স্ত্রীবধের পাতক হইবে, জানিয়া রাখিও। মাধব প্রেমময়ী গোপিকাকুলের অবস্থা আর তোমায় কি জানাইব? অল্পসলিল-

বিশিষ্ট সরোবর নিদাঘের তাপে যখন তাপিত হইয়া উঠে, সেই সরোবরস্থ আকুলপ্রাণ সফরীর অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেই গোপীদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। এই অবস্থায় জীবনই মরণ, মরণই বরং জীবন।”

শ্রীবৃন্দাবন-কাব্যের কবি গোবিন্দদাসের লেখনীতে ফুলচন্দন বর্ষিত হউক।

এই ক্ষুদ্রাধম লেখক কোনও সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মোহ-দশার একটি পদ লিখিয়াছিল, তাহা এই :—

বৈশাখ মাসের নিশি অবসান প্রায়।
গম্ভীরায় গোরা যামি জাগিয়া পোহায়॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁর ব্যাকুল অন্তর।
“কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি কাঁদে নিরন্তর॥
বিরহে বিরহে ক্ষীণ স্বর্ণ কলেবর।
ভাবেতে বিবশ দেহ কাঁপে থরে থর॥
মুকুতা বিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু-রাশি।
ঝরিয়ে ঝরিয়ে প’ড়ে বক্ষ যায় ভাসি॥
বিনা’য়ে বিনা’য়ে গোরা করয়ে রোদন।
“কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দাও দরশন॥”
চৌদশী চাঁদের মত গোর মুখশশী।
আঁখি-নীরে পাণ্ডুমুখ যাইতেছে ভাসি॥
“নন্দকুলচন্দ্র” বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন সদা হা হুতাশ॥

নিকষ পাথরে যেন সুবর্ণের রেখা।
আকাশের গায় যেন ক্ষীণ চন্দ্রলেখা॥
গম্ভীরার মরকতে গৌরাঙ্গসুন্দর।
পড়িয়া রহয়ে মোহে তেমতি নিথর॥
স্বরূপ রামানন্দ বসি করে হায় হায়।
কনকপ্রতিমা আজ ধুলায় লুটায়॥

যাহা হউক, বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধার দশমী দশার বর্ণনাসূচক বহুল পদ আছে, সেই সকল পদের অতি অল্পই পাঠকগণের নয়ন-গোচর হয়। যাঁহারা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরসের আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল পদাবলী পাঠ করিয়া প্রকৃতই চরিতার্থ হইবেন। কি উদ্দেশ্যে এই সকল পদ উদ্ধৃত করা হইতেছে, পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি; অতঃপর তাহা আরও বিশদরূপে বলা হইবে। এই সকল পদ পাঠ করিয়া কৃপাময় পাঠকগণ গম্ভীরায় বিরহব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখচ্ছবির কথা স্বীয় হৃদয়ে কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ গোপীর দশদশা-বর্ণনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীল উজ্জ্বল-নীলমণিকার লিখিয়াছেন—

প্রোক্তানাং প্রেমভেদানাং বিবিধত্বাদ্দশা অপি।
বিবিধাঃ স্যুরিহেত্যেতা ভূমভীত্যা ন কীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ গোপীদের প্রেমভেদে এই দশ দশারও বিবিধত্ব আছে। প্রেমভেদের বিস্তৃত বিবরণ নায়িকাভেদে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন শ্রীমতী মঞ্জিষ্ঠা রাগবতী, কোনও গোপী কুসুম্ভরাগবতী, কাহারও

মধুস্নেহ, অপর কাহারও ঘৃতস্নেহ, কেহ বা প্রৌঢ়া, কেহ বা মুগ্ধা, কেহ বা মধ্যমা ইত্যাদি। এই সকল নায়িকাদের প্রেম-ভেদে দশাও বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সেই সকল বিবিধ ভাব এস্থলে বর্ণিত হয় নাই।

এই যে দশ দশার বর্ণনা করা হইল, ইহা ব্রজবিরহিণীমাত্রেরই সাধারণ দশা। কিন্তু বিরহে শ্রীমতী রাধিকার এক প্রকার অসাধারণ দশা ঘটিয়া থাকে। অধিরূঢ় ভাবের বর্ণনায় তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই অসাধারণ ভাব কেবল শ্রীমতীতেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতঃপরে তাহার আলোচনা করা হইবে।

বৈষ্ণব কবিগণ মৃত্যুদশার বর্ণনা করিয়াই বিরহদশার শেষ করেন নাই। সেরূপ ভাবে শেষ করিলে রসের ও ভাবের পূর্ণতা ও পুষ্টি হয় না, এই নিমিত্ত উঁহারা দশম দশায় নায়িকার চেতনা-লাভের পদ বর্ণনা করিয়া আবার বিপ্রলম্ভ-রসের প্রবাহটীকে আকুল করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যুদশায় সহসা যাহার বাহ্যস্ফুরণ স্থগিত হয়, যে বিরহরস-প্রবাহ স্থগিত হইয়া অন্তরে অন্তরে সম্পুষ্ট, স্ফীত ও প্রবল হইয়া উঠে, চেতনাপ্রাপ্তিমাত্রেই তাহা আবার সিন্ধুর উচ্ছ্বাসের ন্যায়, পদ্মার প্রবল প্রবাহের ন্যায় অজস্রধারায় প্রবাহিত হইতে আরব্ধ হয় এবং এই অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দশাগুলি আবার সাগরতরঙ্গের ন্যায় বিরহবিধুর হৃদয়কে আকুল করিয়া তোলে! এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ দুইটী পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্‌যথাঃ—

কুঞ্জ ভবনে ধনী তুয়াগুণ গণি গণি
অতিশয় দুরবলী ভেল।

দশমীক পহিল দশা হেরি সহচরী
ঘরে সঙ্গে বাহির কেল ॥
শুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুল তরুণী নিচয় মরণ জানি
ঝাই ঝাই করি রোয় ॥
তহি এক সুচতুরী তাক শ্রবণ ভরি
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুক্ষণে সুন্দরী পাই পরাণ কোকি
গদ গদ কহে শ্যাম নাম ॥
নামক আছু গুণ শুনিনে ত্রিভুবনে
মৃতজনে পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ
ঝাই দেখহ মঝু সাথ ॥

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই প্রসঙ্গে অতি অল্প কথায় নামমাহাত্ম্য অতি সুন্দররূপেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্যাম নাম শুনিয়া মৃতপ্রায় শ্রীমতী চেতনালাভ করিলেন। নামের এমনই গুণ যে উহা শুনিয়া মৃতব্যক্তিও পুনরায় কথা বলে। শ্রীমতী চেতনা লাভ করিলেন, চেতনা প্রাপ্তির পর যে ভাব প্রকটিত হইল, নরোত্তমদাসের একটী পদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিকে চায়।
না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায় ॥

কাহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাহা নবঘন শ্যাম॥
অমৃতের সার কাহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষ কাহা মুরলী-বদন॥
দূরে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশুপাখী করয়ে বিষাদ॥
পুনঃ পুনঃ চেতন পুনঃ পুনঃ ভোর।
নরোত্তম দাস কহে দুঃখ নাহি ওর॥

পাঠক মহোদয়গণ এই পদটী পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, উহা মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদেরই মুখবন্ধ মাত্র। এই পদটী মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কথা মনে করিয়াই পাঠ করুন, অথবা দিব্যোন্মাদগ্রস্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে মনে করিয়াই পাঠ করুন, উহা প্রতিরোধোন্মুক্ত উচ্ছ্বসিত প্রেম-প্রবাহের হৃদয়োন্মাদক বিমোহন চিত্রনৈপুণ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। ইহাই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের ছায়াময়ী প্রতিচ্ছবি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিব্যোন্মাদ

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ—গম্ভীরলীলার এক সুগম্ভীর রহস্য। এই নিগূঢ়তত্ত্ব পাণ্ডিত্যের অগম্য, ভাষার অলক্ষ্য—সাধকের প্রগাঢ় ধ্যেয়—কেবল সিদ্ধভক্তেরই আস্বাদ্য। অধম আমরা এই লীলা সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার কে? এই গম্ভীরা-লীলার অগাধ গাম্ভীর্য্যই বা কোথায়, আর আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রবেশাধিকারই বা কোথায়—কিন্তু তথাপি দুরাশার এমনই ছলনা—মোহের এমনই প্রতারণা যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বুঝি আর নাই বুঝি—আস্বাদন করা তো বহু বহুজন্মের সঞ্চিত ভক্তি-সাধনারও পরের কথা—তথাপি এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রকাশ করিতে চিত্তে বাসনার উদ্রেক হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ "আনন্দ-চিন্ময়রসমূর্ত্তি" বলিয়া চিনিয়াছিলেন। শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিই ব্রজরস-লীলার নায়ক, তিনিই নবদ্বীপলীলায় "মহাভাব-রসরাজ দুই একরূপ" স্বরূপ। সুতরাং মহাপ্রভুর লীলা বুঝিতে হইলে ব্রজরস বুঝিতে হয়, তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা তত্ত্ব বুঝিতে হইলেও সেই ব্রজরস-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। দিব্যোন্মাদ সেই ব্রজরসাস্বাদনের চরম পরিণতি। ব্রজরসের

প্রথম সাধন—শ্রীকৃষ্ণানুরাগ। অনুরাগ অনুক্ষণ প্রবর্দ্ধনশীল। জোয়ারের জল যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে তটিনীকে আতটপূর্ণ করিয়া তোলে, অনুরাগও হৃদয়ে সেইরূপ অনুক্ষণ বাড়িতে থাকে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে উহা আপনার ভাবে বিভোর হয়, উহার বিপুল বিচিত্র তরঙ্গমালা প্রকটিত হয়, উহা আতটপূর্ণ হইয়া নিজের গৌরবে নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়। অনুরাগের এই অবস্থার নাম ভাব।* শ্রীকৃষ্ণ রসবিহ্বলা আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীদের হৃদয় সততই এই প্রকার ভাবনিষ্ঠ। ভাব, প্রেমেরই প্রথম প্রকটাবস্থা। এই প্রেম আহ্লাদিনী-শক্তির সারস্বরূপ। সুতরাং ভাব, অনুরাগেরই উৎকর্ষবিশেষ। ইহার অপর নাম রতি। আবার এই অনুরাগোৎকর্ষ-বিশেষ (ভাব) যখন পরমসীমা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা মহাভাব নামে খ্যাত হয়। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃততুল্য মহাসম্পত্তিস্বরূপ এবং এই মহাভাবই চিত্তের প্রকৃত স্বরূপ। †

এই মহাভাবের আবার প্রকারভেদ আছে। মহাভাব দুই প্রকার,—রূঢ় ও অধিরূঢ়। ‡ যে মহাভাবে স্তম্ভ কম্প স্বেদাদি

---

* অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

† মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥
বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ॥

‡ স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ।

সাত্ত্বিকভাবসমূহ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার নাম রূঢ়ভাব।* রূঢ়ভাব যেমন সাত্ত্বিক লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়, অনুভাব দ্বারাও উহা সেইরূপ প্রকটিত হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলনে ও তাঁহার অদর্শনে যে সকল অনুভাব রূঢ়মহাভাবে প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে নিমিষের অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনসমূহের হৃদ্‌বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সখ্যেও আর্ত্তি-আশঙ্কায় ক্ষীণতা, মোহাদির অভাবেও আত্মাদিসর্ব্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পতা প্রভৃতিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। †

মহাভাবের রূঢ়াবস্থায় অনুরাগ কীদৃশ পরমোৎকর্ষের সহিত প্রকাশ পাইয়া থাকে, উক্ত অনুভাবসমূহের আলোচনা করিলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বুঝিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্‌কে কি প্রকার অনুরাগের সহিত ভজনা করিতে হয়; ব্রজ-গোপীরাই যে তাহার একমাত্র শিক্ষয়িত্রী, এই সকল অনুভাবের অনুভূতিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত "নিমিষের অসহিষ্ণুতা" প্রভৃতি অনুভাবসমূহের এক একটীর আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) নিমেষের অসহিষ্ণুতা—শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করার নিমিত্ত গোপীকুল এতই ব্যাকুল, যে চক্ষের নিমেষক্ষেপণে যে একটুকু কালক্ষেপ

---

* উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।

† নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্‌বিলোড়নম্।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি সর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাবপ্রকরণ।

হয়, সেই কালবিলম্বটুকুই তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াও গোপীদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-আশঙ্কা বলবতী হয়—চক্ষের নিমিষের মধ্যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া ফেলেন। এই আশঙ্কায় উঁহারা অধীর হন। উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এ সম্বন্ধে একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা :—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং।
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি॥
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌॥

গোপীগণ বহুদিনের পরে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন পাইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের চিত্তে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, শ্রীপাদ শুকদেব তাহার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :—"গোপীগণ বহুকালের পরে তাঁহাদের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন করিবার সময়ে চক্ষুর নিমেষপতনের কালটুকুও অসহ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; বিধাতা নয়নের পলক দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং যোগিগণের সুদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণকে নয়ন দ্বারা হৃদয়স্থ করিয়া মহা-আনন্দ লাভ করিলেন।" এইরূপ নিমেষাসহিষ্ণুতাপ্রকাশক শ্লোক শ্রীভাগবতে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননম্‌।
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্‌॥

কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে।
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ! কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

এতদবলম্বনে বৈদ্যবংশীয় ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী একটী গান রচনা করিয়াছেন যথা :—

কি হেরিব শ্যাম রূপ নিরুপম
নয়ন তো মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন মন সহ মন
হতে ছিল সম্মিলন।
নয়ন পলক দিল হেন সুখের সময়।
শ্যাম দরশনের আমার ত্রিবিধ বৈরী।
বল কেমনে ওরূপ নয়নে ভরি হেরি॥
ঘরে গুরু লোক নয়ন পলক
আমার সুখেতে উপজে শোক॥
তাহে আনন্দ মদন দুই দুরাশয়॥

সখি যে হেরিবে কৃষ্ণানন,

তারে কোটিনেত্র না দেয় কেন

যদি দিল বা দুইটী নয়ন,

তাহে কৈল পক্ষ আচ্ছাদন

(বিধি সৃজন জানে না)

সখি কি তপ করিয়া মীন।

পেল দুইটী চক্ষু পক্ষহীন ॥

আমি সেই তপ করি

মীনের মতন নেত্র ধরি

হেরি হরি পরাণ ভরিয়া।

দিল পক্ষ তাহে নাহি ছিল ক্ষতি,

যদি দিত আঁখির উড়িতে শকতি ॥

তবে চকোরের মত সে লাবণ্যামৃত

আঁখি উড়ি উড়ি পান করিত।

তবে পিয়াসা মিটিতে হেন মনে লয়।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী এই অবস্থাকে "বৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "এইরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলেই গোপীদের দর্শনোৎকণ্ঠা জন্মে, আবার দর্শন-প্রাপ্তি-মাত্রেই তাঁহারা বিচ্ছেদের ভয়ে অধীরা হন, যথাঃ—

"অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদভীরুতা।"

এই বৈচিত্ত্য-বিপ্রলম্ভ প্রেমের এক অদ্ভুত বিধান।

(খ) রূঢ় মহাভাবের আর একটী অবস্থা—আসন্নজনতা-হৃদ্বিলোড়ন। গোপীগণের অনুরাগ মহাশক্তিশালী। ইঁহাদের অনুরাগের মহীয়সী শক্তি দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকটভাবে থাকিতে পারেন না। সমুদ্র যেমন গভীর কল্লোলে উত্তালতরঙ্গে বিলোড়িত হইয়া তটবর্ত্তী জনসমূহের চিত্ত বিলোড়িত করিয়া তোলে, বিদ্যুৎ যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে, গোপীগণের রূঢ় মহাভাবও তাদৃশ শক্তিশালী। এই "আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়নে"র যে উদাহরণ উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই :—

সখ্যঃ প্রোক্ষ্য কুরূন্ গুরুক্ষিতিভৃতামাঘূর্ণয়ন্তি শিরঃ
স্বস্থা বিশ্লথয়ন্ত্যশেষরমণীরাপ্লাব্য সর্ব্বং জনম্।
গোপীনামনুরাগসিন্ধুলহরী সত্যান্তরং বিক্রমৈ-
রাক্রম্য স্তিমিতাং ব্যধাদপি পরাং বৈকুণ্ঠকণ্ঠশ্রিয়ম্॥

অর্থাৎ দ্বারকাবাসিনী রমণীগণ কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, 'সখীবৃন্দ, দেখ গোপীদিগের অনুরাগ-সমুদ্রলহরী কুরুবংশীয়দিগকে প্লাবিত, মহারাজদের মস্তক ঘূর্ণিত, পতিব্রতা নারীদের সতীত্ব শিথিলিত, অপর সাধারণকে পরিপ্লুত, সত্যভামার হৃদয় আক্রান্ত এবং রুক্মিণীর হৃদয় স্তিমিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।" ফলতঃ রূঢ়মহাভাবের ইহাই এক মহান্ মহিমা।

(গ) ইহার অপর ব্যাপার,—কল্পক্ষণত্ব। শ্রীকৃষ্ণের সহবাস-সময় কল্পকাল হইলেও মহাভাবময়ী গোপীদের নিকট উহা ক্ষণ-কালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার উদাহরণ যথা :—

শরজ্জ্যোৎস্নী রাসে বিধিরজনীরূপাদি নিমিষা-
দতিক্ষুদ্রা তাসাং যদজনি ন তদ্বিস্ময়পদম্।
সুখোৎসেবারম্ভে নিমিষমিব কল্পামিবদশাং
মহাকল্পাকল্পাপ্যহহ লভতে কালকলনা॥

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন---নান্দীমুখি, রাসের শারদীয় রাত্রি ব্রহ্মরাত্রি সদৃশী সুদীর্ঘা হইলেও গোপীদের অনুভাবে উহা নিমিষ অপেক্ষাও যে অল্পতর প্রতীয়মান হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণসঙ্গজনিত সুখোৎসব আরম্ভ হইলে গোপীদের মহাকল্পাবধি কালসংখ্যা নিমেষতুল্য হইয়া পড়ে।

(ঘ) রূঢ় মহাভাবের অপর একটি লক্ষণ---শ্রীকৃষ্ণের সুখেও পীড়ার আশঙ্কা। প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রিয়জনের অতি ক্ষুদ্র অনিষ্টেও প্রণয়িহৃদয়ে উঁহার মরণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু গোপীপ্রেমের এমনই অদ্ভুত মহিমা যে শ্রীকৃষ্ণের সুখেও উঁহারা তাঁহার পীড়ার আশঙ্কা করেন! তাঁহাদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শেই বা তিনি ক্লেশ প্রাপ্ত হন, গোপীদের মনে ইহাও আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল। এরূপ ভাব নরলোকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ঙ) রূঢ় মহাভাবের আর একটি চমৎকার লক্ষণ,—মোহাদির অভাবেও বাহ্যজগদ্বিস্মৃতি, যথা শ্রীভাগবতে :—

তানাবিদন্নব্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।

যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন, হে উদ্ধব! যেমন সমাধিকালে মুনিগণ, সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমূহের ন্যায় নামরূপাদি কিছুই জানিতে পারেন না, তদ্রূপ গোপীগণের চিত্তও আমার প্রতি প্রবলতম আসক্তিতে সর্ব্বদাই আমাতে প্রবিষ্ট থাকে, উঁহারা স্বীয় দেহ গেহ বা দূর নিকট কিছুরই অনুভব করিতে পারে না।

ইহার আর একটী লক্ষণ—ক্ষণকল্পতা অর্থাৎ ক্ষণমাত্রও সময়ে কল্পের ন্যায় অনুভূত হওয়া।

মহাভাবের অনুভাব লক্ষণ এইরূপ। শ্রীভগবান্‌কে ব্রজরসে ভজন করিতে হইলে তদ্বিষয়ে চিত্তের কি প্রকার উৎকর্ষসাধন করিতে হয়, পাঠকগণ রসশাস্ত্রের এই সকল উক্তিতে তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারেন।

রূঢ়ভাব, উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকঅনুভাবপ্রধান। উদ্দীপ্তসাত্ত্বিক অনুভাবসমূহ হইতে এই রূঢ়ভাব উত্তরোত্তর এক প্রকার বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত হইলে তাহাতে তখন অন্য একপ্রকার বিশিষ্ট অনুভাব-সমূহ পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় রূঢ়ভাব অধিরূঢ় নামে অভিহিত হয়। যথা—

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥

ইহাতে অনুভাবসমূহের আরও উচ্চতর ও উজ্জলতর স্ফুরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনন্ত প্রেমানন্দরসমাধুর্য্যময় শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনমদন-

গোপালদেবের স্বরূপানুভাবের নিমিত্ত হৃদ্‌বৃত্তির এইরূপ উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর বিকাশ একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুখানুভবশক্তি দ্বারা সেই সুখস্বরূপের এক বিন্দুর নিখর্ব্ব অংশের এক অংশের নিখর্ব্বাংশও অনুভব করিতে পারি না। তাঁহার বিরহজনিত দুঃখের অনুভূতিও আমাদের পক্ষে ধারণার অতীত। ভাবের বিকাশের ও ভাবের স্ফুরণের অভাবে সেই নিখিলরসামৃততত্ত্বসম্বন্ধীয় সুখদুঃখানুভব আমাদের মত জড়ীভূত চিৎকণের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ব্রজগোপীরা এই সকল উচ্চতর ভাবের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি-স্বরূপিণী। তন্মধ্যে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা প্রেমানন্দরসমাধুর্য্য-জগতের একচ্ছত্রা মহারাণী। শ্রীরাধার অনুভাব-উৎকর্ষের সম্বন্ধে শিববাক্য এই ঃ—যথা উজ্জ্বলনীলমণিতে—

> লোকাতীতমজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখং
> দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্।
> নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
> প্রেমোত্থংসুখদুঃখসিন্ধু-ভবয়োর্ব্বিন্দেত বিন্দোরপি॥

অর্থাৎ মহাদেবী একদিবস মহাদেবের নিকট শ্রীরাধিকার প্রেম-বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে মহাদেব বলেন, "প্রিয়ে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই, বৈকুণ্ঠের নিখিলভক্তবর্গের ত্রৈকালিক সুখদুঃখ সঞ্চিত করিয়া যদি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপ কর, অথবা কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণের ত্রৈকালিক সুখদুঃখ যদি সঞ্চিত করিয়া পৃথক্ দুই স্তূপে স্তূপীকৃত কর, তাহা হইলে দেখিবে,—এই বিপুলবিশাল সুখের স্তূপ বা দুঃখের স্তূপ

শ্রীরাধার উচ্ছ্বলিত প্রেমসুধাসিন্ধুর সুখের বা দুঃখের এক বিন্দুর সহিতও তুল্য হইতে পারে না।"

শ্রীমতীর অধিরূঢ়ানুভাবের বৈশাল্য ও গাম্ভীর্য্য কীদৃশ, এতদ্দ্বারা তাহার একটুকু আভাস দেওয়া হইয়াছে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসরাজের রসানুভাবের নিমিত্ত চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের জন্য কি প্রকার সাধন প্রয়োজনীয়, ভক্তিপথের পথিক মানবগণ ইহা হইতেই তাহার আভাস গ্রহণ করুন। মহাভাব, রূঢ়ভাব ও অধিরূঢ়ভাব এই সকলই শ্রীবৃন্দাবনের সম্পত্তি।

মোদন ও মাদন ভেদে অধিরূঢ় দ্বিবিধ। মোদনের লক্ষণ এই—

"মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্।"

যে অধিরূঢ়ভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক অনুভাবসমূহ বিশেষরূপে সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম মোদন। ইহার অন্য একটি লক্ষণ এই—

হরের্যত্র সকান্তস্য বিক্ষোভভরকারিতা।
প্রেমোরুসম্পদ্বিখ্যাতকান্তাতিশয়িতাদয়ঃ॥
রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্ব্বতঃ।
যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবরো॥

ব্রজগোপীমাত্রেই এই উচ্চতর শ্রেণীর অনুভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই মোদন-অধিরূঢ়ভাব কেবল শ্রীরাধিকাযূথেই বর্ত্তমান। ইহা হ্লাদিনী শক্তিরই পরমাবৃত্তি। শ্রীরাধাযূথেই এই অধিরূঢ় ভাব প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত ইহাকে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মোদনভাবের প্রভাবে রুক্মিণীপ্রভৃতিকান্তাগণসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণও বিক্ষুব্ধ হন। ব্রজদেবীর এই ভাবের প্রভাবে

কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীসহ শ্রীকৃষ্ণ-সম্মিলন-কালে রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষী-গণ একবারে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরাধার মোদন-ভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মহিষীগণ স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করেন, কিন্তু মোদন-ভাবাবিষ্টা শ্রীরাধা তাঁহাদের অস্তিত্ব পর্যান্ত অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই।

মোদনের আর একটি গুণ,—প্রেমোরুসম্পদ্বতীবৃন্দাতিশয়িত্ব। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি উচ্চতর প্রেমসম্পদ্বতী। কিন্তু মোদনভাব তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতেও প্রকাশ পায় না। তাঁহাদের অপেক্ষাও মোদনে প্রেমের আতিশয্য অনেকগুণে অধিকমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। শ্রীরাধার মোদন ভাবে আকৃষ্ট হইয়া রসরাজ অতি প্রেমবতী চন্দ্রা-বলী প্রভৃতিকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধিকায় আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইহা মোদনেরই প্রবল আকর্ষণ। সকল প্রেমবতী অপেক্ষা মোদন-ভাববিশিষ্টা শ্রীরাধার প্রেম অনেক অধিক।

মোদন ও মাদন এই উভয়ই সম্ভোগ-দশার ভাবাতিশয্যবিশেষ; কিন্তু সম্ভোগে ও বিপ্রলম্ভে—উভয়েই মোদনের কার্য্য প্রকাশ পায়; তাই উজ্জ্বলনীলমণিকার লিখিয়াছেন—

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহ-বৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ।

অর্থাৎ বিরহদশায় এই মোদন "মোহন" নামে অভিহিত হয়। তখন বিরহ-বৈবশ্য বশতঃ উহাতে সাত্ত্বিকভাব সকল সুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। যথা উজ্জ্বলনীলমণিতে :—

উদ্বেপথুবাষ্মমানদশনা কণ্ঠস্থলান্তর্লুঠৎ
জল্পা গোকুলমণ্ডলীং বিদধতী বাষ্পৈর্নদীমাতৃকম্।
রাধা কণ্টকিতেন কণ্টকিফলং গাত্রেন ধিক্‌কুর্ব্বতী
চিত্রং তদ্‌ঘনরাগরাশিভিরপি শ্বেতীকৃতা বর্ত্ততে।

অর্থাৎ উদ্ধব বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে উদ্ধব বলেন—ব্রজের দশা আর কি বলিব, শ্রীমতী রাধিকার দশাই বলিতেছি—কম্পে কম্পে শ্রীরাধার দন্ত-ঘর্ষণ হয়, বাক্য গদ্‌গদ হইয়া কণ্ঠেই মিলিয়া যায়, তাঁহার নয়নজলে বৃন্দাবনভূমি কর্দ্দমিত হয়, গাত্র কণ্টকিত হইয়া কণ্টকীফলের কণ্টক গুলিকেও ধিক্‌কৃত করে, তোমার অনুরাগ দ্বারা লোকের আনন্দের উদ্রেক হয়, দেহ ও চিত্ত প্রফুল্ল হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীরাধা তোমার অনুরাগে শ্বেতাঙ্গী হইয়াছেন।

অতঃপর মোহন ভাবের অনুভাব বিবৃত হইয়াছে, যথা :—

অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনং।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাৎ॥
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ।
প্রায়ো বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি॥

মোহন ভাবে কান্তাসংশ্লিষ্ট হইয়া ব্রজসুন্দরীর নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা হয়, গোপীরা অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-কামনা

করেন, গোপীদের দুঃখে ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব সংঘটিত হয়, তির্য্যক্ প্রাণীরাও তাঁহাদের দুঃখে রোদন করে, ইঁহারা মৃত্যু স্বীকার করিয়া স্বীয় দেহের পঞ্চভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা বাঞ্ছা করেন। ইহাতে দিব্যোন্মাদাদি বহু অনুভাব প্রকাশ পায়। বৃন্দাবনেশ্বরীতেও এই মোহন ভাব পরিলক্ষিত হয়।

দিব্যোন্মাদ এই মোহনের অনুভাব-বিশেষ। মোহনের অনুভাব সকলের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া অতঃপরে দিব্যোন্মাদের কথা বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

মোহন অবস্থার ভাবাতিশয্য অতীব চমৎকার। এই অবস্থায় স্বয়ং অসহ্যদুঃখস্বীকার করিয়াও গোপীরা কৃষ্ণসুখের কামনা করেন। শ্রীচরিতামৃতকার এই বাক্যের বিবৃতি করিয়া লিখিয়াছেন :—

গোপীগণের প্রেম মহারূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম,—কভূ নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল॥
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল।
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥

* * *

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥

পূজ্যপাদ উজ্জ্বলনীলমণিকার মোহনভাবের এই ব্যাপারকে "অসহ্যদুঃখস্বীকারাৎ তৎসুখকামতা" নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার একটা উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আছেন, উদ্ধব ব্রজে গিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীকৃষ্ণকে আপনি কোন মনের কথা জানাইতে চাহেন কি?" শ্রীরাধা তদুত্তরে বলিলেন—

স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্গোষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে
যদ্যল্পাপি ক্ষতিরুদয়তে তস্য মাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদার্ত্তিরুগ্রা ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদি চেত্তত্র বাসং করোতু।

"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিলে আমার সুখ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয়, তবে তিনি যেন কখনই বৃন্দাবনে না আইসেন। আর তিনি মথুরা নগর হইতে না আসিলে যদিও আমার গুরুতর পীড়া হয় এবং তাহাতেই যদি তাঁহার সুখ হয়, তাহা হইলে তিনি সেইখানেই বাস করুন।"

মহাভাবস্বরূপিণীর প্রেম-মহিমা কেমন ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই ভাবের আর একটি ব্যাপার,—ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভ-কারিতা। উহার উদাহরণ এই—

নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্ব্যাকুলং স্বেদমূহে
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচন্নশ্রুবৈকুণ্ঠভাজঃ।
রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেমনিশ্বাসধূমে
পূর্ণানন্দেঽপ্যুষিত্বা বহিরিদমবহি চার্ত্তমাসীদজাণ্ডম্॥

অর্থাৎ নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন "শ্রীরাধার প্রেমনিশ্বাস-ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইলে অতি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহাতে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সকল পদার্থই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল, নরলোকে উচ্চ রোদনের ধ্বনি উঠিয়াছিল, ফণিকুল ব্যাকুল হইয়াছিল, দেবতারা ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী প্রভৃতিরাও অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বাহ্য বস্তু পূর্ণানন্দে বাস করিয়াও অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছিল।

নান্দীমুখী সাক্ষাৎ ভাগবতী শক্তি। তিনি বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অপিচ শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তির চরমসারস্বরূপিণী। তাঁহার আনন্দেই জগতের আনন্দ, তাঁহার বিষাদেই জগতের বিষাদ। সর্ব্বাহ্লাদিনী মহাশক্তীশ্বরীর বিষাদ-নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে যে বিশাল দুঃখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইবে, ইহাতেই বা বৈচিত্র্য কি আছে? ইহার আরও একটি উদাহরণ এই :—

ঔর্ব্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং দুর্ব্বলেনোরসা মে
তাপঃ প্রৌঢ়ো হরিবিরহজঃ সহ্যতে তন্ন জানে।
নিষ্ক্রান্তা চেদ্ভবতি হৃদয়াদ্‌যস্য ধূমচ্ছটাপি
ব্রহ্মাণ্ডানাং সখি কুলমপি জ্বালয়া জাজ্বলীতি ॥

শ্রীরাধা বলিলেন, "সখি, শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল বাড়বানল হইতেও প্রখরতর। আমি কিরূপে যে সেই জ্বালা সহিতেছি তাহা বলিতে পারিনা। যদি ঐ তাপের ধূমচ্ছটাও আমার হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে বোধহয় ঐ জ্বালায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গলাভের নিমিত্ত গোপীদের তৃষ্ণা কিরূপ বলবতী হইয়া উঠে, এই ভাবে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে। গোপীরা মৃত্যু স্বীকার করিয়াও পঞ্চভূতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনা করেন, যথা :—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥

শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন "সখি, শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আগমন না করেন তবে এজীবনে আর তাঁহার সহিত আমার দেখা হইবে না, তিনিও আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। সুতরাং এত ক্লেশে আর এ দেহ রাখিয়া লাভ কি? আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তুমি আর আমার এ দেহ রক্ষা করিও না। আমার দেহস্থ

পঞ্চভূত বিয়োজিত হইয়া পঞ্চভূতে মিশ্রিত হউক, আমি অবনত মস্তকে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণের বিহার দীর্ঘিকাতে আমার দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার জ্যোতি, তাঁহার প্রাঙ্গনের আকাশে এই দেহাকাশ, তাঁহার গমনপথে এই দেহের ক্ষিতি এবং তদীয় তালবৃন্তে আমার দেহের বায়ু বিমিশ্রিত হউক।"

দেহত্যাগে পঞ্চভূতের সহায়তায় আসঙ্গলিপ্সার চরিতার্থতাসাধন বাসনা গোপী প্রেমের এক অদ্ভুত মহিমা। মোহন ভাবের এই সকল অদ্ভুত বিক্রম প্রকৃতপক্ষেই প্রেমের পরাকাষ্ঠাসূচক। এই মোহনভাব হইতেই দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি। পূজ্যপাদ শ্রীল উজ্জ্বল-নীলমণিকার লিখিয়াছেন :—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥

অর্থাৎ মোহনভাব কোন প্রকার অদ্ভুত গতি প্রাপ্ত হইয়া যখন এক প্রকার ভ্রমাভ বৈচিত্রীতে উপনীত হয়, তখন উহা দিব্যোন্মাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাবরাজ্যে দিব্যোন্মাদ প্রকৃতই অদ্ভুত ব্যাপার। ভাবের আতিশয্যে ভ্রমের আবির্ভাব! এই অবস্থায় মেঘ দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভ্রম হয়, তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রম হয়,—আরও নানা প্রকার প্রমাভা বৈচিত্রী সঞ্জাত হইয়া বিরহ-বিবশা শ্রীরাধার ভ্রমময়ী চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্য বৈষ্ণব সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পত্তি, রসশাস্ত্রের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম বিষয় এবং ভজন-রাজ্যের উচ্চতম তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবনে উদ্ধব-আগ-

মন-প্রসঙ্গে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। নবম শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

> মহাভাববিশেষস্ত গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
> ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥
> উদ্ঘূর্ণা চিত্র জল্পাদ্যা স্তদ্‌ভেদা বহবো মতাঃ।
> প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে প্রণয়-ক্রোধজৃম্ভিতঃ ॥
> ভূরিভাবময়ো জল্পশ্চিত্র জল্পস্তদুদ্ভবঃ ॥

ভ্রমর দেখিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণদূত বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি ভ্রমরকে কৃষ্ণদূত মনে করিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, উহা চিত্রজল্প নামে খ্যাত। ঘূর্ণা ও চিত্র জল্পাদি দিব্যোন্মাদের বহুল প্রকার ভেদ আছে। প্রণয়ক্রোধপূর্ণ বহুলভাবময়ী উক্তিই জল্প নামে খ্যাত। উহা হইতেই চিত্র জল্পের উদ্ভব। চিত্রজল্পাদি সম্বন্ধে এখানে সবিশেষ কোন কথা বলা হইবে না। এস্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদই সবিশেষ আলোচ্য।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

> কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
> কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥
> উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।
> ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥
> রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
> সেইভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় ইথে কি বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয়॥

শ্রীচরিতামৃতের এই পয়ারসমূহের কিঞ্চিৎ বিবৃত করার নিমিত্তই ইতঃপূর্ব্বে ভাব, রূঢ়ভাব, ও অধিরূঢ় ভাবাদির আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণনাই এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। দিব্যোন্মাদসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে কোন্ ভাব হইতে দিব্যোন্মাদের উৎপত্তি, অগ্রেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সামান্যকারে শ্রীরাধার ভাব বিবৃত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক মহোদয়গণ তাহা হইতেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেম-রসাস্বাদনের গাম্ভীর্য্যের লেশাভাস অনুভাব করিতে পারিবেন।

ভাবরাজ্যের স্তরবিভাগ এবং প্রত্যেক স্তরের বিশিষ্টতা শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, জগতের কোনও দার্শনিক লেখক এরূপভাবে আর কখনও এইরূপ সূক্ষ্মভাবে ভাবের দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করিতে পারেন নাই। এই ভাবরাজ্যের মধ্য দিয়া কি-প্রকারে "রসো বৈ সঃ" পদার্থ অধিগম্য হয়, কি প্রকারে তাঁহার আভাস অনুভূত হয়, জগতের আর কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায় অথবা দার্শনিক সম্প্রদায় তৎপ্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর পার্ষদগণ এই অনন্যদৃষ্ট রসময় সুন্দর রাজ্য এবং-আলোকের সম্পাতে আবিষ্কৃত করিয়া সাধকগণের নেত্রসমক্ষে সমুপস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার অন্তরালে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, শঙ্কর-স্বামী প্রভৃতি ব্রহ্মতত্ত্বদর্শীদেরও তাহা অবিদিত

ছিল, এমন কি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যাগণও এই রাজ্য-সন্দর্শনে সমর্থ হন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ,—ভজন রাজ্যের অতি শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন মহাভাগ্যবানের কর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অতি প্রিয়তম পার্ষদ, তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপ,—শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর জীবগণের প্রতি পরম কৃপালু ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই লীলা সূত্রাকারের বর্ণনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গ্রন্থ লোক-লোচনের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার সন্ধান পাইলাম না। এ দুঃখ চিরদিনই মনে ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকিবে। দিব্যোন্মাদলীলার সূত্রকারদের মধ্যে অপর ভাগ্যবান্—শ্রীমদ্দাস-গোস্বামী। শ্রীপাদ স্বরূপের কৃপায় তিনি এ বিষয়ের অনেক সংবাদ জানিতেন, নিজেও অনেক লীলা ষোড়শবর্ষ কাল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনিও এ সম্বন্ধে সামান্যাকারে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে পরমকারুণিক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা ও শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর কড়চা হইতে এই দিব্যোন্মাদের লীলা-সূত্রের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়া প্রেমিক ভক্তগণের সাধন-সম্পত্তি বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ কবিরাজ যদি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় আর কোন তত্ত্ব বা তদ্ঘটিত আর কোন সিদ্ধান্ত বিবৃত না করিয়া কেবল এই দিব্যোন্মাদ লিখিয়াই তদীয় বার্দ্ধক্যে লেখনীর বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চিরদিন

পরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভক্তি সহকারে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকিতেন।

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ প্রেমিক ভক্তগণের নিকট যে কীদৃশ অমূল্য ধন, আমরা তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। মহামাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রেমে ভক্তহৃদয়কে কি প্রকারে আকর্ষণ করিয়া প্রেমের কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির বলে আপনার শ্রীচরণারবিন্দমকরন্দের দিকে আকৃষ্ট করেন, কি প্রকারের জগৎ ভুলাইয়া, জগতের প্রলোভনীয় দ্রব্যের প্রলোভন বিনাশ করিয়া মায়াপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব বিনষ্ট করিয়া ভক্তিসাধক প্রেমিক ভাগবতকে কৃষ্ণময় করিয়া উন্মত্ত করেন, দিব্যোন্মাদলীলাই তাহার পথপ্রদর্শনের আলোকবর্ত্তিকা। দিব্যোন্মাদ-লীলা আস্বাদন করিয়াই প্রেমিক ভক্ত বুঝিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কেমন মহামহীয়সী আকর্ষণ-শক্তি। শ্যামের বাঁশীর রবে ব্রজবালাগণ লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া,—উন্মাদিনী হইয়া কণ্টককঙ্করময় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করেন, ইহা এক উন্মাদিকা শক্তির কার্য্য। ইহাতেও জ্ঞানের উচ্ছ্রিতমস্তক বিচুর্ণ হইয়া যায়, ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হয়, লজ্জা-শীলতা প্রভৃতি নির্ম্মূল হইয়া পড়ে। শ্যামসোহাগিনী শ্যামের বাঁশরীর রবে উন্মাদিনী হয়েন, শ্যামবিরহেও উন্মাদিনী হন। সে উন্মাদ ও দিব্যোন্মাদ এক কথা নহে—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট আছে। দিব্যোন্মাদের তুলনায় সাধারণ উন্মাদে ভাবের গভীরতা অল্পতর—বৈচিত্রী-বিকাশ সবিশেষ পরিলক্ষিতই হয় না। সাধারণ উন্মাদের লক্ষণ আমরা উদাহরণ সহ ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। দিব্যোন্মাদের লক্ষণও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্যামবিরহে মহাভাবস্বরূপিণীর অধিরূঢ় মহাভাব মোহনাবস্থায় এক অনির্ব্বচনীয় চমৎকার দশা প্রাপ্ত হয় এই দশার প্রেমবৈচিত্ত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা বিরহব্যাকুলতানিবন্ধন মানসিক ব্যাপারের অসাধারণী ক্রিয়াবিশেষ। জগতে যত প্রকার উন্মাদ আছে কোনও উন্মাদের সহিত উহার তুলনা নাই। ইহা প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় চিত্তবিমূঢ়তা নহে—অথবা মস্তিকের বিকৃতি নহে। অথচ প্রাকৃত লোকের নিকট এই দিব্যোন্মাদ প্রকৃত উন্মাদ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কেননা, তাঁহারা উহার সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচারে অসমর্থ। উজ্জ্বল-নীলমণিতে যে ভাব "উত্তর ভাব" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই ভাবের লেশাভাসও এই প্রাকৃত জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই ভাবের পরাকাষ্ঠাতেই যখন দিব্যোন্মাদের আরম্ভ, তখন দিব্যোন্মাদ ও প্রাকৃত উন্মাদ কোনও ক্রমে এক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। দিব্যোন্মাদের তত্ত্ব অতি নিগূঢ়। এই উন্মাদ অপ্রাকৃত সুতরাং দিব্য। প্রাকৃত উন্মাদ ভ্রমময়, কিন্তু এই দিব্যোন্মাদ ভ্রমাত্ম হইয়াও নিত্যসত্যসন্দর্শী। উহা নামতঃ উন্মাদ হইলেও,—বাহ্যজগতের হিসাবে উহা ভ্রমাত্মপূর্ণ হইলেও—যাহা পরম সত্য, এই উন্মাদে কেবল তাহাতেই চিত্তের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, সুতরাং এই দিব্যোন্মাদ সাক্ষাৎ ভগবৎরসমাধুর্য্য-সম্ভোগের অবস্থা। অতঃপরে ইহার তত্ত্ব সবিশেষ আলোচ্য।

যাহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলামাধুর্য্যের বিন্দুমাত্রও জানে না, তাঁহার অলৌকিক দিব্যলীলায় যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা তদীয় দিব্যোন্মাদকে প্রাকৃত উন্মাদ বলিয়া মনে করিবে ইহা বিচিত্র নহে।

প্রাকৃত উন্মাদের কোন কোন লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহ্যলক্ষণেও পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ এই যে ইহাতে ভ্রম, চিত্ত-চাঞ্চল্য, কাতরতা, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন এবং হৃদয়ের শূন্যতা অনুভূত হয় এবং রোগী নিরর্থক কথা বলে। অপিতু এই রোগে রোগী হাসিবার কারণ না থাকিলেও প্রায় সর্ব্বদাই অল্প অল্প হাসিয়া থাকে। নৃত্যগীত, অধিক কথা বলা, অঙ্গ-বিক্ষেপ, রোদন, শরীরের কর্কশতা, কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। * এই সকল লক্ষণ দিব্যোন্মাদের বাহ্যলক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অতত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট দিব্যোন্মাদও যে প্রাকৃত উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত ও অসমীচীন, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রাকৃত উন্মাদ ও দিব্যোন্মাদ।

সাধারণ রসশাস্ত্রে বর্ণিত উন্মাদকে প্রাকৃত উন্মাদ বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। প্রাকৃত নায়িকা প্রণয়ী নায়কের বিরহে বিরহে ব্যাকুল হয় এবং সেই ব্যাকুলতা হইতে উন্মত্ততা উপস্থিত হয়। মাতা প্রাণের প্রাণ পুত্রধনকে হারাইয়া শোকে

---

* ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ, পর্য্যাকুলাদৃষ্টিরধীরতা চ।
অবদ্ধবাক্‌ত্বং হৃদয়স্য শূন্যং সামান্যমুন্মাদপদস্য লিঙ্গম্।
চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রম্।
অহাসহাস্যস্মিতনৃত্যগীতবাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এইরূপ মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছায় তাঁহার মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, অবশেষে তিনি উন্মাদিনী হইয়া ঘরে বাহিরে পুত্রের অনুসন্ধান করেন এবং বৎসহারা ধেনুর ন্যায় আকুল প্রাণে পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান; এইরূপ বিবিধ প্রকার বিরহব্যাকুলতাজনিত উন্মাদ এ জগতে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও বহু কারণে বহু বিধ উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল লক্ষণ বহু পরিমাণে দিব্যোন্মাদেও পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় এক-বিষয়োন্মত্ততায় (Monomania) যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উন্মত্ততা আংশিক উন্মত্ততা মাত্র। ইহারা কোন এক বিশিষ্টবিষয়ে বিচারশক্তি স্থির রাখিতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের বুদ্ধিবিবেচনার কোন প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রোগে কুটীরবাসী দরিদ্র রোগী নিজকে রাজাধিরাজ বলিয়া মনে করে, আবার অপর পক্ষে প্রাসাদবাসী রাজার সন্তানও নিজকে দীনাতিদীন বলিয়া মনে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, তরুতলে শয়ন করে, অন শনে অনিদ্রায় দুঃখ ক্লেশে দিনপাত করে। সে যে রাজাধিরাজের সন্তান তাহার সে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তাহার সহিত অপরাপর বিষয়ে আলাপ করিলে কিছুতেই তাহাকে উন্মাদরোগাক্রান্ত বলিয়া মনে করা যায় না। এক বিষয়ের ভাবনায় যে উন্মাদ জন্মে, তাহাও প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত উন্মাদ। উহাতে দিব্যোন্মাদের যত লক্ষণই থাকুক না কেন, উহা দিব্যোন্মাদ নহে।

উন্মাদ-লক্ষণ বর্ণনায় জনৈক বিখ্যাত চিকিৎসক লিখিয়াছেন। উন্মাদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই ভ্রমসংস্কারের বশবর্ত্তী। উন্মত্ত ব্যক্তি কাল্পনিক মুর্ত্তি দেখিতে পায়, কাল্পনিক মুর্ত্তির সহিত কথা বলে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কোন রোগী তাহার ভ্রম বুঝিতে পারে, আবার কেহ কেহ স্ব স্ব ভ্রম আদৌ বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায় অপরে কোথাও কিছু না দেখিলেও সে কাল্পনিক রূপ দেখিতে পায়, অপরে কোনও শব্দ শুনিতে না পাইলেও সে অপরের অশ্রুত কাল্পনিক অশরীরী বাক্য শুনিতে পায়।

কোন কোন সময়ে এই রোগের লক্ষণগুলি আদৌ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। রোগীর ব্যবহার, মুখের ভাবভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও উহার কথাবার্ত্তায় কোনও ক্রমে উহাকে পাগল বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু উহার মন কোন এক বিষয়ে অস্বাভাবিক ভাবে প্রমত্ত হইয়া পড়ে।

একশ্রেণীর উন্মাদগ্রস্ত লোকের মন বিষয়-বিশেষে অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়া নিজকে সর্ব্বতোভাবে দুঃখী বলিয়া মনে করে, সংসারের কোনও কার্য্যে ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা সতত বিষণ্ণ থাকে। তাহাদের দুঃখ বিমোচন করার নিমিত্ত যে কোন কার্য্য করা যাউক না কেন সেই সকল কার্য্যই তাহাদের নিকট ক্লেশকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সকল প্রকার কার্য্যেই ইহাদের বিরক্তি জন্মে। আহারে বা বিহারে কিছুতেই ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না ইহারা একাকী থাকিতে চাহে, কিন্তু নির্জ্জন স্থানেও ভয় পায়,

ইহাদের সুনিদ্রা হয় না। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ইহারা 'লাইপিম্যানিয়াক্' নামে অভিহিত হয়।

আর এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত লোক "আত্মহা" উন্মাদ রোগী নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা সর্ব্বদাই আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত থাকে কিন্তু লোকে ইহাদের অভিসন্ধি না বুঝিতে পারে এই নিমিত্ত আত্মভাব গোপন করিয়া লোকের নিকট উহারা ধীরভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে কিন্তু সময় ও সুবিধা পাইলেই আত্মহত্যা করে। এইরূপ আরও বিবিধ প্রকার উন্মাদরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কেহবা নরহত্যাপ্রিয় কেহ বা অগ্নিদ, এবং কেহবা চৌর্য্য-প্রিয়, কেহ বা ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত আবার কেহ বা কামোন্মাদগ্রস্ত।

আয়ুর্ব্বেদও এই প্রকার বিবিধ উন্মাদের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। শোকজনিত, বিষজনিত, ভুতজনিত, দেবগ্রহজনিত, গন্ধর্ব্বজনিত, যক্ষগ্রহজনিত, পিতৃগ্রহজনিত, সর্পগ্রহজনিত, রাক্ষস ও পিশাচজনিত উন্মাদের বিবরণ মাধবীয় নিদানে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু দিব্যোন্মাদ এক অলৌকিক অপ্রাকৃত ব্যাপার।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। সে শ্লোকটী এই—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

ইহাতে জানা যাইতেছে যে যাঁহার অনুরাগ উপজাত হইয়াছে, তিনি

উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাসেন, কখন কাঁদেন কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও বা নৃত্য করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকে সংক্ষেপতঃ উন্মাদের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা মাধবীয় নিদানেও ঠিক এই প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

গায়ত্যয়ং হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ॥

উন্মাদের হাসি, গীতি ও রোদন লক্ষণ সুস্পষ্টই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিতে ও জাতানুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই বাহ্য লক্ষণ গুলির কিঞ্চিৎ সাম্য বা সাধারণতা বর্ত্তমান্ থাকিলেও উভয় ব্যক্তিতে পার্থক্য অনন্ত। শ্রীমদ্ভাগবত এই নিমিত্ত বলিয়াছেন "উন্মাদবৎ" অর্থাৎ উন্মাদের ন্যায়"। উন্মাদগ্রস্তের লক্ষণ জাতানুরাগ ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি—মূঢ়; অপরপক্ষে জাতানুরাগ ব্যক্তি পরম প্রেমময়ের প্রেমজ্যোৎস্নার মধুর কিরণে আনন্দতরঙ্গে উদ্ভাসিত,—আনন্দোন্মত্ত; একজন রজস্তমে অভিভূত, অপরজন বিশুদ্ধ সত্বগুণের অমৃত কিরণে সমুজ্জ্বল; একজন অজ্ঞানের অন্ধতমিস্রে নিমজ্জিত, অপরজন সচ্চিদানন্দের আনন্দময়-ধামের অভিমুখে অগ্রসর। একজন মাস্তিস্ক পদার্থের বিকৃতিজনিত রোগ-নিবন্ধন শোচনীয়রূপে রোগার্ত্ত—অপর জন আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিয়া লোকাতীত আনন্দময়ধামে প্রবিষ্ট। প্রাকৃত উন্মাদ নরকের হেতু,—আর সাত্বিক উন্মাদ প্রেমময়ের গোলকধামের পথপ্রদর্শক।

কিন্তু দিব্যোন্মাদ ইহার অনেক উপরে। দিব্যোন্মাদে শ্রীবৃন্দা-বনের মাধুর্য্য প্রকটিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রাকৃত জগতের

সকল প্রকার ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, প্রাকৃত জগতের সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহজগতের সকল প্রকার কামনা ও বাসনা অন্তর্হিত হয়। দিব্যোন্মাদে অনবরত মধুময়ী শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তিতে দিব্যোন্মাদী নিয়ত শ্রীকৃষ্ণময় রাজ্যে বিচরণ করেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হয়, সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলীলা-সন্দর্শন হয়। এই অবস্থায় প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত ভাবনিচয়ের লেশাভাস পরিদৃষ্ট হয় না। ফলতঃ দিব্যোন্মাদ আত্মার চরমোৎকর্ষ-সিদ্ধির বিপুল বিশাল অবস্থা। প্রাকৃত জীবের পক্ষে দিব্যোন্মাদ সম্ভবপর নহে। দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধিকার ভাবসম্পত্তির অতি নিগূঢ় অবস্থা— শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই অতি নিগূঢ় অবস্থা প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দের নিকট সুপ্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ এই অবস্থার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই শ্রীগ্রন্থ এখন অপ্রাপ্য। পরমকারুণিক শ্রীচরিতামৃতকার তদীয় গ্রন্থে এই নিগূঢ় লীলা যেরূপ সুমধুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারিলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে, যে মোহনাখ্য ভাবের ভ্রমাভাবৈচিত্রী-বিশেষই দিব্যোন্মাদ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাকৃত উন্মাদে চিত্তভ্রম ঘটে, কিন্তু দিব্যোন্মাদে যে অপ্রাকৃত রাজ্যের স্ফূর্ত্তি হয়, উহা ভ্রম নহে। শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "সত্য" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতের প্রথম শ্লোকেই

"সত্যং পরং ধীমহি" বলিয়া এই পরম সাত্ত্বিক পুরাণের মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। ইহার আদিতে মধ্যে ও অন্তে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ পরম সত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি পরম সত্য, যাঁহার ধাম পরম সত্য ও নিত্য,—তাঁহার স্ফূর্ত্তি, তাঁহার ধামাদির স্ফূর্ত্তি, বা তাঁহার লীলাগুণাদির স্ফূর্ত্তি অবশ্য পূর্ণ ও পরম সত্য। এই পরম সত্যের স্ফূর্ত্তি কখনও "ভ্রম" বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

ব্যাবহারিক জগতের পদার্থনিচয় যে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই পরম সত্যের প্রভাব ও বৈভবই তাহার কারণ। সেই পরম সত্য স্বয়ং স্ফূর্ত্তি পাইলে ব্যাবহারিক সত্যের ব্যাবহারিক জ্ঞান তিরোহিত হয়—সেই সকল পদার্থের স্থলে অপ্রাকৃত পদার্থ প্রকাশমান হন শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হন। প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত জনগণের নিকট তাদৃশ মহানুভবের অনুভাব ভ্রমাত বলিয়া প্রতীত হয় বটে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞদিগের নিকট উহাই প্রকৃত সত্য।

শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দিব্যোন্মাদ-বর্ণনায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যে ভ্রম-দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, কেবল প্রাকৃত জনগণের ব্যাবহারিক প্রমাজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াই পরম কারুণিক তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার ঐরূপ লিখিয়াছেন। মেঘসন্দর্শনে কৃষ্ণভ্রম, চটক-পর্ব্বত-সন্দর্শনে গোবর্দ্ধন-ভ্রম, সমুদ্রের সুনীল সলিল-সন্দর্শনে যমুনা-ভ্রম ইত্যাদি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের ভ্রমাভাবৈচিত্রী মধ্যে পরিগণিত। ফলতঃ মহাপ্রভু মেঘকেই কৃষ্ণ বলিয়া মনে করেন নাই, চটক পর্ব্বতকেও গোবর্দ্ধন বলিয়া ভ্রান্ত হন নাই, সমুদ্রকে

তিনি যমুনা মনে করিয়া প্রাকৃত উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমজ্ঞানের বশীভূত হন নাই। এই সকল পদার্থ উদ্দীপক মাত্র। এই সকল পদার্থের সন্দর্শনে পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ভাবুক হৃদয়ে অধিকতররূপে উদ্দীপ্ত হয়, উদ্দীপ্ত হওয়া মাত্রই প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, মায়িকজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তৎস্থলে পরম সত্যের প্রকৃত জ্ঞান, চিত্ত অধিকার: করিয়া বসে। এইরূপে মেঘের স্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ধাম ও লীলাদির সম্বন্ধে এইরূপ পারমার্থিক স্ফূর্ত্তিপ্রকাশ পায় এবং সেই সকল প্রাকৃত পদার্থও তখন সচ্চিদানন্দময়ত্বে পরিণত হইয়া যায়।

ধ্যাতার নিকট ধ্যেয় পদার্থের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে, এবং দিবানিশি ব্রজধামের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে এই নিত্যসত্য পরম পুরুষ যে ধাম ও পরিকরাদির সহিত প্রকটীভূত হইয়া ধ্যান-নিমজ্জিত সাধককে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন, দিব্যোন্মাদে ভজনের সেই চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সেই সরসসম্ভোগ সপ্রমাণ হইয়াছে।

ফলতঃ ভজনের যাহা চরমলক্ষ্য এই দিব্যোন্মাদে তাহাই অভি-ব্যক্ত হইয়াছে। নিরন্তর কৃষ্ণানুধ্যানে প্রাকৃত জগতের ভ্রমজ্ঞান তিরোহিত হইয়া পারমার্থিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাকৃত ও ব্যব-হারিক পদার্থের স্থলে পারমার্থিক পরম সত্য সুপ্রকাশিত হন, সুতরাং দিব্যোন্মাদই প্রকৃত প্রমা—প্রকৃত পরমসত্যের উপলব্ধি ও সম্ভোগের উপায়। মহানুভাবগণ এই ভাব লাভ করিবার নিমিত্ত মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার রসময় ভজনসিন্ধুর বিন্দুমাত্র লাভ করি-

যার জন্য ব্যাকুলপ্রাণে নিরন্তর প্রার্থনা করেন, এবং গোপীগণের অনুগত হইয়া সাধনের পথে অগ্রসর হন। ভাবের পরে ভাব, তাহার পরে নব নব কত শত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ভাব সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, সেই সকল ভাবের আতিশয্য ও প্রভাবে বাহ্য জগতের জ্ঞান, বাহ্য জগতের ধারণা, প্রেমিক ভক্তহৃদয় হইতে ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে, বাহ্য দশার কাল পরিমাণ হ্রাস হয়, অন্তর্দ্দশায় বাহ্যজগৎ একবারেই সাধকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন সাধক নিত্য রসময়ধাম, নিত্য রসময়ীলীলা ও নিত্যানন্দময় শ্রীমূর্ত্তির বিহার প্রত্যক্ষ করিয়া সচ্চিদানন্দরসে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তাঁহার সাধনা তখন কৃতার্থ হয়। ইহাই বৈষ্ণব ভজনের চরম লক্ষ্য। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিব্যোন্মাদলীলা-প্রকটন করিয়া ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র মূল সত্য। তিনি রস-স্বরূপ। রসের ভজন-পদ্ধতি প্রকটন করাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলার বহু উদ্দেশ্যের একতম। আনন্দময়চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা গোপীকাগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। মানুষের পক্ষে সেরূপ ভাগ্য সম্ভবপর নহে, মানুষের পক্ষে তাদৃশ অনুরাগও অসম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণে-মননে ও নিদিধ্যাসনে ব্রজরসের স্ফূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবিনী এবং প্রেমময়ের নিত্যধামের লীলারসাস্বাদন অবশ্যম্ভাবী। দয়াময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ-ভাব প্রকটন করিয়া ভজননিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত এই মহীয়সী আশার আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণ সেই ভরসাতেই

ভজনানন্দে আবেশে আবেশে বৃন্দাবনীয় লীলারসাস্বাদন করার নিমিত্ত শ্রীশচীনন্দনের প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ করেন। তাঁহার দিব্যোন্মাদ দশার দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করা অতি প্রয়োজনীয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদবর্ণন শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এক অত্যদ্ভুত বিশিষ্টতা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরিতামৃত সম্বন্ধীয় অন্য কোন গ্রন্থে এই দিব্যোন্মাদ লীলা বর্ণন পরিলক্ষিত হয় না। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদস্বরূপের কড়চা হইতে এই লীলা সংগ্রহ করিয়া স্বীয় অনুভাবের সাহায্যে শ্রীচরিতামৃতে যথাসম্ভব ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

স্বরূপ গোসাঞী আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর আর কড়চা-কর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা-গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥

আক্ষেপের বিষয় এই যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা সম্বন্ধীয় শ্রীপাদ স্বরূপের গ্রন্থ একবারেই অদর্শন হইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত গ্রন্থ হইতে যে সার সঙ্কলন করিয়াছেন, অনুভাবী ভক্তগণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে মহাপ্রভুর শেষলীলা একবারেই দিব্যোন্মাদময়ী। শেষ দ্বাদশবর্ষকাল সিন্ধুতটে প্রেমসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর যে প্রেমলীলায় বিপ্রলম্ভরসের মহোচ্ছ্বাস প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা যমুনাতটবাসিনী গোপিকাকুলের বিপ্রলম্ভরস অপেক্ষাও যেন অধিকতর প্রগাঢ় ও অধিকতর গভীর।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কি প্রকার দশা হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে বহুবার তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী দুই এক পংক্তিতে সেই সকল দশার সুস্পষ্ট আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন।
এই মতে মহাপ্রভুর কাল বহি যায়।
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে না সামায়॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়।
স্বরূপ গোসাঞী আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি দিনে করে দুঁহে প্রভুর সহায়॥

আবার অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন॥

রাত্রি দিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে লিখিত হইয়াছে—

কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাতার্ত্ত্যা ক্ষীণেবাপি মনস্তনু।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্ত তং গৌরমাশ্রয়ে॥

কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংই ইহার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মনঃ কায়।
ভাবাবেশে তবু কভু প্রফুল্লিত হয়॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ হইতেই দিব্যোন্মাদ লীলা-বর্ণনের আরম্ভ হইয়াছে। পরম কারুণিক গ্রন্থকার এই অধ্যায়ের আরম্ভে একটি শ্লোক লিখিয়া তাহার আভাস দিয়াছেন; শ্লোকটী এই—

কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষাধিয়া।
যদ্ যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গ স্তল্লেশ কথ্যহতেধুনা॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্তি-নিবন্ধন দেহ মন ও বুদ্ধি দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার লেশাভাস বলা যাইতেছে।

শ্রীচরিতামৃতে দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে কি কি ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে, আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর নিজের উক্তি হইতেই এস্থলে সেই সকল বিষয়ের একটা সূচী প্রকাশ করিতেছি, যথা—

চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ-বর্ণন।
শরীর এথা, প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥

তাহি মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি সন্ধিত্যাগ অনুভাবের উদগম॥
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধারণ।
তাহি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানে বিলাসে।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশে॥
তাহি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তাহি মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ॥
সপ্তদশ গবী মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাই উদগম॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
"কাস্ত্রাঙ্গ তে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥
ভাবশাবল্যে পুন কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ গোপী জলকেলি তাহা দরশন॥
তাহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন।
জালিয়া উঠাইলা প্রভু আইলা স্বভবন॥
উনবিংশে ভিত্তো প্রভুর মুখ-সংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফুর্ত্তি প্রলাপ-বর্ণন॥
বসন্ত রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিরহোন্মাদের এইরূপ সূচী করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদের অনুরূপ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় ইথে কি বিস্ময়।
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

এই দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর তদীয় কড়চায় লিখিয়াছেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

ফলতঃ শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা, তাঁহার কৃষ্ণমধুরিমার আস্বাদন-প্রণালী এবং শ্রীকৃষ্ণানুভবে শ্রীরাধার যে সুখসম্ভোগ হয়, তৎসকলই এই দিব্যোন্মাদে পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দ ও পূর্ণরসস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই এই অখিল বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের উৎস। তাঁহা হইতে আনন্দধারা উৎসারিত হইয়া বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিপ্লুত হয়। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি। তিনি সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে, রূপে ও গুণে শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদ-দায়িনী। কিন্তু শ্রীরাধার ভাব-মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণেরও আস্বাদ্য। শ্রীচরিতমৃতাকার শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্যের গরিমা নিম্নলিখিত ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন —

রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
"কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জীবন সফলে"।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যত্রয় দিব্যোন্মাদ-লীলায় সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পদকর্ত্তারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই ভাব পদে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্নরহরিদাস এ সম্বন্ধে যে পদটী লিখিয়াছেন তাহা এই—

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোন নাহি রহ পঁহু পাশে॥
ঘন কান্দে তুলি দুই হাত।
কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাইপ্রেমে হইয়াছে ভোরা॥

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের এই বিরহব্যাকুল মহাভাবময় প্রতিচ্ছবি শ্রীল নরহরির চিত্রিত। এই নরহরি আমাদের সেই সরকার ঠাকুর। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমাধুর্য্যে নিরন্তর নিমজ্জিত থাকিতেন। এই পদের প্রত্যেক পদেই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বা মহাবিরহের মহাভাব প্রকটিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকান্তমঠে বিশ্রামাবাসের গম্ভীরায় কৃষ্ণ-বিরহে নিরন্তর ব্যাকুল। সারাদিন কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, রাত্রিকালে কৃষ্ণবিরহের অনলধারা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া প্রভুকে বিপ্লুত করিয়া তুলে, ক্ষণার্দ্ধও তাঁহার নিদ্রা হয় না। পদকর্ত্তা এই অবস্থা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়।
জাগিয়া যামিনী পোহায়॥

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন :—

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥

শ্রীল নরহরি বলিয়াছেন :—

খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কেন নাহি রহ পহু পাশে॥

আবার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে :—

রাত্রি হলে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদন।

সকল রোগ-লক্ষণই রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায়। বিরহ-ব্যাধিরও রাত্রিতেই বৃদ্ধি। উন্মাদের লক্ষণের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে ক্ষণে রোদন প্রভৃতি লক্ষণও পরিলক্ষিত হয়। পদকর্ত্তাও তাহাই বলিতেছেন—

ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে কাঁপ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত এইরূপ ব্যাকুলতায় শ্রীগৌরাঙ্গ শেষ-দ্বাদশ

বর্ষ যেরূপ ভাবে অতিবাহিত করিয়া ছিলেন, শ্রীচরিতামৃতে পরম কারুণিক গ্রন্থকার অতি অল্লাক্ষরে তাহার চিত্র পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন—

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥

দিব্যোন্মাদের আর একটি পদ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই পদটী শ্রীল বাসুঘোষ মহাশয়ের তদ্‌যথা ঃ—

সিংহদ্বার ত্যাজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ", সভারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনক গিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায়॥
উত্তান শয়নে মুখে ফেন বাহিরায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

আরও একটি পদ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

চেতন পাইয়া গোরা রায়।
ভূমে পড়ি ইতিউতি যায়॥
সমুখে স্বরূপ রামরায়।
দেখি পহুঁ করে "হায় হায়॥

কাঁহা মোর মুরলী বদন।
এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ।
কৃপা করি দেহ দরশন॥”
এত বিলাপয়ে গোরাচাঁদে।
দেখিয়া ভকতগণ কান্দে॥

মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ কিঞ্চিৎ বর্ণনা করার পূর্ব্বে এখানে শ্রীচরিতামৃত হইতে দিব্যোন্মাদের আর একটি আভাস উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধ বাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর, কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে কহেন, শুনে সব ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই তিন দশা প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষে ভজন-রাজ্যের পথ-প্রদর্শিকা। এই তিন দশাতেই দিব্যোন্মাদলীলা প্রকটিত হইয়াছে।

আমি দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু লীলা-বর্ণন করার দুরাকাঙ্ক্ষা করি নাই। দিব্যোন্মাদ-লীলা বর্ণন আমাদের ন্যায় জীবের কর্ম্ম নহে—সে সাধনা আমার নাই, সুতরাং সে সৌভাগ্যও

আমার নাই। পরম কারুণিক শ্রীপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় অল্প কথায় অথচ অতি সরস ও সুন্দরভাবে এই মহীয়সী লীলার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রেমিক ভক্তগণ তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতি শক্তিমান্ কবিরাজ গোস্বামীও এই লীলা-গাম্ভীর্য্যানুভাবে শঙ্কাযুক্ত হইয়া লিখিয়াছেন ঃ—

জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব-গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে, বর্ণে ; চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥

যেমন প্রভু—তেমনই তাঁহার লীলা-গ্রন্থকার। কবিরাজ বলিতে ছেন "হে স্বরূপ, হে শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ, তোমরা সকলে কৃপা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরিত বর্ণনা করিতে আমায় শক্তি দান কর।"

প্রভুর ভক্তগণের কৃপাভিন্ন তাঁহার দুরবগাহ লীলা বুঝিবার সামর্থ্য ঘটে না। আমরা এক্ষেত্রে শ্রীল কবিরাজের কৃপাভিকারী। তিনি যে শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া প্রভুর লীলা লিখিয়াছেন, সেই শক্তিলাভ দুস্তর সাধনাতেও দুর্লভ। স্বয়ং শ্রীমদ্দাসগোস্বামী তাঁহার এই লীলা লেখার গুরু। গ্রন্থকার নিজেও সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার শ্রীচরণ-রেণুই আমাদের পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জ্ঞান-লাভের প্রধান-তম সহায়। আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ

করিলাম। তাঁহার দয়ায় আমরা প্রভুর দিব্যোন্মাদের লেশাভাসও বুঝিতে সমর্থ হইতে পারি। এই মহীয়সী লীলা সমুদ্র অপেক্ষা গম্ভীর। গম্ভীরায় যে গম্ভীর লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে তাদৃশ ভাবগাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিনা, লীলা-ধ্যান-নিরত মহাপুরুষগণের তাহা অনুভাবের বিষয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর মতে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা সর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীরতম। এই লীলা, সমুদ্রের ন্যায় অপার। অতি ধীর ব্যক্তিরাও এ লীলা বুঝিতে সমর্থ নহেন। কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা ও তদীয় ভক্তের কৃপাই এই লীলায় প্রবেশের সহায়।

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত বিপ্রলম্ভরসই দিব্যোন্মাদের হেতু। শ্রীমতীর বিরহ-বৈকল্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-বৈকল্য মূলতঃ এক হইলেও ভাব প্রকটনে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহবৈকল্যই যেন অধিকতর ঘনীভূত ও ভাবগম্ভীর। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে নদীয়ার চন্দ্র দিন দিন পরিম্লান ও ক্ষীণ হইতে ছিলেন। তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃই শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে আকুল হওয়ায় সর্ব্বত্রই তাহার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইত, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

পূর্ব্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ মুরলী বদন ॥

ভাবের আতিশয্যে ভাবনার পদার্থ যে অধিগত হইয়া থাকে, এ কথা অতি সত্য। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আমরা তাঁহাকে মুরলীবদনরূপে দেখিতে পাই না। মহাপ্রভু তাঁহাকে সাক্ষাৎ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতেন। এই

কথায় ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে "তদাকারকারিতচিত্তবৃত্তিতা" তন্ময়ত্বের ফল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভোর, তিনি জগৎকে কৃষ্ণময় দেখিতে পাইতেন। ভক্তগণ তাঁহার এই লীলায় জানিলেন যে, তন্ময়ত্ব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণানুভূতি ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন লাভ হয়। মহাপ্রভু জাগরণে শয়নে বা স্বপনে এখানে সেখানে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতেন। তিনি আধঘুমে ও স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণলীলাদর্শনে জাগিয়াও কুরুরীর ন্যায় আকুলপ্রাণে "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিতেন, আর ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেন। তাহা দেখিয়া পার্ষদ ভক্তগণ নিরন্তর তাঁহার চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। মহাপ্রভু স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা দেখিতেন, জাগরণেও তাঁহার সেই স্বপ্নভাব অপসারিত হইত না। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানু-ধ্যানে চিত্তবৃত্তি পরম সত্যস্বরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রসে কীদৃশ বিভাবিত হয়, মহাপ্রভু জগৎকে তাহা দেখাইয়াছেন।

তিনি দিনযামিনী শ্রীকৃষ্ণ-লীলানুধ্যানে বিভোর থাকিতেন, রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হইত না, যদিও কোন সময়ে নয়নযুগল মুদিয়া আসিত, সেই অবস্থাতেও স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই সন্দর্শন করি-তেন। একদিবস নিশাবসানে মহাপ্রভুর নিদ্রাবেশ হইল, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা করিতে-ছেন। গোপীগণ মণ্ডলী বাঁধিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে মধ্যে লইয়া রাস-নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিভঙ্গসুন্দর বনমালী মুরলীবদন মদন-মোহনের বামে শ্রীরাধিকা নৃত্য করিতেছেন, সখীগণ শ্রীশ্রীযুগল কিশোরকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলী বাঁধিয়া নাচিতেছেন---রাসলীলায়

সেই আনন্দে মহাপ্রভু বিহ্বল হইলেন। তাঁহার স্বপ্নাবেশকাল বাড়িয়া চলিল—রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, তথাপি প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন না দেখিয়া গোবিন্দদাস তাঁহাকে জাগাইলেন। প্রভু জাগিয়া দুঃখিত হইলেন, দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য সমাপন করিলেন এবং যথা-সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতে লাগি-লেন। তখনও স্বপ্নের সেই ভাব একবারে যায় নাই। তাঁহার এক নিয়ম ছিল যে তিনি অপরাপর দর্শকগণের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। এই দিবসও তিনি যথাস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শত শত দর্শক তাঁহার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। একটী উড়িয়া স্ত্রী জন-তার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকটে আসিল, এবং দর্শনাগ্রহাতিশয্যে এই স্ত্রীলোকটী বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া একবারে মহাপ্রভুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিল। মহাপ্রভু স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হঠাৎ এই দৃশ্য মহাপ্রভুর নিত্যসহচর গোবিন্দদাসের নয়নপথে পতিত হইল। গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে স্ত্রীলোকটীকে প্রভুর স্কন্ধ হইতে নামাইতে যত্ন করিলেন। প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে। প্রভু তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

আদিবস্যা—এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥

যদিও গোবিন্দদাস নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথার

স্ত্রীলোকটীর তখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছিল। সে তাহার কার্য্য বুঝিতে পারিয়া ত্রস্তব্যস্তভাবে মহাপ্রভুর স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার চরণবন্দন করিল এবং নানাপ্রকারে দৈন্যবিনয় জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। দয়াময় মহাপ্রভু তাঁহার দৈন্যময়ী আর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—

এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনুপ্রাণমনে।
মোর কান্ধে পা দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দো ইহার পায়।
ইহা প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমারো বা হয়॥

ভাবময়বিগ্রহ মহাপ্রভু উড়িয়া স্ত্রীর ভক্তি ও জগন্নাথ দর্শন লালসাতিশয়—সন্দর্শনে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি উহার চরণ বন্দনা করিয়া পার্ষদগণকে একটী মহান্ উপদেশ প্রদান করিলেন।

ইহার পূর্ব্বক্ষণে তিনি জগন্নাথ-দর্শনে চিত্তনিবিষ্ট করিয়া শ্রীজগন্নাথকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। ব্রজের রস তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছিল, ব্রজভাবে তাঁহার চিত্ত একবারে বিভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল যে শ্রীবৃন্দাবনে তিনি শ্রীবৃন্দাবন-লীলারসময় বিগ্রহের সন্দর্শন লাভ করিতেছেন। উড়িয়া রমণীর উক্ত ব্যাপারে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। কিন্তু সে বাহ্যজ্ঞানও পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান নহে। আধ জাগরণ ও আধ স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। কিন্তু বৃন্দাবনের স্মরণ তিরোহিত হইল। তাঁহার মনেহইল তিনি

যেন কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শন করিতেছেন। গোপীরা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-দর্শনে যেরূপ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া তাঁহার মাধুর্য্য-রসাস্বাদনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর তাদৃশ অবস্থা প্রতিভাত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধার ন্যায় কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, বিষণ্ণ হইয়া নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন, মাটিতে বসিয়া বিরহ-বিধুরার ন্যায় আপন মনে ভূমিতে নখপাত করিয়া কত কি অঙ্কন করিতে লাগিলেন, অশ্রুজলে নয়ন-যুগল পরিপ্লুত হইয়া গেল, স্বপ্নের কথা মনে করিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥
ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥
"পাইনু বৃন্দাবন নাথ পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইলুঁ॥

মহাপ্রভুর এই ভাব বর্ণনা করা সহজ কথা নহে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় একটা বিশাল ভাবেব বিপুল ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

রাত্রিকালে আদৌ প্রভুর নিদ্রা হয় না, কিন্তু চক্ষু মুদিলেই স্বপ্ন। স্বপ্নে কৃষ্ণলীলা সন্দর্শন, জাগরণে সেই লীলা স্মরণ এবং তৎস্মরণে বিরহ-প্রলাপ প্রকাশ—এই ভাবে মহাপ্রভুর দিনযামিনী অতিবাহিত হইত। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন।
বাহ্য হৈল হয় যেন হারাইল ধন॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দ লৈয়া।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া॥

দিব্যোন্মাদ দশায় মহাপ্রভু কি প্রকারে কাল যাপন করিতেন, উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি নিচয়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল।

শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণনের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহম্।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ।

এই শ্লোকটী "গোস্বামিপাদোক্ত" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এটি কাহার রচিত, তদ্বিনির্ণয়ের উপায় দেখা যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা হইতে পদ্যটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিনা, মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু ইহার মীমাংসা এস্থলে সম্ভবপর নহে। শ্লোকটীর ভাব অতি গম্ভীর এবং অর্থও অতি জটিল।

এই শ্লোকটির সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—"আত্মা মে বৃন্দাবনং যযৌ" অর্থাৎ আমার আত্মা বৃন্দাবনে গিয়াছে। এই শ্লোকে আত্মার চারিটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্যথা—

(১) "প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ সন্"—অর্থাৎ আত্মা পূর্ব্বলব্ধবিত্ত হারা হইয়া

(২) "বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ সন্" বিষাদে দেহ গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া

(৩) "গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ সন্" কাপালিক ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক

(৪) সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ—ইন্দ্রিয়শিষ্যগণ সহ "বৃন্দাবনং যযৌ" বৃন্দাবনে গিয়াছেন।

মহাপ্রভু স্বপ্নদশায় কৃষ্ণলীলা সন্দর্শন করিয়া ছিলেন। তিনি জাগিলেন, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল, মহাপ্রভু শোকে বিহ্বল হইলেন, বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অশ্রুজলে তাঁহার শ্রীমুখকমল পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন :—

পাইলু বৃন্দাবননাথ পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ॥

প্রাগুক্ত শ্লোকটী এই ভাবে আরব্ধ হইয়াছে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও অতীব ভাবগম্ভীর ও জটিল, তদ্‌যথা—

প্রাপ্তকৃষ্ণ হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি করে হা হা হরি হরি
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥

বিরহযাতনা স্বভাবতঃই অতি দুঃসহ। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, তাঁহার বিরহ প্রকৃতপক্ষেই অতীব অসহ্য। উহাতে যে উন্মাদাবস্থা

ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। বিরহ-সন্তাপে মহাপ্রভু একবারেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাধা যেমন কৃষ্ণ-বিরহে ললিতা বিশাখাকে অবলম্বন করিয়া বিরহ-যাতনার উচ্ছ্বাস উঘাড়িয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই লীলাতে উহারা দুই সখী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায়ের বেশে,—শ্রীরাধাভাব বিভাবিত মহাপ্রভুর মর্ম্মসখীর ভাবে সতত তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সান্ত্বনা করিতেন। মহাপ্রভুর অনন্ত গাম্ভীর্য্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া যাইত, তিনি অধীর হইয়া স্বরূপ ও রামানন্দের গলা ধরিয়া আকুলভাবে "হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ, তুমি আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে, নিঠুর, এক বার এসে দেখা দাও, দেখা দিয়া আমায় বাঁচাও" এইরূপ প্রলাপ করিয়া কাঁদিতেন।

শ্রীপাদ কবিরাজ শ্রীমদ্দাস রঘুনাথের নিকট এই প্রলাপের মর্ম্ম শুনিয়া প্রলাপবর্ণন করিয়াছেন। আমরা প্রাগুক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যা শ্রীচরিতামৃত হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি, মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী॥

ইহা উন্মাদের কথা নয়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে মহাপ্রভু লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু এস্থলে শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে তাঁহার চিত্ত কি প্রকারে মহাবাউলের ভাব ধারণ করিয়াছেন, তিনি ভাবগত রূপকে তাহারই বর্ণনা করিয়া মহাবাউলের ভূষণাদির কথা বলিতেছেন—

কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল শুদ্ধশঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পড়ি তৃষ্ণ-লোভ-থালী ধরি
আশাঝুলী কান্ধের উপর॥
চিন্তা-কান্থা উড়ি গায় ধূলি-বিভূতি মলিন কায়
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ-দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনী মাথে
ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তার যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফলমূল পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে॥
কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।

তা সভার গ্রাস-শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্য
সেই ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাসে কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হৈঞা, মন গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥

এই পদটীতে একটী সুগম্ভীর কৃষ্ণ-প্রেম-ব্যাকুলতার ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। একশ্রেণীর কাপালিক যোগী, নরকঙ্কালাদির দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল কর্ণে, অলাবু পাত্রের করঙ্গ হস্তে, এবং দেহে কন্থা ধারণ করেন। ইঁহাদের দেহ ধূলি বিভূতিতে বিভূষিত হয়। দ্বাদশগুণ-সূত্রে ইঁহাদের হাতের মণিবন্ধ বাঁধা থাকে। এই দ্বাদশগুণসূত্র ইঁহারা গুরুর নিকট প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের মাথায় বস্ত্রখণ্ডের ঝুলনা থাকে। ইঁহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন। নিজে ভিক্ষা করেন না, শিষ্যগণ গৃহাস্থাশ্রমে যাইয়া ভিক্ষা আনয়ন করেন, সেই ভিক্ষা দ্বারা গুরু জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কাপালিক যোগীর বিরক্তিপূর্ণ বিষয়ৌদাস্ত এবং ধ্যানযোগের পূর্ণা-শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া এই পদটী বিরচিত হইয়াছে।

"মহাবাউল"স্বরূপ মনের দশন্দ্রিয় শিষ্যগণসহ লীলাময়

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রস্থান এবং শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে কৃষ্ণধ্যানে যোগাভ্যাস এবং তদবস্থায় দিবানিশি কৃষ্ণ-চিন্তায় জাগরণ,—এই পদের অন্তর্নিহিত এক গূঢ়গম্ভীর রহস্যময় ব্যাপার। এই প্রেমভক্তিময় জগতের আধ্যাত্মিক মহাবাউল কৃষ্ণলীলা-স্বরূপ শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল কর্ণে গ্রহণ করেন, কৃষ্ণলাভ-তৃষ্ণাই তাঁহার অলাবু-করঙ্গ, চিন্তাই তাঁহার কাঁথা ; উদ্বেগই মণিবন্ধন বাঁধিবার দ্বাদশগুণ-সূত্র, কৃষ্ণলাভ-লোভই মাথার ঝুলনী, ভাগবতাদি শাস্ত্রই তর্জ্জা, দশেন্দ্রিয়ই শিষ্য, বৃন্দাবনের স্থাবরজঙ্গম বৃক্ষলতাদিই কৃষ্ণপ্রেমভিক্ষার স্থলরূপ গৃহস্থাশ্রম, গোপীগণের ভুক্তাবশেষ কৃষ্ণগুণরূপরসগন্ধ-শব্দ-স্পর্শই এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার দ্রব্য। শ্রীকৃষ্ণই নিরঞ্জন ও আত্মা। তাঁহার ধ্যানে দিবানিশি জাগরণই এই মহা-বাউলের কার্য্য।

এই শ্রেণীর যোগীদের এইরূপ বেশভূষাদির বিষয় আমাদের পদকর্ত্তাদেরও জানা ছিল। একটী পদ আছে :—

বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পড়িব কাণে।

শ্রীল চণ্ডীদাস অনুরাগিণী শ্রীরাধাকে অনেক স্থলেই মহা-যোগিনীর ভাবে বিভাবিত করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন যথা—

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

আবার অন্যত্র—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়ে কান্দিয়ে
ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥
নিজ করোপরে রাখিয়ে কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥

কৃষ্ণপ্রেমে মহাযোগী বা মহাবাউলের ভাবধারণ বহুদিবস ধরিয়া এদেশে প্রচলিত ছিল। শ্রীল চণ্ডীদাসের বহু পূর্ব্বেও এই শ্রেণীর সাধকগণ এদেশে বিদ্যমান ছিলেন। বৈষ্ণব মহাবাউলগণ কন্থা-করঙ্গাদি ধারণপূর্ব্বক দরবেশ ও উদাসীর বেশে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ব্যাকুল হইতেন, কৃষ্ণান্বেষণে জীবন ক্ষেপণ করিতেন। বহির্জগতের প্রতি তাঁহাদের উৎকট ঔদাস্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্রানুরাগ ও ঝটিকা-প্রবাহবৎ কৃষ্ণানুরাগে চিত্তের ব্যাকুলতা শত শত লোককে কৃষ্ণপ্রেমের অভিমুখে আকৃষ্ট করিত। ইহারা যথাতথা বিচরণ করিতেন, ইহাদের কোথাও নির্দ্দিষ্ট আবাস থাকিত না। এই সকল

মহাযোগী মহাবাউলগণের ন্যায় এক শ্রেণীর সাধক ইহাদেরও পূর্ব্বে এদেশে একপ্রকার ভজন করিতেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ভাবের উপাসক ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকেরা কাপালিকদেরই শ্রেণীবিশেষ। ইহারা প্রাগুক্ত শঙ্খের কুণ্ডল, অলাবু-করঙ্গ, দ্বাদশগুণসূত্রনির্ম্মিত দ্বাদশ ও ঝুলনী প্রভৃতি ধারণ করেন। ইহাদের উপাস্য নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন নিরাকার ব্রহ্ম মাত্র। ইঁহারা তান্ত্রিকমতের অদ্বৈতবাদী। শ্রীচরিতামৃতের পদটী এই শ্রেণীর বাউলদের ভূষণ ও ক্রিয়মুদ্রাদির স্মরণেই বিরচিত। বিষয়ে বিষাদ ও ঔদাস্য এবং ধ্যানগম্ভীরতাই ইহাদের প্রধান বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাই এই পদের লক্ষ্য। একদিকে বিষয় বিতৃষ্ণা, অপরদিকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত চিন্তা, আশা, লোভ বিপুল তৃষ্ণা এবং উৎকণ্ঠাময় উদ্বেগ, আমরা এই এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলে অতি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। সর্ব্বোপরি শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রসাস্বাদন এবং নিভৃত শূন্য কুঞ্জ-মণ্ডপ-কোণে কৃষ্ণানুধ্যানে দিনযামিনী যাপন সাধনারাজ্যের এক গূঢ়গভীর রহস্যময় বিপুল ব্যাপার। পদের অন্তে লিখিত হইয়াছে—

শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণ-ধ্যানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥

কৃষ্ণ-বিরহী বা বিরহিণীর পক্ষে শূন্য কুঞ্জমণ্ডপে ধ্যান বা ধ্যানযোগই একমাত্র অবলম্বন। এই পদটীতে এই সকল ভাব যেরূপ

অদ্ভুতভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে, চিন্তাশীল প্রেমিকভক্তগণেরই তাহা আস্বাদের বিষয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রলাপের উপসংহারে লিখিত আছে :—

মন কৃষ্ণ-বিয়োগী দুঃখে মন হইল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইঞা
শূন্য মোর শরীর আলয়॥

মহাপ্রভু বলিতেছেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও আবার তাহাতে বঞ্চিত হইলাম, বিরহ-ব্যাকুলতায় মন আমার যোগীর ন্যায় কৃষ্ণের ধ্যানেই বিভোর। যোগীর চিত্ত যেমন দেহ ছাড়িয়া ধ্যেয় পদার্থে লীন হইয়া থাকে, আমার চিত্তও সেইরূপ দেহ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বাউলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছে।"

এই বলিয়া মহাপ্রভু ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় নীরব ও সংজ্ঞাহীন হইলেন, তাঁহার অর্দ্ধনিমিলিত নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত লাগিল, শ্রীল রামানন্দ তাঁহার ভাবানুসারী দুই চারিটী শ্লোক অতি ধীরে ধীরে পাঠ করিতে লাগিলেন। রামানন্দের শ্লোক-পাঠের পরই শ্রীপাদ স্বরূপ রুণুরুণু স্বরে অতি মৃদুভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার সুধামধুর গানের তান ধরিলেন। এইরূপ চেষ্টায় বহুক্ষণপরে মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইল। প্রভু বলিলেন 'স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে আমি কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত কৃষ্ণ-বিয়োগে অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তোমাদের প্রবোধবাক্যে আর কতকাল বসিয়া থাকিব ? আমার প্রাণের যাতনা কিরূপে তোমা-

দিগকে বুঝাইব। আমার নিকট সমস্ত জগৎ শূন্য-শূন্য বোধ হই-তেছে, এখন কোথা যাই, কি করি ?"

শ্রীরামরায় আবার দুই চারিটি শ্লোক পড়িলেন। স্বরূপ আবার তাঁহার স্বভাবসুলভ সুধামধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলার গান ধরিলেন। নীরব নিশীথে বংশীধ্বনির মত সে গান শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কর্ণে সুধারস ঢালিয়া দিল। মহাপ্রভু আগ্রহ করিয়া বলিলেন "স্বরূপ, প্রাণের স্বরূপ, আবার শুনাও, আবার এ গানটী শুনাও স্বরূপ।"

স্বরূপ আবার পুরাতন গানটী নূতনতানে ধরিয়া নূতন ভাবে গাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ও রামরায়ের নয়নযুগল স্বরূপের গানে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর নয়নকোণ হইতে অশ্রুর মন্দাকিনীধারা বহিয়া চলিল, প্রভু নীরবে অবশ হইয়া রামরায়ের দেহে ঢলিয়া পড়িলেন। স্বরূপের গান থামিল, নীরব গম্ভীরা একবারেই নীরব হইয়া পড়িল, দীপশিখা মিটি-মিটি জ্বলিতে ছিল, স্বরূপ চাহিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নয়ন আবার নিমীলিত হইয়াছে, দেহ বিবশ। স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুকে নানা প্রকারে চেতন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু কিঞ্চিৎ চেতনা-লাভ করিলে স্বরূপ ও রামরায় তাঁহাকে গম্ভীরার মধ্যে লইয়া গিয়া শয়ন করাইলেন। রামরায় আপন ভবনে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও গোবিন্দদাস গম্ভীরার দ্বারের নিকট শয়ন করিলেন।

মহাপ্রভুর নিদ্রা নাই, তিনি "হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে প্রাণবল্লভ, একবার দেখা দাও, তোমায় না দেখিয়া আমি ক্ষণকালও

তিষ্টিতে পারিতেছি না।' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুলতা-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপেরও নিদ্রা হইল না। তিনি মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইল। কিন্তু সহসা আবার গম্ভীরা নীরব হইল, মহাপ্রভুর শ্রীমুখে অবিরাম কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে শ্রীগম্ভীরা মুখরিত হইতেছিল, হঠাৎ গম্ভীরায় সেই সুধামধুর কৃষ্ণনামধ্বনি থামিয়া গেল। শ্রীপাদ স্বরূপ সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর নিমিত্ত উদ্বিগ্ন থাকিতেন। শব্দ না শুনিয়া তাহার মনে চিন্তা হইল। তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, আলো জ্বালিয়া দেখেন মহাপ্রভু গম্ভীরায় নাই। স্বরূপের হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল। তিনি গোবিন্দকে জানাইলেন। আলো লইয়া উভয়ে কাশীমিশ্রের বাটীর আঙ্গিনার দ্বারে আসিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। তখন উভয়েই এই আঙ্গিনার মধ্যে অন্যান্য গৃহে ও স্থানে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহাকে পাইলেন না। দ্বিতীয় আঙ্গিনায় আসিলেন, এই আঙ্গিনার দ্বারও রুদ্ধ। এই প্রকোষ্ঠেও সকলে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখানেও প্রভু নাই। দ্বার খুলিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিতে পাইলেন সদর দরজাও বন্ধ রহিয়াছে। বহিঃপ্রকোষ্ঠে বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, তখনও অন্ধকার রহিয়াছে। ভক্তগণ ও অন্যান্য সকলে আলোক জ্বালিয়া চারিদিকে প্রভুর অন্বেষণে বাহির

অন্তর্ধান ও দেহ-শৈথিল্য

হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপাদি একদল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে সহসা প্রভুকে দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইলেন সোণার শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতনভাবে মৃত্তিকায় উত্তানভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দেহসন্ধি সকল যেন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি স্বভাবতঃ সুদীর্ঘ কিন্তু সন্ধি প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত পদাদি আরও যেন দীর্ঘতর দেখাইতেছে, অস্থি সন্ধি সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। সন্ধিস্থলগুলি হইতে অস্থিগুলি যেন দূরে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। সন্ধির মধ্যে অস্থি নাই, কেবল চর্ম্মমাত্র রহিয়াছে। এই কারণে প্রভুর সুদীর্ঘ কলেবর আরও সুদীর্ঘতর দেখাইতেছে। দেখিয়াই ভক্তগণ স্তম্ভিত, বিস্মিত, আশ্চর্য্যান্বিত ও চমকিত হইলেন। শরীরে স্পন্দন নাই, নাশায় শ্বাস নাই, মুখ দিয়া লালা বহিয়া পড়িতেছে, উত্তান নয়নের তারা স্থির হইয়া রহিয়াছে—প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় একবারে অধীর হইয়া উঠিল, সকলেই হায় হায় করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। শ্রীপাদস্বরূপ প্রভুর নিকট বসিয়া পড়িলেন এবং ভক্তগণসহ তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। তিনি সহসা "হরি হরি" বলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। চেতনা প্রাপ্তিমাত্রই অস্থিসন্ধি সকল আবার পূর্ব্ববৎ সংলগ্ন হইল। তিনি জাগিয়া দেখিতে পাইলেন স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে কৃষ্ণনাম শুনাইতেছেন, তখন স্বরূপকে দেখিয়া বলিলেন "স্বরূপ, তোমরা এ কি করিতেছ, এই যে সিংহদ্বার দেখিতে পাইতেছি আমি এখানে কেন?"

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, "এখন বাসায় চল। বাসায় গিয়া সকল কথা বলিব।" মহাপ্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্তগণ মহাপ্রভুকে লইয়া বাসায় গমন করিলেন। অতঃপর শ্রীপাদস্বরূপ, সকল ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যে এরূপ করিয়াছি, ইহার কিছুই তো আমার স্মরণ হইতেছে না। এখন কেবল শ্রীকৃষ্ণই আমার নয়ন সম্মুখে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি বিদ্যুতের ন্যায় এই মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, আবার পর মুহূর্ত্তেই হারাইতেছি, এ আমার একি হইল" ইহাই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পানিশঙ্খ বাজিল, মহাপ্রভু স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন।

এই লীলাটী অত্যদ্ভুত। কাশী মিশ্রের ত্রিপ্রকোষ্ঠময় ভবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ রহিল, মহাপ্রভু মুহূর্ত্ত মধ্যে বাটী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে গিয়া অচেতন অবস্থায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। তিনি কি প্রকারে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিলেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও অযৌক্তিক বা অসম্ভব নহে। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে এরূপ অন্তর্ধান বা অদৃশ্য হওয়া বিন্দুমাত্রও বিস্ময়জনক নহে। যোগপ্রভাবেও এই শক্তি উপলব্ধ হইয়া থাকে।* তাঁহার শ্রীঅঙ্গের

* ভগবান পতঞ্জলি বলেন—"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্"। অর্থাৎ শরীর ও আকাশ এই উভয়ের সম্বন্ধের প্রতি সংযম সুপ্রযুক্ত হইলে যোগীর দেহ তুলার ন্যায় লঘু হয়। এই অবস্থায় যোগী স্বচ্ছন্দে

অস্থি-সন্ধি-বিশ্লিষ্টতা, তজ্জনিত তাঁহার অদ্ভুত দৈর্ঘ্য বিস্তার, এবং বাহ্যজ্ঞান-প্রাপ্তির পরে এই সকল সন্ধির প্রাকৃত ভাব ধারণ,—অত্যদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার।

তিনি সায়াহ্নে প্রলাপে যাহা বলিলেন, কার্য্যতঃও তাহাই করিলেন। তাঁহার মহাবাউল মন কৃষ্ণান্বেষণে মহাযোগীর ন্যায় দেহ গেহ, ছাড়িয়া গেল,—ইহাই তাহার প্রলাপের মর্ম্ম। আমরা এ স্থলে তাহা অপেক্ষাও অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার বাউল মন কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইল বটে। কিন্তু তাঁহার মন একা গেল না। কাশীমিশ্রের বাড়ী শূন্য করিয়া তাঁহার মন যোগীর মহাবিভূতিবলে তদীয় শ্রীঅঙ্গ সহ অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার প্রলাপ উক্তি তদীয় লীলার প্রধানতম ঘটনায় পরিণত হইল। শ্রীভগবদ্দেহ যে চিদানন্দ দেহ, উপরিউক্ত দুই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। এই শ্রীদেহ জড়ীয়বৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা জড়ীয় দেহ নহে।

এই ঘটনা যে কাল্পনিক নহে, তৎসম্বন্ধে পরম কারুণিক লীলালেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥

তদ্‌যথা :—

আকাশ পথে বিচরণ করিতে পারেন। ইথারের (Ether) সহিত দেহের যে সম্বন্ধ আছে, সংযম প্রক্রিয়ার ফলে সেই সম্বন্ধে অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটে। এই অবস্থায় দেহ তুলার ন্যায় লঘু হইয়া উঠে, সুতরাং উহা অনায়াসে ইথারের (Ether) উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়।

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

শ্রীচরিতামৃতকার এই লীলা-বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন :—

এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেনভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-শিরোমণি॥
শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥
রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

এইরূপ অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার প্রকৃতই শাস্ত্র-লোকাতীত। কিন্তু এই সকল ঘটনা বর্ণে বর্ণে সত্য। শ্রীল কবিরাজ শ্রীমদ্দাস রঘুনাথের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী এই সকল লীলা সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে কাল্পনিক কোনও কথা নাই।

শ্রীগোবর্দ্ধন-ভ্রম

ব্রজলীলা ও ব্রজভূমির অনুধ্যানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিত্ত নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতেন। এই অবস্থায় নিত্যলীলা ও নিত্যধামের স্ফূর্ত্তি অতি স্বাভাবিক। কোন প্রকার উদ্দীপনার পদার্থ বাহ্যেন্দ্রিয়গোচর হইলেই এই 'অবস্থায়

ধ্যেয় বস্তুর স্ফূর্ত্তি সহজেই সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের অতি রম্যলীলাস্থলী। মহাপ্রভু দিন-যামিনী কতবার গোবর্দ্ধন গিরির লীলাবৈভব মনে মনে স্মরণ করিতেন, তাঁহার চিত্তে কতবার গোবর্দ্ধনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা উদিত হইত, অবশেষে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া গোবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধন-লীলার অনুস্মরণে বিভোর থাকিতেন। যখন তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা—তখন একদিবস তিনি উন্মনা হইয়া কি-জানি-কি ভাবিতে ভাবিতে গম্ভীরা হইতে সমুদ্রের অভিমুখে যাইতে ছিলেন। এই সময়ে তিনি সহসা চটক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন।

চটকের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একবারে তিরোহিত হইল। তিনি যে পুরীক্ষেত্রে রহিয়াছেন, এ জ্ঞান আর রহিল না। তাঁহার ধারণা হইল,—তিনি ব্রজধামে, আর তাঁহার কিয়দ্দূর পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন বিরাজমান। অমনি তিনি শ্রীভাগবতের গোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য শ্লোকটী * পাঠ করিতে করিতে পর্ব্বত অভিমুখে

* বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে যে পথটী সমুদ্রতীরে গিয়াছে, সেই পথ দিয়া কিয়দ্দূর দক্ষিণদিকে গেলেই পথের পশ্চিম দিকে একটী উচ্চ পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। এই পাহাড়টী চটক পর্ব্বত নামে খ্যাত। এই পাহাড়টী দেখিলে প্রকৃত পক্ষেই শ্রীগোবর্দ্ধনের কথা মনে পড়ে। মহাপ্রভু চটক পর্ব্বত দেখিয়া শ্রীভাগবতের যে শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা এই :—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দর-কন্দ মূলৈঃ॥

ধাবিত হইলেন। গোবিন্দদাস এই সময়ে সততই মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, কেননা কোন্ মুহূর্ত্তে তাহার কি ভাব হয়, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি সততই ভাবে বিহ্বল থাকিতেন। এই সময়ে ভক্তগণ এক মুহূর্ত্তেও তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিতেন না। গোবিন্দদাস প্রথমতঃ প্রভুকে আনমনা দেখিতে পাইলেন, কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে চটক পর্ব্বতের অভিমুখে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। পর মুহূর্ত্তেই গোবিন্দ দেখিতে পাইলেন, প্রভু মন্থরগতি ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছেন, গোবিন্দও তখন চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

গোবিন্দের চীৎকার শুনিয়া চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময় মহাপ্রভুর ভক্তগণ সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন, তিনি কখন কি করিবেন, কখন কোথায় যাইয়া অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িবেন, এই ভাবনায় ভক্তগণ সততই উদ্বিগ্ন ভাবে দিনযামিনী যাপন করিতেন। মহাপ্রভুর ধাবন, গোবিন্দদাসের তৎপশ্চাদ্ধাবন এবং গোবিন্দের চীৎকার ধ্বনিতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল,—মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া গম্ভীরার বাহির হইয়াছেন। এই সাড়া পাইয়া স্বরূপ, জগদানন্দ গদাধার, রামাই, নন্দাই, নীলাই, শঙ্কর পণ্ডিত,

দশমস্কন্ধ—একবিংশ অধ্যায় ১৮ শ্লোকঃ। অর্থাৎ হে অবলাগণ, এই গোবর্দ্ধনগিরি হরিদাস-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা, ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শে হৃষ্ট হইয়া উত্তম জল, কোমল তৃণ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কন্দ এবং মূল দ্বারা গোপগণ ও বৎসগণের সহিত রামকৃষ্ণের পূজায় নিরন্তর নিরত।

ভগবান্ আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীরাও ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হইলেন।

মহাপ্রভু প্রথমতঃ অতি দ্রুতবেগে চলিতে ছিলেন। কিন্তু ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাব-তরঙ্গের লীলা-বৈভব অসীম ও অসংখ্য। সহসা তাঁহার স্তম্ভ ভাব উপস্থিত হইল, দ্রুতগতি থামিয়া গেল, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, প্রতি রোমকূপে পুলকের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, লোমকূপগুলি ব্রণের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল, এবং কদম্ব-কেশরের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। প্রতি রোমপথে লোহিতবর্ণ স্বেদ-ধারা প্রবাহিত হইল, কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল অথচ কণ্ঠ হইতে কি প্রকার ঘর্ঘর-শব্দ পরিশ্রুত হইতে লাগিল।

এদিকে নয়নযুগল হইতে গঙ্গাযমুনা-প্রবাহের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া স্বেদধারা পরিসিক্ত বিশাল বক্ষে বিমিশ্রিত হইয়া মহা-প্রভুর শ্রীঅঙ্গ একবারে জলধারায় পরিসিক্ত করিয়া ফেলিল। তাঁহার কনককান্তি শঙ্খের ন্যায় শুভ্র হইয়া উঠিল। ইহার পরে কম্প দেখা দিল, সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

এই সময়ে গোবিন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে প্রভুর নিকটে পৌছিলেন। তিনি প্রভুর শ্রীঅঙ্গে করঙ্গের জল সেচন করিলেন এবং বহির্বাস দ্বারা বাতাস দিতে লাগিলেন। তখন শ্রীপাদ স্বরূপাদি ভক্তগণও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শীতল জল আনিয়া

তাঁহার অঙ্গে সেচিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর চেতনা হইল না। শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ। কি প্রকারে প্রভুর চেতনা হয়, তাহা স্বরূপের সুবিদিত। স্বরূপ প্রভুর মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে আপন কোলে তাঁহার মস্তক সযত্নে তুলিয়া লইয়া কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। বহুবার এইরূপ করার পরে মহাপ্রভুর চেতনা হইল। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপের হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া "হরি হরি বল" বলিতে বলিতে বসিয়া উঠিলেন। সমুদ্রপথে শত শত লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিল। হরিনামের তুমুল রোলে চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া ভুবন-মঙ্গল হরিধ্বনিতে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন।

মহাপ্রভুর তখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। তিনি বিস্মিত ভাবে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কোথা হইতে কোথা আসিয়াছেন, তাহা যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার চাহনি দেখিয়া ভক্তগণের বোধ হইল, তাঁহার সতৃষ্ণ নয়নযুগল যেন কি এক প্রিয়তম বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তিনি যাহা দেখিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা যেন খুজিয়া পাইতেছেন না।

সহসা স্বরূপের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। মহাপ্রভু অতীব দুঃখিতভাবে অতি ধীরে ধীরে গদ্গদস্বরে কহিলেন, "সখি, আমি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণলীলা দেখিতেছিলাম, তোমরা আমায় এখানে

আনিলে কেন? আমি সেই প্রাণারাম সুখময়ী লীলা দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিতেছিলাম,—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনে উঠিয়া বেণু বাজাইতেছেন, চারিদিকে ধেনুগণ চড়িতেছে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শুনিয়া শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী সেখানে আগমন করিয়াছেন। সখি, তাঁহার যে মোহন ভাব ও মোহন রূপ দেখিতে পাইলাম, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত-কন্দরাতে প্রবেশ করিলেন, সখীগণ ফুল তুলিতে লাগিলেন। আমি এই সুমধুর সুখকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়াছিলাম। এই সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমায় গোবর্দ্ধন হইতে এখানে টানিয়া আনিয়াছ। আমি শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না। হায় হায়, আমাকে বৃথা ক্লেশ দিবার জন্য এখানে আনিলে কেন?"*

এই বলিয়া মহাপ্রভু শোকার্ত্তের ন্যায় ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। মহাভাবস্বরূপিণী গোপীভাববিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের তখনও পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। তখনও তিনি তাঁহাকে পুরীমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভারতী বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণলীলামাধুরী-রসাস্বাদিনী সরলা গোপবালার ন্যায় মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতাময় আর্ত্তনাদপূর্ণ রোদনধ্বনি শুনিয়া বৈষ্ণবগণও অধীর হইয়া তাঁহার সহিত সমস্বরে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

* মহাপ্রভু এখানে শ্রীপাদ স্বরূপকে অর্দ্ধবাহ্য দশাতেও "সখি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ব্রজভাব-বিভাবনার আতিশয্য ও প্রভাব এখানে অতি স্পষ্ট।

এই সময়ে শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী ও শ্রীমৎব্রহ্মানন্দভারতী আসিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই দুই মূর্ত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর অর্দ্ধবাহ্যভাব তিরোহিত হইল। তিনি সম্পূর্ণ চেতনালাভ করিলেন। প্রভু যুগপৎ ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন "শ্রীপাদদ্বয়, আপনারা এ সময়ে এতদূরে আগমন করিলেন কেন? শ্রীপরমানন্দপুরী বলিলেন "তোমার নৃত্য দেখিব মনে করিয়া এখানে আসিয়াছি।" ইহাতে মহাপ্রভু একটুকু লজ্জিত হইলেন এবং মৃদু হাসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন স্নানের সময় হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া স্নানার্থ সমুদ্রতটে গমন করিলেন। ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গ স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনাটী শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তোত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

> সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
> দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
> ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদইব ধাবন্নবধৃতো-
> গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

নীলাচলের নিকট চটক পর্ব্বত দেখিয়া যিনি "গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরিপতিকে দেখিতে যাইতেছি" বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান অবস্থায় নিজগণ দ্বারা ধৃত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে

এই ঘটনা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও বহুল ঘটনা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অতি সংক্ষেপে এই দিব্যোন্মাদলীলা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এবে যত কৈল প্রভু অপরূপ-লীলা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি দিগ্ দরশন।
ইহা যেই শুনে সেই পায় প্রেমধন॥

কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় পরিচ্ছেদ-অন্তে যে ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ধ্রুবসত্য। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ শ্রবণ করা প্রকৃত পক্ষেই প্রেমধনলাভের প্রধানতম উপায়।

শ্রীচরিতামৃতের ১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

মহাপ্রভুর তিন দশা

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্ম স্ফুর্ত্তি নাহি, রহে কৃষ্ণ প্রেমাবেশে॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ বাহ্য স্ফুর্ত্তি।
কভু বাহ্য স্ফুর্ত্তি—তিন রীতে প্রভুর স্থিতি॥
স্নান-দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের স্থূল অবস্থা এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রকাশ পাইতেছে; শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার শেষ অংশ, আনন্দময় জগতের বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। মহাপ্রভু ইহ জগতে দৃশ্যতঃ অবস্থান করিয়াও ঐহিক জ্ঞানপরিশূন্য হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশে তাঁহার দিন

যামিনী অতিবাহিত হইত। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অনেক সময়েই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাসুধ্যানে নিরন্তর নিমগ্ন থাকিতেন। বাহ্য জগৎ, বাহ্য চিন্তা বা আত্ম চিন্তার ভাব প্রকাশ পাওয়ামাত্রই উহা শ্রীকৃষ্ণানুধ্যানে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ব্রজলীলা-সাক্ষাৎকার,—ধ্যান ও প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনেক ভিন্ন। সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা তিনি ব্রজলীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। এই বিশাল বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্রই নিত্য বৃন্দাবন ধাম প্রত্যক্ষের বিষয়। মহাপ্রভু ভক্তগণকে দেখাইলেন, লোকে যাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে উন্মাদ নহে, উহা দিব্য দৃষ্টি-উন্মীলনেরই পরম সাধন। দিব্য উন্মাদে দিব্য দৃষ্টির বিকাশ পায়, তদবস্থায় এই জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাজ্ঞান ও ভ্রম দর্শন তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহার স্থানে সুধামধুর লীলা-বৈচিত্র্যময় শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যধাম পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয়। প্রেমের প্রোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি-স্বরূপিণী ব্রজবালাগণ প্রতি মূহূর্ত্তে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের সহিত প্রেমরস লীলায় প্রমত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়া যান,—দিব্যোন্মাদ এই দিব্যদৃষ্টের সাধক।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর তিনটী ভাব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিতেন। অনেক সময়ে তিনি অন্তর্দ্দশায় অতিবাহিত করিতেন, এই সময়ে বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব বা সম্বন্ধ থাকিত না। তিনি ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন, শ্রীবৃন্দাবনীয় মধুরলীলারসের মৃদুলমধুর তরঙ্গরঙ্গে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, দেহে তজ্জন্য সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ

পাইত, তাহাতেই পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার অনুভাবের বিষয়গুলি অনুভব করিতেন।

বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে অবস্থানের পরে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্যজ্ঞানের উদ্রেক হইত, কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার-ধ্যান-সাগরে বিলীন হইয়া যাইত। তিনি এইরূপ অর্দ্ধ নিদ্রা অর্দ্ধ জাগরণের ন্যায় এই অবস্থায় কখন বা কিঞ্চিৎ বিষয়-জ্ঞান লাভ করিতেন, কখন বা লীলা-রসাস্বাদনে বিভোর হইয়া পড়িতেন। আবার কখন বা তাঁহার পরিস্ফুট বাহ্যজ্ঞান হইত। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-যাতনায় কেবল হাহাকার করিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামরায় নর্ম্মসখীর ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে কতপ্রকার সান্ত্বনা দিতেন, শ্রীল স্বরূপ কত রসমাধুরীময় লীলা-গান শুনাইতেন, শ্রীল রামরায় কত সুধাময়ী কৃষ্ণকথায় তাঁহাকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইতেন। বাহ্যজ্ঞানের সময়টী ভক্তগণের পক্ষে অধিকতর ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হইত। এই সময়ে মহাপ্রভু বিরহ-ব্যাকুলতায় আকুল প্রাণে কুররীর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃসিক্ত করিতেন। ইহা দেখিয়া পার্ষদ ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। এই অবস্থায় শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়ের নর্ম্ম সেবা ও সহচরত্ব অন্ত্যলীলার এক রহস্যপূর্ণ বিশিষ্টতা। এই তিন দশাতেই প্রভুর ইহ জগৎ ছাড়া অতীন্দ্রিয় আনন্দময় রাজ্যের সুখানুভব, তৎসুখাস্বাদন ও তৎসুখস্মৃতি এই লীলার প্রধানতম ঘটনা। পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অন্যত্র

এই তিন দশার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা অন্ত্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।

অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধ বাহ্য কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে॥

ভজন-পথে সাধকের মন যে পরিমাণে অগ্রসর হয়, তদীয় অন্তঃপটে এই তিনটী দশা ততই সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই ভজনের পূর্ণতম বিকাশ স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়া ভক্ত-সাধকগণের মানস চক্ষের সমক্ষে ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিপ্রলম্ভরসের মুর্ত্তিমান্ অবতার। বিরহ-ব্যাকুলতাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-লাভ হয় না, বিরহে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুর্ত্তি অতি স্বাভাবিকী। কিন্তু প্রেমময় মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুর্ত্তি অতি অদ্ভুত

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য ও ইন্দ্রিয়াকর্ষণ

ব্যাপার। তাঁহার কৃষ্ণাবেশ পরমার্থসত্যসন্ধানের অমোঘ উপায়। যখনই তাঁহার কৃষ্ণাবেশ হইল, আর অমনি তাঁহার সেই নিত্য সত্য পদার্থের প্রত্যক্ষ ঘটিল। সে প্রত্যক্ষ কেবল এক ইন্দ্রিয়ের নহে—এক ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিল, অপরাপর ইন্দ্রিয়গণও সমভাবে শ্রীকৃষ্ণগুণে উতালা ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাকর্ষী গুণাবলী ইন্দ্রিয় সকলকে স্বীয় মাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিলে প্রেমিক ভক্তের কৃষ্ণময় চিত্ত কি

প্রকার ব্যাকুল হইয়া উঠে, মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট প্রলাপে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করা মহাপ্রভুর নিত্যকর্ম্ম। শেষ-দ্বাদশ বর্ষেও তাঁহার এই নিত্যকার্য্যের ব্যাঘাত হয় নাই। মহাপ্রভু একদিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণাবেশে বিভোর হইলেন, শ্রীজগন্নাথ দেবকে অনন্ত মাধুর্য্যময় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নয়নরঞ্জন সৌন্দর্য্য, কর্ণানন্দি নর্ম্মবচন, কোটীচন্দ্রবিনিন্দি অঙ্গশীতলতা, জগজ্জন্মাদি সৌরভ্য, এবং স্মৃবাধিক্কারী অধরামৃত—শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচগুণ যুগপৎ শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইল। তিনি শ্রীমন্দিরেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার ভাব-বিকার দেখিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইলেন—প্রমাদ গণিলেন,—সকলে অতি ব্যস্তভাবে তাঁহাকে বাসায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার ভাবাবেশ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীল রামানন্দ রায়কে ধরিয়া বিলাপ করিতে বসিলেন। মহাপ্রভুর ভাবাবেশ হইলেই তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে ললিতা বলিয়া এবং শ্রীল রায় রামানন্দকে বিশাখা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। এই উভয়ই তাঁহার শ্যাম-বিরহে অসহ্য যাতনার সময়ে নর্ম্মসখী। মহাপ্রভু শ্রীল রাম রায়কে লক্ষ্য করিয়া একটী শ্লোক পড়িলেন এবং উহার অর্থ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃত হইতে উহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, যথা—

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় তাঁহাকে করিয়া বিলাপ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে :—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে।*

অর্থাৎ সখি শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃতসাগরের তরঙ্গে ললনাদের

---

* মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনায় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী স্থানে স্থানে গোবিন্দ-লীলামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, শ্রীল কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর দর্শন পান নাই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও কবিরাজ গোস্বামীর এই গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায় না। এই অবস্থায় শ্রীগোবিন্দলীলাগ্রন্থের শ্লোক প্রলাপে উদ্ধৃত করা হইল কেন? এই প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রলাপের সময়ে যে সকল শ্লোক বলিতেন, শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উক্ত শ্লোক ও প্রলাপগুলি শুনিয়া ছিলেন এবং অতঃপরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে যথাযথরূপে বলিয়াছিলেন। তিনি সেই সকল শ্লোকের কতিপয় শ্লোক তদীয় শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল শ্লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

চিত্তপর্ব্বত পরিপ্লুত হইয়া যায়, তাঁহার নর্ম্মবচন কর্ণের আহ্লাদ-জনক। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শতচন্দ্রের শৈত্য হইতেও অধিকতর সুশীতল। তাঁহার সৌরভ্যামৃতে সকল জগৎ পরিপ্লুত হয়, তাঁহার অধরসুধা অমৃত হইতেও সুমধুর। তাঁহার এক একটি গুণেই ত্রিভুবনের নারীগণকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে। সখি, এই গুণ-নিধি শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণই যুগপৎ আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়কে

শ্রীমুখ-মুখরিত। ইঁহারা শ্রীচরিতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতের সমর্থন করেন যথা—

নানাভাবে উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥

আবার অপর কেহ বলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপের মর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই প্রলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা আরও বলেন যে শ্রীচরিতামৃতে যে সকল শ্লোক ও পদ প্রলাপ-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক ও পদের সকলগুলিই যে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি, তাহা বলা যাইতে পারে না। শ্রীচরিতামৃতে যে তাঁহার স্বরচিত শ্লোকপঠনের কথা লিখিত আছে, সেই সকল শ্লোক শিক্ষাষ্টকের আটটী পদ্য মাত্র। অপিতু শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ঃ—

বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হৈঞা॥

জোরে আকর্ষণ করিতেছে। এখন আমি কি উপায় করি? শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য, শব্দমাধুর্য্য, স্পর্শমাধুর্য্য, সৌরভ্যমাধুর্য্য, অধরসুধামাধুর্য্য— কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টীর কথা বলিব। তাঁহার রূপ দেখিয়া নয়ন উতালা হইতেছে, তাঁহার কোটীন্দুসুশীতল অঙ্গ-স্পর্শলাভের জন্য

ভক্ত শিক্ষাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥

শ্রীচরিতামৃতকার আরও বলেন—

যদ্যপিহ প্রভু কোটীসমুদ্রগম্ভীর।
নানাভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥

সুতরাং মহাপ্রভুর প্রলাপের শ্লোক ও পদাদি যথাযথভাবে সংগৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ শ্রীল কবিরাজ সেই সেই ভাবের শ্লোক ও পদ স্বীয় কল্পনায় স্বীয় গ্রন্থে বিন্যাস করিয়া রাখিয়াছেন।

যাঁহারা এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাবজগতের পারমার্থিক তত্ত্বের সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা বলেন শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বিশুদ্ধ আবেশ-অবস্থায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত শ্রীশ্রোতাবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ॥

ত্বক্ আকুল হইতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ গন্ধের নিমিত্ত নাসিকা উন্মত্ত হইতেছে, অধর-পীযূষের নিমিত্ত রসনা ব্যাকুল হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসম্ভোগের নিমিত্ত আমার পাঁচ-ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়াছে।*

ইহা সভার চরণ কৃপা লেখায় আমারে।
আর এক হয় তেঁহ অতি কৃপা কারে॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা, না করিহ রোষ॥

এই অবস্থায় সিদ্ধ ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচরণাবিষ্ট শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-মুখরিত প্রলাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক নহে। আমাদের বিশ্বাস পরম দয়াময় মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদ্বারা স্বীয় প্রলাপের প্রতিধ্বনি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা কাল্পনিক নহে, অভ্রান্ত সত্য বর্ণনা।

* শ্রীল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটী পদেও এই ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে তদ্‌যথাঃ—

রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে আপন পরসঙ্গ॥
সজনি আর কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন জারল, না সহে ধরমভয়লেশ॥
নাসিকা সে অঙ্গের গন্ধে উনমত, বদন না লয় আন নাম।
নবনবগুণগণে বান্ধল মঝুমনে ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি-তরজনে, গুরুজন-গরজনে কো-জানে উপজয়ে হাস।
তঁহি এক মনোরথ যদি হয়ে অনুরত পুছত গোবিন্দদাস॥

আমার চিত্তরূপ অশ্বকে পাঁচজনে পাঁচদিকে টানিতেছে। আমার ইন্দ্রিয়গণ দস্যুর ন্যায় পরধনলুব্ধ। ইহারা দস্যুর ন্যায় প্রমাথী ও বলবান্। নয়ন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যের দিকে টানিতেছে এইরূপে একই সময়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন দিকে চিত্তরূপ অশ্বকে আকর্ষণ করিতেছে। সখি, এখন বল দেখি আমার মন কোন্ দিকে যায়, আর কি প্রকারেই ইন্দ্রিয় দস্যুদের অত্যাচার সহ্য করে? যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহনে না যায়।
দেখি লোভী পঞ্চ জন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পাঁচে পাঁচদিকে ধায়॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ!
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যুগণ
সবে করে, হরে পরধন॥
এক অশ্ব একক্ষণে পাঁচে পাঁচ দিকে টানে
একমন্ কোন্ দিকে ধায়।
এককালে সবে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
এত দুঃখ সহনে না যায়॥

এইরূপ বলিতে বলিতেই মহাপ্রভুর হৃদয়ে অপর ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিতেছেন :—

"সখি, ইন্দ্রিয়গণের বৃথা অপবাদ করিতেছি, উহাদের দোষ কি? শ্রীকৃষ্ণের রূপগন্ধাদিরই মহাকর্ষণ শক্তিতে ইহারা এইরূপ অভিভূত

হইতেছে, উহারাই আমার চিত্ত-অশ্বকে আপন আপন অভিমুখে টানিতেছে যথা শ্রীচরিতামৃতে—

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সবার কাহা দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥

শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত মহাপ্রভু বলিতেছেন, "আমার একমন একই সময়ে পাঁচদিকে বেগে আকৃষ্ট হইতেছে। হা কি কষ্ট, এখন কি করি।" শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এইরূপ বহুমুখী আকর্ষণী শক্তিতে সকল ইন্দ্রিয়ই তন্ময় হইয়া যায়।

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত প্রলাপ-পদাবলী প্রেমিক ভক্তগণের নিরন্তর আস্বাদ্য। এই সকল পদ, ভক্তগণের ভজন-সম্পত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃতপদের অপরাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, যথা—

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু তাঁহার তরঙ্গ-বিন্দু
এক বিন্দু জগত ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চ গিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥
কৃষ্ণের বচন মাধুরী, নানারস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগত নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বান্ধি টানে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥

কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষণে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভাভর, মৃগমদ মদহর,
নীলোৎপলের হরে সর্ব্বধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতরে করে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্য হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূল ধন॥
এত কহি গৌর হরি, দু জনের কণ্ঠে ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাহা করে কাহা যাও, কাহা গেল কৃষ্ণ পাও,
দুহে মোরে কহ সে উপায়॥

এই পদটী শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস গন্ধ ও স্পর্শের আকর্ষণী শক্তির মহিমা উক্ত শ্লোকে ও পদে প্রকটিত হইয়াছে। পদ্যটীতে শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রচুর ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের মাধুর্য্য, ইতররাগ বিস্মারণের উপায়। তাই গোপী-গীতায় লিখিত হইয়াছে :—

'ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্'

কবিরাজ গোস্বামী উহাই বিবৃত করিয়া লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বমাধুর্য্যে নারীর মন হরণ করে এবং অন্য লোভ ত্যাগ করায়। প্রেমবতী গোপনারীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি করিয়াই এই পদ বিরচিত হইয়াছে। দিব্যোন্মাদের প্রলাপ ব্রজরমণীদেরই হৃদয়ের ভাষা। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে একবারেই ব্রজরমণীগণের দশায় অভিভূত হইয়া থাকিতেন, তাঁহাদেরই ভাবে ও ভাষায় প্রলাপ করিতেন। সময়ে সময়ে বাহ্য জ্ঞানহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলায় নিমজ্জিত থাকিতেন। এই অবস্থায় বিরহ-যাতনা হইত না। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান হইলেই তিনি আগ্নেয়গিরির ভীষণ উচ্ছ্বাসের ন্যায় বিরহ-জ্বালাময় প্রলাপের আর্ত্তনাদে ভক্তগণের হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেন। এই অবস্থায় আর্ত্তনাদের সারমর্ম্ম,—"কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেল কৃষ্ণ পাঙ, দুহু মোর কহ সে উপায়।" শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অসহ্য বেদনা প্রকাশের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত উক্তিই যথেষ্ট। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির পশ্চাদ্‌ভাগে বিপ্রলম্ভরসের যে অসীম সমুদ্র নিরন্তর সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গায়িত রহিয়াছে, তাহা কেবল তৎপ্রেমবৈভব-রসানুগৃহীত ব্যক্তিরই হৃদয়ঙ্গমযোগ্য। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

এই মত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥
সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥

কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করায় আনন্দ॥

শ্রীপাদ স্বরূপ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে কোন্ কোন্ গান করিয়া মহাপ্রভুর তৃপ্তিসাধন করিতেন, শ্রীল রামরায় কোন্ কোন্ শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার বিরহ-বেদনা প্রশমন করিতেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বাদশবর্ষকাল ব্যাপিয়াই তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর বিরহব্যথা-প্রশমনের নিমিত্ত কত সময়ে কত উপায় করিতেন, কত ভাবপূর্ণ শ্লোকে ও রসময় কীর্ত্তনে তাঁহার সান্ত্বনা করিতেন, শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী দিগ্‌দর্শনের ন্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। প্রেমিক ভক্তগণ শ্রীচরিতামৃতে লিখিত এই সকল অবস্থার সংক্ষিপ্ত সূত্র মাত্র প্রাপ্ত হইয়াই চরিতার্থ হইয়াছেন।

গোপীভাব

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গোপী-ভাবে বিভাবিত হইয়াই অনেক সময় যাপন করিতেন। বৃক্ষলতাদিপূর্ণ কানন দেখিলেই তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি বলবতী হইয়া উঠিত, বাহ্যজ্ঞান একবারে তিরোহিত হইত, অতি সহজে ব্রজলীলার অনন্ত মাধুর্য্যময় ব্যাপার তাঁহার নেত্রগোচর হইত। আর সেই লীলামাধুরী-সাগরে তিনি একবারেই নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন। শ্রীমম্মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন, মহাপ্রভুর লীলায় অসংখ্য ভাব পরিলক্ষিত হইলেও সাধারণতঃ তিন ভাবই প্রবলরূপে প্রত্যক্ষ হইত, সেই তিন ভাব যথা:—

"গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ কচ্চিৎ কচিৎ।"

অর্থাৎ গোপীভাব, দাসভাব ও ঈশভাব এই তিন ভাবেই মহাপ্রভুর ভাব-স্ফূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইত। অন্ত্যলীলায় গোপীভাবের স্ফূর্ত্তিই বলবতী। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণলীলাই মহাপ্রভুর একমাত্র ধ্যেয় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের যত লীলা আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাস-লীলাই সর্ব্ব লীলার সার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অনেক সময়েই গোপীভাবে রাসলীলার রসমাধুর্য্যে বিভোর থাকিতেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতিউতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥
এই মত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ষ শোক॥

শ্রীল কবিরাজের এই বর্ণনায় জানা যায় রাসলীলার সকল শ্লোকই মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের প্রলাপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। গোপীভাব-বিভোর শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, প্রত্যেক কাননকেই কালিন্দীকূল-শোভি নিভৃত নিকুঞ্জ কানন বলিয়া মনে করিতেন, আর প্রতি-

মুহূর্ত্তেই গোপিকাদের ন্যায় রাসলীলার রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ ঘটনার একটা উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহা দেখে আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহা পশিল যাঞিয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথাতথা॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে গোপীদের দিব্যোন্মাদ চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যারম্ভে লিখিয়াছেন :—

ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণং।
উন্মত্তবদ্দীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভির্বনে বনে॥

অর্থাৎ বিরহ-সন্তপ্তা গোপীরা উন্মত্তার ন্যায় কৃষ্ণান্বেষণে বনে বনে দীর্ঘরাত্রি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতের ত্রিংশ অধ্যায়ে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিরহ-সন্তপ্ত মহাপ্রভুও গোপীভাবে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তন্ময় হইয়া শ্রীভাগবতের উক্ত অধ্যায়ের শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া প্রলাপ করিতেন।

প্রাকৃত দেহের বিস্মৃতি এবং শ্রীবৃন্দাবনের আনন্দময়ী অপ্রাকৃত গোপীদেহের স্ফূর্ত্তিই, ব্রজোপসনার সাফল্য-লাভের প্রধানতম পরিচয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই লীলায় অতি স্পষ্টতররূপে এই শিক্ষার পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। স্বভজন-রসমাধুর্য্য-প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহার এই অবতার। অন্ত্যলীলায় সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তির প্রভাব অতি পরিস্ফুটরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

একাগ্র ভাবনাই সাধনার প্রধান সম্পত্তি। গোপীর আনুগত্যে বাসনাময়ী গোপীমূর্ত্তিতে নিরন্তর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান করার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের ভ্রমবৃত্তি তিরোহিত হয়, মায়াময়ী প্রপঞ্চ প্রহেলিকা অসার ইন্দ্রজালের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলা মহাসত্যরূপে তাদৃশী অপ্রাকৃত চিত্ত বৃত্তির সমক্ষে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করেন। জীব, এই প্রকারে নিত্যলীলার সান্নিধ্যে স্থান পাইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ

শ্রীমদ্ভাগবতে বিরহ-সন্তপ্তা গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-বর্ণন-পাঠ বা শ্রবণ বৈষ্ণবগণের পক্ষে সাক্ষাৎ প্রেমানন্দ-সুধা-আস্বাদনস্বরূপ। দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে ঃ—

> অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
> অতপ্যং স্তমচক্ষাণা করিণ্য ইব যূথপম্॥

গোপীদের গর্ব্ব-প্রশমন ও মান-প্রসাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবান সহসা অন্তর্হিত হইলে ব্রজাঙ্গনা-গণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া যূথপতির অন্বেষণে ব্যাকুলা হস্তিনীগণের ন্যায় ব্যাকুলা হইলেন।

প্রথমতঃ বহুক্ষণ তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিহারের অনুধ্যানে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল, তাঁহারা তদনুকরণ করিতে করিতে তন্ময় হইলেন। *

অতঃপরে তাঁহাদের এই দশা দুরীভূত হইল বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। তন্ময়ত্ব-দশা অতিবাহিত হইলেও উঁহারা উন্মাদাবস্থায় নিপতিত হইয়া "হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ, তুমি কোথায়"—এইরূপ বিলাপময় গান করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীভাগবতে—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ †

* প্রেমলীলাত্মক স্বভাবেই ব্রজগোপীদের এইরূপ তন্ময়তা ঘটে। ইহা মায়াবাদী বেদান্তীদের উপদেশের ন্যায় অহংগ্রহোপসনাজনিত তন্ময়তা নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় টীকায় লিখিয়াছেন, "এইরূপ তন্ময়তা রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ী অবস্থা মাত্র—অহংগ্রহোপসনা ইহার হেতু নহে। শ্রীপাদ সনাতন, তোষণীতে লিখিয়াছেন,—এইরূপ তন্ময়তা "লীলাখ্যানুভাব" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—

প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।

শ্রীগীতগোবিন্দেও ইহার উদাহরণ আছে যথা—

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥

† গান—গোকুলপ্রসিদ্ধপুতনাবধাদিময় গান। অন্য প্রকার গান অতঃপরে বর্ণিত হইয়াছে, উহা গোপীগীতা নামে প্রসিদ্ধ।

অর্থাৎ তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যিনি আকাশবৎ সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, ইঁহারা সেই মহাপুরুষের কথা বৃক্ষ গণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যথা শ্রীভাগবতে ঃ—

উচ্চৈঃ—দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ আর্ত্তি শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত উচ্চ গান। উচ্চৈঃস্বরে গান করার আরও হেতু আছে, যথা—শ্রীকৃষ্ণ গানপ্রিয়, হয়ত উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া তাঁহাকে আকৃষ্ট করার নিমিত্ত তাঁহারা বনে বনে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন। আবার আর্ত্তিপ্রকাশের সময়ে গান অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আর্ত্তি প্রকাশে হয়ত স্বতঃই গানের উদ্গম হইয়াছিল।

আর একটা কথা,—যিনি আকাশবৎ সমস্ত ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজ-করিতেছেন, গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ ও "তিনি কোথায়" এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন? শ্রীপাদসনাতন ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন "নিজপ্রেমালম্বনকেবল-নরলীলারূপেণৈব স্ফুরন্তম্।" অর্থাৎ যদিও সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা তাঁহার বিদ্যমানতা রহিয়াছে, তথাপি প্রেমময়ী গোপীরা, নিজপ্রেমালম্বনে কেবলনরলীলারূপে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন।

অচেতন বৃক্ষদিগের নিকট প্রশ্ন করা হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পূজ্যপাদ তোষণীকার বলেন "উন্মত্তকবৎ" অর্থাৎ তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া-ছিলেন। মেঘদূতকার অমর কবি কালিদাসও লিখিয়াছেন :—

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

গোপীদের স্বকীয় প্রেম-বিবর্ত্ত-বিশেষ হইতেই এইরূপ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। এইরূপ প্রেম-বিবর্ত্ত সমস্ত জগতের চেতনাচেতন পদার্থ, প্রেমময়ের প্রেমোজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত ও প্রেমপরিপ্লুত হইয়া উঠে। প্রেমিক ভক্ত তখন জগতের প্রত্যেক পদার্থের নিকটেই প্রেমময়ের অনুসন্ধানাত্মক প্রশ্ন করেন, অবশেষে প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত হন।

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনু র্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীগণ এক এক বৃক্ষের নিকট যাইতেছেন, আর বলিতেছেন "হে অশ্বত্থ, হে পিলু, হে বটবৃক্ষ, তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছ? শ্রীল চক্রবর্ত্তি মহাশয় ইহার যে ভাবার্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"নন্দনন্দন ভাললোক নহেন। তিনি মহাচোর। আমরা সেই চোরের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। যদি বল, তোমরা তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলে কেন? তাহার কারণ এই যে আমরা জানি নন্দ অতি সাধু। সাধুর পুত্র অসাধু হইবে কেন? এই জন্য আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাসের ফলে তিনি সহসা আমাদের মন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। যদি বল তোমরা না হয় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসই সংস্থাপন করিয়াছিলে, কিন্তু জান ত "মিত্রস্যাপি ন বিশ্বসেৎ" অতি বড় মিত্রকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে নাই, তোমরা এই লোকপ্রসিদ্ধ নীতি পরিত্যাগ করিলে কেন? আমরা সে বিষয়েও অসতর্ক ছিলাম না। কিন্তু নন্দনন্দন আমাদিগকে ঔষধবিশেষে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম,—সর্ব্বলোকোন্মাদক মহামোহন ঔষধ-বিশেষ। আমরা তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সহাস্য চাহনি প্রভৃতি সঙ্গীয় চোরগুলিকে আমাদের নেত্রদ্বার দিয়া আমাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি মনোরত্ন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। বলি, তোমরা কি এই চোর-চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাইয়াছ?"

গোপীরা এইরূপ প্রলাপময় প্রশ্ন করিয়া এক এক বৃক্ষের নিকট

কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইলেন, কিন্তু কাহারও মুখে কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। তখন আবার অপর বৃক্ষের নিকট চলিয়া গেলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও গোপীভাবাবিষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের কাননে কাননে এইরূপ কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রজ-বিরহিণীগণের সকল প্রকার ভাবই ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রকটিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত আরও অদ্ভুত বহুলভাব এই লীলায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল ভাব শ্রীভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়না। সেই সকল অত্যদ্ভুত ভাবময়লীলা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীচরিতামৃতে কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছেন। কাননে কাননে ব্রজগোপিকাকুল আকুল ভাবে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়া প্রতি তরুর নিকট গমন করেন, এবং প্রত্যেক তরু-বল্লীর নিকট প্রেম-কাতরস্বরে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ভক্তপাঠকগণ স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে এই বিরহ-ব্যাকুলতাময় ব্যাপারের বিশাল ভাব অনুভব করিয়া থাকেন। প্রেম-ব্যাকুলতার এই অত্যদ্ভুত প্রতিচ্ছবি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্তও হৃদয়ে প্রতিফলিত হইলে মানুষ কৃতার্থ হইতে পারেন।

রাস-সময়ে কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীরা কৃষ্ণের অদর্শনে বৃক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—"হে চূত, হে পিয়াল, হে পনস, হে কোবিদার, হে জম্বু, হে আকন্দ, হে বিল্ব, হে বকুল, হে কদম্ব, হে নীপ, হে অন্যান্য তরুগণ, তোমরা সকলেই মহাতীর্থবাসী ও পরোপকারী; পরোপকারের নিমিত্তই তোমাদের জন্ম, এই জানিয়াই আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তোমরা আমাদের

কিঞ্চিৎ উপকার কর। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পথটী বলিয়া দাও। তাঁহার বিরহে আমাদের চিত্ত একবারে শূন্য-শূন্য বোধ হইতেছে।”

গোপীরা কোনও উত্তর পাইলেন না, তাঁহারা মনে করিলেন, এ সকল পুরুষজাতি ইহারা কৃষ্ণের সখার ন্যায়। ইহারা আমাদিগকে কৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া দিবে কেন? সুতরাং স্ত্রীজাতীয় উদ্ভিদের নিকটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সভে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহ আইল, পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
উত্তর না পেয়ে পুন করে অনুমান।
এ সব পুরুষজাতি, কৃষ্ণের সখার সমান॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা সখীর সখা প্রায়॥ *

এই বলিয়া গোপীরা তুলসীর নিকট গিয়া বলিলেন :—

---

* এই ভাবটী বৈষ্ণবতোষণী হইতে পরিগৃহীত যথা :—

এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায় শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোঽস্মাকং মানং বিজ্ঞায়াসূয়য়া ন কিল কথয়েয়ুরিতি স্ত্রীজাতিত্বেনাপক্ষগ্রাহিণীং মন্যমানাং শশ্বৎদৃষ্টতৎপ্রীত্যানুমিতসৌভাগ্য-বিশেষেণ চ তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্য শ্রীতুলসীং পৃচ্ছন্তী।

বৃক্ষাদির নিকট প্রণয়িজনের জিজ্ঞাসাময় প্রশ্ন আমাদের সাহিত্যের স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ ভাব হইতে অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥

সুন্দর গানের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে একটী গান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

ওরে আমার মন ভুলাল যে কোথা আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনা, ফিরে চাই আশে পাশে ॥
কখন রই মুদে আঁখি, কখন এক দৃষ্টে থাকি।
কত বলি কত ডাকি দেখিব মনের আশ্বাসে ॥
পেলাম পেলাম দেখলাম তারে, এই সে বলে ধরি যারে,
দেখি সে নয় সে হলে পরে আর কি মন ফিরে আসে ?
(ওরে) রবিচন্দ্রতারাচয়, তোরা কেন এত তেজোময়।
আমার জ্যোতির্জ্যোতি সুধার আধার তবে আছে বুঝি আকাশে
বল দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে হলি সুশীতল ;
ঝরিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে ॥
বলরে বল বিহঙ্গকুল, তোরা কি জন্য হয়ে আকুল।
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে যাস কার উদ্দেশে ?
বল দেখিরে তরুলতা আমার জগৎ জীবন আছে কোথা ;
তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথা তাই তোদের কুসুম হাসে।
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধরেছিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গতুলে নিত্য করিস উল্লাসে।
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, এমন প্রেমতো দেখি নারে।
দেখা পাইলে সুধাই তারে কেন যে সে ভালবাসে।
কোথা আছ দেখা দাও, করুণ নয়নে চাও।
হৃদয় সখা সাধ পুরাও, প্রকাশি হৃদয়াবাসে ॥

অর্থাৎ "হে তুলসি, হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুত অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন, তুমি কি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ?" অতঃপরে "হে মালতি, হে মল্লিকে, হে যুথিকে, মাধব কি কর স্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এই পথ দিয়া গমন করিয়াছেন?"

এই প্রকারে বনের তরুলতাবল্লরীগণের নিকট এবং বনের পশু পক্ষী প্রভৃতির নিকট গোপীরা উন্মাদিনীর ন্যায় ব্যাকুল ভাবে কাতর কণ্ঠে কৃষ্ণের অনুসন্ধানসূচক পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কৃষ্ণান্বেষণ করেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিরহ-বিধুর গোপীদের ন্যায় কাননে কাননে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ক্রমশঃই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি যে শ্রীপুরুষোত্তমের কোন এক কাননে অবস্থান করিতেছেন, এই পার্থিব জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও আর তাঁহার রহিল না। গোপীভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে তিনি নিজকে একবারেই রাসরসবঞ্চিতা বিরহ-ব্যাকুলা উন্মাদিনী গোপী বলিয়া মনে করিয়া বৃক্ষলতাবল্লরীর নিকট ও পশুপক্ষীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অস্থির ও অধীর হইয়া পড়িলেন। বিরহ-ব্যাকুলতা চরমসীমায় উত্থিত হইল। তাঁহার তখন মনে হইল, "যখন কাননে ভ্রমণ করিয়াও প্রাণবল্লভের দর্শন পাইলাম না, তখন তাঁহার অতি প্রিয়তম রম্যস্থান যমুনার শ্যামলতটে যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দেখি না কেন?" তদীয় শ্রীভাব-দেহ অতি ব্যাকুলভাবে শ্রীযমুনার তটে চলিয়া গেলেন, প্রাণের আশা মিটিল, কালিন্দীতটে কদম্বতলে

মনচোরা কোটীমন্মথমদন মুরলীবদনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য দেখা মাত্রই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীল রামরায় ও শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভৃতি এই কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্নসকল পরিলক্ষিত হইতেছে, তাঁহার অন্তরাত্মা যেন আনন্দরসাস্বাদনে বিভোর, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে॥
কোটী মন্মথ-মদনমোহন মুরলী বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হেরে জগন্নেত্র মন॥
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হৈঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥

ইঁহারা বহুযত্নে মহাপ্রভুকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্যকরূপে হইল না। তিনি মূর্চ্ছা হইতে চেতনা পাইলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার গোপীভাব তিরোহিত হইল না। তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভাববিহ্বল কমলনয়ন চল-চল ভাবে বৎসহারা ধেনুর ন্যায় চারিদিকে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "সখি এই ত এখনই সেই মনচোরাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম,

আবার সে কোথায় গেল, আমার মন তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, নয়ন তাহাকেই খুজিয়া বেড়াইতেছে। কই, এখনও তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যসূচক এক শ্লোক পড়িয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কাঁহা গেল কৃষ্ণ এই পাইনু দর্শন।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্রধন॥
পুন কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন।
তাহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥

এ স্থলেও শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের একটী পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারঃ প্রভুঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্।

অর্থাৎ সখি, এই যে আমি চপলার চমকের ন্যায় আমার নয়ন-রঞ্জনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সেই নবজলধরকান্তি, সেই বিজলীর ন্যায় পীতাম্বর, সেই সুচিত্রমুরলীশোভিত শরৎচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল, সেই শিখিপাখার চূড়া, আর গলদেশে সেই মুক্তামালা। সখি, আমার সেই মনোমোহন মুরলীবদন মদনমোহন আমার নয়নের পিপাসা বাড়াইয়া তুলিতেছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় এই পদ্যের যে ব্যাখ্যাপদ

করিয়াছেন, তাহা আরও সুমধুর, আরও ভাবগম্ভীর এবং আরও রসোদ্দীপক, তদ্‌যথা :—

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমানগণ হরে সভার নেত্রমন
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল।
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক মোর নেত্র চাতক
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥
সৌদামিনীপীতাম্বর স্থির রহে নিরন্তর
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা উপরে দিয়াছে দেখা
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি নবাভ্র গর্জ্জন জিনি
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়॥
অকলঙ্ক পূর্ণকল লাবণ্যজ্যোৎস্না ঝলমল
চিত্রচন্দ্রের যাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিল॥
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে মেঘ নিল অন্য স্থানে
মরে চাতক পিতে না পাইল॥

এই পদে শ্রীকৃষ্ণকে মেঘের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

রাধাভাপন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন 'শ্রীকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামল-স্নিগ্ধ-দলিত কজ্জলের ন্যায় সুচিক্কণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ নীলকমল হইতেও সুকোমল। সখি, তোমরা যে যাহাই বল, আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝি নবজলধর। জলধরের সকলগুলি লক্ষণই তাহাতে আছে। আমার নয়ন যুগল চাতকের ন্যায় এই মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে, দেখিতে না পাইলেই তৃষ্ণায় মরিয়া যায়। মেঘে বিজলী আছে, আমার মদনমোহনের পীতাম্বরের প্রভাই সেই বিজলী; কিন্তু এ মেঘ অদ্ভুত, ইহার সকলই অদ্ভুত। প্রাকৃত মেঘের বিজলী ক্ষণ-স্থায়িনী, কিন্তু পীতাম্বরের বিজলীপ্রভা সততই বিদ্যমান। নবমেঘে বকপাঁতি মালার ন্যায় দেখায়। আমার মদনমোহনের গলে দোদুল্য মুক্তাহার শোভা পাইতেছে। মেঘে ইন্দ্রধনু আছে, কখন কখন উহাতে দুইটী ইন্দ্রধনুও পরিলক্ষিত হয়। আমার হৃদয়ানন্দ নন্দনন্দন-রূপ জলধরের মাথায় যে ময়ুরপুচ্ছ শোভা পায়, উহাই ইন্দ্রধনু। * এতদ্ব্যতীত বৈজয়ন্তীমালাও অপর ইন্দ্রধনু। মেঘের গর্জ্জন আছে, সখি, আমার শ্যাম-মেঘের মোহনমুরলীরবই মেঘগর্জ্জন। মেঘের

---

* কালিদাস মেঘদূতে মেঘের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

রত্নচ্ছায়াব্যতিকরইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তাদ্।
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য॥
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে।
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেষস্য বিষ্ণোঃ॥

শ্রীজয়দেবও লিখিয়াছেন—

"প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতরুচিরমুদিরসুবেশম্।

গর্জ্জনে যেমন ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে, আমার মুরলীধরের মোহন মুরলী রবে ময়ূরগণ তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিকতর উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। সখি, পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, এ অতি অদ্ভুত মেঘ। প্রাকৃত মেঘের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই, মুখমণ্ডল নাই। কিন্তু আমার নেত্র-চাতকের পিপাসাহারী এই নব নীরদের শ্রীমুখ মণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষ আকর্ষণশীল। মুখখানি চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর;—চন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর সম্পূর্ণ। চাঁদে ত্রুটী আছে, চাঁদের কলঙ্ক আছে, কিন্তু এই বিচিত্র চাঁদে কলঙ্ক নাই; চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কিন্তু শ্রীমুখ-চন্দ্র চিরপূর্ণ, চির সমুজ্জ্বল, লাবণ্য জ্যোৎস্নাই চিরদিনই ঝলমল। প্রাকৃত মেঘ অতি অল্প স্থানে বর্ষণ করে, তাহাতে তাপদগ্ধ পৃথিবীর বাহ্য তাপ দূর হয়, কিন্তু উহাতে জীবের ত্রিতাপ নষ্ট হয় না। বিরহিণীর বিরহ তাপ উহাতে বাড়ে বই কমে না। কিন্তু আমার শ্যাম-জলধর চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্ব্বপ্রকার তাপ বিনাশ করেন। সখি, আমার নয়ন-চাতক এই মেঘের দেখা পাইয়াছিল। কিন্তু হায় আমার দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্জায় এই স্নিগ্ধশ্যাম জলদসুন্দরকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। হায়, আমার নয়নচাতক তাহাকে না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে, এখন কি উপায় করি বল?

এই বলিয়া মহাপ্রভু অবশভাবে শ্রীপাদ রামরায়ের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। রামরায় বিশাখার ন্যায় রাইরূপী মহাপ্রভুকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীরামরায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন।

শ্লোক-ব্যাখ্যা

তিনি গদ্‌গদ বাক্যে বলিলেন, "রামরায়, ভিতরের জ্বালা বাহিরের বাতাসে জুড়াইবে না; শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের স্মৃতি শতবৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় আমায় নিদারুণ জ্বালায় দগ্ধ করিতেছে, তুমি কৃষ্ণ কথা বল, বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।"

মহাপ্রভুর বিরহ-কাতর মুখচ্ছবি, এবং প্রেমগদ্‌গদ বাক্য শুনিয়া রামরায়ের নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক পড়িতে লাগিলেন তদ্‌যথা :—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ। ১০।২৯।৩৬

অর্থাৎ তোমার হাসিমাখা অধরসুধাব্যঞ্জক কুণ্ডলশোভি গণ্ড এবং অধরসুধাযুক্ত অলকাবৃত মুখখানি, অভয়ব্যঞ্জকভুজদণ্ড এবং লক্ষ্মীর রমণস্থল বক্ষঃ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।"

শ্রীল রামরায় অতি ধীরে ধীরে গদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া নীরব হইতে না হইতেই মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ ইহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার একটি পদে সেই ব্যাখ্যার আভাস দিয়াছেন যথা :—

কৃষ্ণ জিতি পদ্ম চান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার।

ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি নিজ পতিঘর দ্বার ॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি গণে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী মৃগ-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তা সভার হৃদয় হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষ,
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণ সর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রপৈশে, নারীর হৃদয় দংশে,
মরে নারী সে বিষ-জ্বালায় ॥
কৃষ্ণ করপদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষনাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীর মন ॥

মূল শ্লোকটীর টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি লিখিয়াছেন:—

"তথা বীক্ষ্যেতি শ্বেষাং নেত্র-খঞ্জন-বন্ধোঽপিধবনিভঃ। তত্র অলকানাং—পাশত্বং; কুণ্ডলয়ো স্তদন্তিমকুণ্ডলিকারূপত্বম; গণ্ডয়ো—স্তন্নিধানস্থলত্বং; অধরসুধায়াঃ—লোভ্যাহারত্বম্; হসিতাবলোকস্ত—বিশ্বাসজনকস্বপালিতখঞ্জনদ্বয়োর্বিলাসত্বম্; ভুজদণ্ডযুগস্ত—দত্তাভয়ত্বমেব করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশ বক্ষসশ্চ সুখচারপ্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতম্।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখখানি গোপীদের নয়নখঞ্জন বন্ধনের ফাঁদ-স্বরূপ। শ্রীমুখের অলকাবলী পাশস্বরূপ; কুণ্ডলযুগল সেই পাশের প্রান্তভাগের কুণ্ডলিকা; গণ্ডযুগল উহাদের নিধান-স্থল; অধর-সুধা,—লোভজনক আহার্য্য; হসিতাবলোকন,—স্বপালিত নয়ন খঞ্জনদ্বয়ের বিশ্বাসজনক বিলাসস্থ; করপল্লবাদিযুক্ত ভুজযুগল,—অভয় দেওয়ার ভাবপ্রকাশক,—শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ, সুখচারপ্রদেশব্যঞ্জক।*

---

* এই ভাবের একটী মহাজনী পদ শুনিতে পাওয়া যায়। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
ব্যাধছলে কদম্বের তলে।
দিয়ে হাস্ত সুধাচার অঙ্গছটা আঠা তার,
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
* * * *
মনমৃগী হেন কালে পড়িল রূপের জালে ইত্যাদি

এই পদটী অতি প্রসিদ্ধ। অনেক গায়কই এই পদটী গাইয়া থাকেন।

এই মহাভাব-গম্ভীর শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যব্যঞ্জক। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনিই মহিমা, যে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ-অবলোকনেই গোপীদের হৃদয় অনিবার্য্যরূপে তাঁহাতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্রসুশীতল করপদ-তলের প্রভাব অতি অদ্ভুত। তাঁহার শ্রীকর ও শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শলাভ ঘটিলে স্মরজ্বালার নিবৃত্তি হইয়া যায়। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের ভজন করিয়াই চির-দিনের তরে স্মরজ্বালার ক্লেশ ও কর্ম্মবিপাক হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।*

যাহা হউক, অতঃপরে শ্রীরাধিকা বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া বিশাখার নিকট যেরূপ বিলাপ করিতেন, মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়ের নিকট সেইরূপ ভাবের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীল কবি-

---

* শ্রীচরিতামৃতে যে ব্যাখ্যাপদ আছে, ইতঃপূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও এই শ্লোকটীকে গোপীদের নয়নখঞ্জনবন্ধ ফাঁদ বলিয়া উপসংহারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে "দত্তাভয়ং ভুজদণ্ড-যুগং" পদের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা পদের ভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তোষণীকার করপল্লবযুক্ত সুদীর্ঘ ভুজদণ্ডকে ফাঁদের বিশ্বাসজনক উপকরণরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের পদে উহাকে কৃষ্ণসর্পের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখমণ্ডলাদি পক্ষী বা মৃগবধকারীর ফাঁদের করণরূপে কল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে ভুজযুগ-লেরও করণত্ব থাকা সম্ভবপর। শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যার সেই করণত্ব অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু "কৃষ্ণসর্পকার" বলায় তাদৃশ করণত্বের কোন ভাব বুঝা যায় না। যদি এই অংশ-ব্যাখ্যার পূর্ব্বেই রূপক-ব্যাপ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ভুজের "দুই শৈলছিদ্র প্রবেশ" ব্যাপার সম্ভবতঃ রহস্যময় ও অস্ফুট।

রাজ গোস্বামী স্বরচিত শ্রীগোবিন্দলীলা মৃত গ্রন্থ হইতে সেই ভাবের একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন,† তদ্‌যথা :—

হরিন্মণিকবটিকাপ্রততহারি বক্ষস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্।

অর্থাৎ শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিতেছেন। সখি, মদনমোহন সততই আমার চিত্তে স্ফুরিত হইতেছেন,। তাঁহার বক্ষঃস্থল মরকতমণির কপাটের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ ও মনোহর, তাঁহার বাহুদ্বয় অর্গলসদৃশ এবং কাম-পীড়িত তরুণীদের মনস্তাপবিনাশে সমর্থ, তাঁহার অঙ্গ চন্দ্র চন্দন উৎপল ও কর্পূর সদৃশ সুশীতল। সখি, সেই মদনমোহন সর্ব্বদাই আমার বক্ষঃস্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।"

---

† শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনে গোবিন্দলীলাদি হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সেই সকল শ্লোক যে মহাপ্রভুর কথিত শ্লোকের ভাবানুগত শ্লোক মাত্র, এরূপ মনে করার প্রমাণ এখানেও পাওয়া যাইতেছে যথা :—

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
যেই শ্লোক পড়ি রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘারিয়া হৃদয়ের শোক।

অতঃপরে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে গোবিন্দলীলামৃত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের যে অর্থ ও ভাব অনুভূত হয়,—মহাপ্রভু তদ্‌ভাবযুক্ত কোন কোন শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন।

কাতরকণ্ঠে প্রভু এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃ পরিসিক্ত হইয়া গেল। তিনি গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন "সখি, আমি এখনই আমার প্রাণবল্লভকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু নিজের দুর্দ্দৈব দোষে আবার তাঁহাকে হারাইলাম। শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ চঞ্চল। তিনি দেখা দিয়া মন হরণ করেন, আবার মন মজাইয়া তৎক্ষণাৎ দূরে চলিয়া যান"।*

শ্রীগীতগোবিন্দের গান

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তিনি শ্রীরাম রায়ের মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিলেন, শ্রীরাম রায় শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন, নিজে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শান্তি হইল না। তখন তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন, "স্বরূপ, কিছুতেইত শান্তি পাইতেছি না, তোমার গানে অনেক সময়ে

* শ্রীভাগবত হইতে এই বাক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে যথা :—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতকার এই ভাবেই চঞ্চল-স্বভাব শ্রীকৃষ্ণকে চপলার গতির ন্যায় দেখিতে পাইতেন। রবীন্দ্রবাবুর গীতিগ্রন্থেও এইরূপ একটী গান আছে যথা :—

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চির দিন কেন পাইনা।

কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।

ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমা যবে পাই দেখিতে

হারাই হারাই সদা ভয় পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে।

কি করিলে বল পাইব তোমাকে রাখিব আঁখিতে আঁখিতে.

এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ তোমারে হৃদয়ে ধরিতে। ইত্যাদি

আমার হৃদয় সুস্থ হয়, এখন এমন একটী গান কর যাহাতে একটুকু শান্তি পাই।"

শ্রীপাদ স্বরূপ তখন শ্রীগীত-গোবিন্দের একটি পদ মধুর করিয়া গাইতে লাগিলেন যথা ঃ—

সঞ্চরদধর- সুধামধুরধ্বনি-
মুখরিতমোহনবংশম্।
বলিতদৃগঞ্চল- চঞ্চল মৌলি-
কপোলবিলোলবতংসম্॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।
চন্দ্রকচারু- ময়ূরশিখণ্ডক-
মণ্ডলবলয়িতকেশম্।
প্রচুর পুরন্দর- ধনুরনুরঞ্জিত-
মেদুরমুদির সুবেশম্॥ (রাসে)
গোপকদম্ব- নিতম্ববতীমুখ-
চুম্বনলম্ভিতলোভম্।
বন্ধুজীব- মধুরাধরপল্লব-
মুল্লসিতস্মিতশোভম্॥ (রাসে)
বিপুলপুলক- ভুজ-পল্লব-বলয়িত-
বল্লবযুবতীসহস্রম্।
করচরণোরসি মণিগণভূষণ-
কিরণ-বিভিন্ন-তমিস্রম্॥ (রাসে)

জলদপটল- চলদিন্দুবিনিন্দক-

চন্দনতিলকললাটম্।

পীন পয়োধর- পরিসরমর্দ্দন-

নির্দ্দয়হৃদয়কপাটম্ (রাসে)

মণিময় মকর- মনোহর কুণ্ডল-

মণ্ডিতগণ্ড-মুদারম।

পীত বসন- মনুগতমুনিমনুজ-

সুরাসুরবরপরিবারম্॥ (রাসে)

বিশদ কদম্ব- তলে মিলিতং-

কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্।

মামপি কিমপি তরল তরঙ্গদনঙ্গ-

দৃশা মনসা রময়ন্তম্॥ (রাসে)

শ্রীজয়দেবভণিত- মতিসুন্দর-

মোহনমধুরিপু-রূপম্।

হরি-চরণ-স্মরণং প্রতি সংপ্রতি

পুণ্যবতামনুরূপম্॥ (রাসে)

এই পদটী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্যব্যঞ্জক। এই গানটী গুর্জ্জরী রাগে গেয়। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,—"সখি, শ্রীকৃষ্ণের কথা আজি আমার মনে পড়িতেছে। তিনি যে রাসক্রীড়ায় আমার সহিত নর্ম্ম-কেলি করিয়াছিলেন, তাহা মনে জাগিতেছে। সখি, তাঁহার অধর-স্ফুরণে হাতের বাঁশী সুধামধুর রবে মুখরিত হইয়া থাকিত, আর আমি তাহা কাণ পাতিয়া শুনিতাম। তিনি কটাক্ষ করিয়া বঙ্কিম

নয়নে যখন আমার দিকে চাহিতেন, তখন তাঁহার মস্তক ঈষৎ চালিত হইত, তাহাতে কাণের কুণ্ডল কপোলে ঝুলিয়া পড়িত, সখি সেই মনোহর মুখখানি এখনও আমার মনে পড়িতেছে। তাঁহার কেশ পাশ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ময়ূরপুচ্ছে পরিবেষ্টিত ; দেখিয়া মনে হইত যেন ইন্দ্রধনুতে নব মেঘ শোভা পাইতেছে। [*]

তাঁহার বিম্ববিনিন্দি উল্লসিত হাসিমাখা অধর-পল্লব নিতম্ববতী গোপবধূদিগের মুখচুম্বনে প্রলুব্ধ [†], বাহু যুগল বিপুল পুলকান্বিত এবং সহস্র সহস্র গোপবধূ-আলিঙ্গনে তৎপর। তাঁহার করচরণ ও বক্ষস্থিত মণিভূষণের আভায় অন্ধকার বিনষ্ট হয় ; তাঁহার ললাট-স্থিত চন্দনতিলক মেঘমালাবেষ্টিত চন্দ্রের শোভা হইতেও অধিকতর সমুজ্জল [‡], তাঁহার অতি দৃঢ় ও প্রসরতর হৃদয় কপাট পীনপয়ো-

---

* শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ শঙ্করমিশ্র তদীয় রসিকমঞ্জরী টীকায় লিখিয়াছেন, এস্থলে "অদ্ভুতোপমা' অলঙ্কার ঘটিয়াছে।

† এই স্থলে শ্রীগীতগোবিন্দের অপর টীকাকার শ্রীল নারায়ণদাস কবিরাজ তদীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী টীকায় "লম্ভিত' পদ-সাধন লইয়া ব্যাকরণের বড় ঘটা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন। অত্র নির্ব্বাৎপক্ষে ধান্যপলাল-ন্যায়েন প্রযোজ্যাবিবক্ষায়াং লম্ভেঃ কর্ম্মনিবাচ্যোক্ত প্রত্যয়ঃ। পশ্চাৎ প্রযোজ্যমানস্য শেষত্বাৎ ষষ্ঠীত্যুপ-মুক্তা কৃষ্ণস্য বক্ষ্যমাণভাপদার্থতা" ইত্যাদি বহু কথা লিখিত হইয়াছে।

‡ কুম্ভরাজ নামক অপর এক ব্যক্তি রসিকপ্রিয়া নামে শ্রীগীতগোবিন্দের যে একখানি টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এস্থলে লিখিত হইয়াছে "অত্র ললাটস্থ শ্যামত্বাত্তিলকস্য গৌরত্বান্মেঘচন্দ্রাভ্যামুপামানোপমেয় ভাবঃ।

ধর-পরিসর মর্দ্দনে তৎপর। [*] সখি, সেই মণিময় মকরকুণ্ডলধারী মুনিমানব দেবসুর পত্নীর মনমোহকারী পীতবসনধারী রমণী-বাঞ্ছা-পূরণে উদার। শ্রীকৃষ্ণের কথা ঘন ঘন আমার মনে পড়িতেছে, আর আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। সখি, তিনি চাটু বচনে আমার প্রেমকলহোদ্ভূত কত ক্লেশ নিবারণ করিতেন, আজ তাহার কথা রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতেছে। তিনি কদম্বমূলে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেন, সখি সেই মানসকেলিবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে কিছুতেই আর ভুলিতে পারিতেছি না।"

শ্রীপাদ স্বরূপের গান শুনিয়া মহাপ্রভু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া গান শুনিতেছিলেন, কিন্তু আর বসিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না, তখন প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন। মণিহারা ভুজঙ্গিনী একেই অধীরা, তাহার উপরে সে ডম্বুরুর ধ্বনি শুনিলে আরও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং ফণা বিস্তার করিয়া ব্যাকুলভাবে নাচিতে থাকে। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের অবস্থা মনে করুন। তিনি দিনযামিনী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে অধীর, তাহার উপরে আবার শ্রীগীত-গোবিন্দের গান! গাইতেছেন কে—না, "সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম" শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর, যাঁহার কণ্ঠ শুনিলে সর্পমৃগাদিও স্তম্ভিত হয়। সুতরাং তখন মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবরস-নিধির যে কি উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা উঠিয়াছিল, তাহা অতি

* বালবোধিনীটীকাকার লিখিয়াছেন—"দৃঢ়তবিস্তীর্ণবাহুভ্যাং অত্র ক্রমযুক্ত কবাটস্বরূপেণ নিরূপণম্॥

সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিল॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল। *
হর্ষাদি ব্যাভিচার সব উথলিল॥ †
ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ভাব-শাবল্য। ‡

---

* অষ্ট সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর-ভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

† ব্যাভিচার—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল, নিদ্রা, ও বোধ এই সকল ব্যাভিচারী ভাব। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিত আছে :—

ভাবানাং কচিদুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য শান্তয়ঃ।
দশাশ্চতস্র এতাসামুৎপত্তিস্ত্বিহ সম্ভবঃ।

অর্থাৎ ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য ও ভাবের শান্তি—ভাব সম্বন্ধে এই চারিটী দশা কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবোৎপত্তির অপর দুইটী প্রকার আছে এই যথা,—ভাবোদয় ও ভাবসম্ভব।

ভাবোৎপত্তির উদাহরণ এইরূপ :—

মণ্ডলে কিমপি চণ্ডমরীচে র্লোহিতায়তি নিশম্য যশোদা।
বৈণবীং ধ্বনিধুরাম বিদূরে প্রস্রবস্তিমিত কঞ্চলিকাসীৎ॥

ভাবরসনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে শ্রীগীত-গোবিন্দের গানে অনন্ত মাধুর্য্যের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের

অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল লোহিত বর্ণ হইলে যশোদা অদূরে বেণুধ্বনি শুনিয়া ক্ষীর-ধারায় কঞ্চুলিকা আর্দ্রীভূত করিলেন। এস্থলে হর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাবসন্ধি :—

"স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।"

সমান বা ভিন্ন প্রকারের ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি।

সন্ধি স্বরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্ম্মতঃ।

ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে উদ্ভূত সমান ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম স্বরূপ সন্ধি। ইহার উদাহরণ এইরূপ :—রাক্ষসী পতিত হইয়াছে এবং উহার স্তনের উপরে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতেছেন, যশোদা এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতা হইয়া-ছিলেন। এই স্থানে অনিষ্ট ও ইষ্ট দর্শন হেতু জড়ভাবদ্বয়ের মিলন হইল।

এক কারণজনিত অথবা ভিন্ন কারণজনিত ভাবদ্বয়ের মিলনে যে সন্ধি হয় উহা ভিন্নসন্ধি নামে খ্যাত। ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক কারণজনিত সন্ধির লক্ষণ এইরূপ :—যশোদা কহিলেন এই শিশুর চপলতা অতি দুর্ব্বার। শিশুটী গোকুলে ও বাহিরে ধাবমান হইতেছে। যাহা হউক, ইহার এই নির্ভরতা দেখিয়া হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত কম্পিত হয়।" এস্থলে হর্ষ ও আশঙ্কা এই উভয়ের সন্ধি হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন কারণেও ভাবদ্বয়ের সন্ধি হয় যথা—দেবকী প্রফুল্লনেত্র ক্রীড়াপর পুত্রকে এবং বলিষ্ঠ মণ্ডলীকে অগ্রে দেখিয়া চক্ষুদ্বয়ে শীতল ও উষ্ণজল ধারণ করিলেন। এস্থলে হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি হইল। অপিচ :—

একেন জায়মানানামনেকেন চ হেতুনা।

বহূনামপি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষ্যতে।

এক কারণে অথবা বহু কারণে সম্ভূত বহু ভাবের সন্ধিও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্ভব হইতে লাগিল। স্বরূপ গাইতে লাগিলেন, আর মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবরাশি উথলিয়া উঠিল। কেবল ভাবোদয় নহে, ভাব

এক কারণে বহুল ভাবের মিলনের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রীমতী কালিন্দীতটবর্ত্তি বনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহার গতিরোধ করিলেন। এই স্থলে শ্রীমতীর অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ও গতিবিধিতে হর্ষ, উৎসুক্য, গর্ব্ব, ক্রোধ ও অসূয়ার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।

আবার অপর পক্ষে বহুকারণেও বহুভাবের মিলন হইয়া থাকে। ইহারও উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা:—কোনও সময়ে শ্রীমতী নন্দরাজের আলয়ে মহোৎসবে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত হার শ্রীমতীর গলায় ছিল, যশোদা শ্রীমতীর গলার দিকে তাকাইয়া একটুকু মৃদুহাস্য করিয়া অপরদিকে চলিয়া গেলেন, শ্রীমতীর হৃদয়ে ইহাতে একটুকু লজ্জার উদয় হইল, সম্মুখে চাহিয়া দেখেন শ্রীকৃষ্ণ সমাগত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ মনে হর্ষের উদয় হইল। দেখিতে দেখিতেই অভিমন্যু (আয়ান) আসিয়া উৎসবে উপস্থিত হইলেন, শ্রীমতীর হৃদয়ে তখন যুগপৎ অমর্ষ ও বিষাদের উদয় হইল।

ভাবশাবল্য,—

"শাবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃস্যাৎ পরস্পরম্।"

ভাবসকল যখন পরস্পর সংমর্দ্দিত হয়—অর্থাৎ একভাবের দ্বারা যখন অপর ভাব প্রতিহত হয়, তখন উহা ভাবশাবল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

ধিক্ দীর্ঘে নয়নে মমাস্তু মথুরা যাভ্যাং ন সা প্রেক্ষ্যতে।
বিশ্লেষং মম কিঙ্করীকৃত নৃপা কালস্তু সর্ব্বঙ্কষঃ॥
লক্ষ্মীকেলিগৃহং গৃহং মম হহো নিত্যাং তনু ক্ষীয়তে।
সদ্যস্ত্যেব হরিং ভজেয় হৃদয়ং বৃন্দাটবী কর্ষতি॥

সকলের অদ্ভুত মিলন ও শাবল্যের আবির্ভাব হইল। ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য,—ভাবপ্রবণ পাঠকগণেরই ধারণার বিষয়। কিন্তু কেবল কল্পনায় ইহার ধারণা অসম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা-সুধায় হৃদয় পরিসিক্ত না থাকিলে এই সকল সরসতম তত্ত্ব কেহ কেহ কখনও বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক, শ্রীপাদ স্বরূপ উক্ত পদটির এক এক চরণ পুনঃ

কোন গৃহস্থ বলিতেছেন, আমার সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় মথুরা দেখিতে ইচ্ছুক নহে, ইহাদিগকে ধিক্। ইহার বিদ্যাও কম নয় ইহাতে স্বয়ং নৃপতি কিঙ্কর সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন। কালকেও কম বলা যায় না, কাল সকলকেই নিরস্ত করে। আমার গৃহটীও লক্ষ্মীর ক্রীড়া ভুবনতুল্য। হা, কষ্ট এই সম্পত্তিই বা কে ভোগ করিবে? তবুও তো দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে। তবে এখন কি করি? গৃহে বসিয়াই হরি ভজন করি। হায় তাহাই বা কিরূপে করি শ্রীবৃন্দাবন-ধাম যে অনবরত আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছেন।

এই উদাহরণ নির্ব্বেদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ধৃতি, বিষাদ, মতি ও ঔৎসুক্যের পরস্পর সংমর্দ্দ হইয়াছে।

ভাবের চতুর্ব্বিধ দশার শেষ দশার নাম—শান্তি। শান্তির লক্ষণ এই যেঃ—

"অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে।"

অর্থাৎ অতিশয় আরূঢ় ভাবের বিলয়ই শান্তি নামে অভিহিত। ইহার উদাহরণ এইরূপঃ—

ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ম্লানবদন ও বিবর্ণ হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা পর্ব্বতকন্দরায় মৃদুমধুর মুরলীর রব শুনিয়াই তাঁহাদের অঙ্গ পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই ভাবশান্তির কথা আলোচ্য প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পুনঃ গাইতে লাগিলেন, আর ভাববিহ্বল মহাপ্রভু রসময় গানের এক একটী চরণ আস্বাদন করিতে লাগিলেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ হইল না। শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর ক্লেশ মনে করিয়া নীরব হইলেন। অথচ ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু নিরস্ত হইলেন না। গান নিবৃত্তি হইলেও তিনি প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিলেন এবং "বোল বোল" বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপকে গান গাহিতে অনুরোধ লাগিলেন, কিন্তু স্বরূপ সে আদেশ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। হরিনামের সুধাময় রবে চারিদিক পরিপূরিত হইয়া উঠিল, মহাপ্রভুর নৃত্য থামিল না। তখন শ্রীল রামানন্দ রায় প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে বসাইলেন। স্বেদস্রোতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিস্নাত হইতেছিল। ভক্তগণ ব্যজন করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে মহাপ্রভু সুস্থির হইলেন। উঁহারা স্নানার্থ তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রে গমন করিলেন।

সমুদ্রকূলে এইরূপে এক বিরাট ভক্ত-সম্মিলনী হইল। স্নানান্তে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে লইয়া তাঁহার ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে তাঁহার শয়ন ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে মহাপ্রভুর উদ্যান-বিলাস লীলার কিঞ্চিৎ আভাস বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তদীয় স্তবমালায় এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া রাখিয়াছেন যথা :—

পয়োরাশে স্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়ো
র্মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎকৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদম্ ॥

অর্থাৎ যিনি সাগরতটে উপবন দেখিয়া বৃন্দাবনস্মরণজনিত প্রেমভাবে বিবশ হইয়াছিলেন এবং ভক্তিরসে বিভাবিত হইয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্য কি আবার আমায় দর্শন দিবেন? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী! প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভিন্ন এরূপ আর্ত্তি আর কে প্রকাশ করিতে পারে?

মহাপ্রসাদে প্রেমোন্মাদ

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রব্যের এই পঞ্চগুণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-লব্ধ। যাহারা প্রাকৃত বিষয়ের রসাস্বাদন করে, তাহাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত ভাবেই বিভাবিত হয়। কিন্তু যাঁহারা সার সত্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই সার-সত্যের সার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম তাঁহাদের নিকটে প্রত্যেক প্রাকৃত দ্রব্য হইতেই বিস্ফুরিত হইয়া থাকেন।

মহাপ্রভুর শেষ-লীলা অতীব রহস্যময়ী। প্রাকৃত জগতের প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে অপ্রাকৃত প্রেমময় জগতের সংবাদ প্রদান করে, প্রত্যেক পদার্থ কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি প্রকাশ করে, এই শেষ লীলায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে এসম্বন্ধে একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভু একদিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যেই "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া অধীর হইয়া—

পড়িলেন। সিংহদ্বারে শ্রীমন্দিরের দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর এই বিকল ভাব দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া মহাপ্রভুকে বন্দনা করিলেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া নয়নজলে ভাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "সখে আমার কৃষ্ণ কোথায়, আমি তাঁহাকে না দেখিয়া আর তিলার্দ্ধও স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণনাথকে দেখাও, আমার প্রাণ আনছান করিতেছে, কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিতে পারি না, সত্বরে আমার প্রাণবল্লভকে দেখাও।"

মহাপ্রভুর ব্যাকুলতায় দ্বারাধিপ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দ্বারাধিপ মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন "এই আপনার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করুন।" মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন, সতৃষ্ণ নয়ন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন, সাক্ষাৎ মোহন মুরলীধারী তাঁহার নেত্র গোচর হইলেন, আর অমনি তিনি সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া রহিলেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী তদীয় শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে এই লীলা একটী পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা—

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণ স্তরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি।

অর্থাৎ একদা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ সিংহদ্বারের অধিপতিকে ধরিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "সখে, আমার প্রাণকান্ত

শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, তুমি তাঁহাকে শীঘ্র দেখাও, দ্বারাধিপ বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ দেখিবেন, তবে শীঘ্র চলিয়া আসুন" এই বলিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া তিনি উহাকে শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলেন। এই ভাবাক্রান্ত শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন।"

যাহা হউক, মহাপ্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া নয়নপুটে কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য পান করিতেছিলেন, তখন সহসা গোপালবল্লভ ভোগের সময়ের আরত্রিকোচিত শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মহাপ্রভুর তখন একটুকু বাহ্যজ্ঞান হইল। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ প্রসাদ লইয়া প্রভুর নিকট আসিলেন। মহাপ্রভু বিন্দুমাত্র মহাপ্রসাদ জিহ্বায় দিয়া অনুচর গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন "গোবিন্দ, এই মহাপ্রসাদ আঁচলে বাঁধিয়া বাসায় লইয়া যাও।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইল—সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গম হইল, নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বহিল। মহাপ্রভু বলিলেন, "প্রাকৃত দ্রব্যে এইরূপ স্বাদ আদৌ অসম্ভব। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে, নহিলে প্রাকৃত দ্রব্যের কি এইরূপ মন-মাতান আস্বাদন সম্ভাবিত হইতে পারে।"

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু প্রেমে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং "সুকৃতিলভ্যফেলালব" "সুকৃতিলভ্যফেলালব" পুনঃ পুনঃ এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ সেবকগণ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন "দয়াময়

আপনি পুনঃ পুনঃ যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি ?" মহাপ্রভু ইহার ব্যাখ্যা করিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

"সুকৃতিলভ্য ফেলালব" বলে বার বার।
ঈশ্বর সেবক পুছে—প্রভু কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণকৃপা, সেই তাহা পায়।
"সুকৃতি শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য॥"

ব্যাখ্যা শুনিয়া জগন্নাথের সেবকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু কিয়ৎক্ষণ পরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের কথাই অনুক্ষণ তাঁহার অন্তরে স্ফুর্তি পাইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন আস্বাদনের উপলক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে এক অভিনব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত অন্ন তাঁহার অধরামৃতের মাধুর্য্যের ব্যঞ্জক। মহাপ্রভুর প্রেমবিভাবিত হৃদয়ে যে কোন পদার্থেই রসের উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইত। সাধারণ পদার্থের স্মরণে, সাধারণ পদার্থের দর্শনে এবং সাধারণ পদার্থের কথায় তাঁহার হৃদয়ে প্রেম-তরঙ্গ বহিয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদান্নের মধ্যে তিনি যে কৃষ্ণাধরামৃতের মাধুর্য্য উপলব্ধ করিবেন,

তাহাতে বিচিত্রতা কি আছে? মহাপ্রভু গোপালভোগপ্রসাদের কণা-মাত্র গ্রহণ করিয়া প্রেমে অধীর হইয়া উঠিলেন। যদিও তিনি বাহ্য কৃত্যাদি সংস্কারবশে করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমে একে-বারে মাতিয়া পড়িল। এমন ঘন ঘন আবেশ হইতে লাগিল, যে সেই আবেশ নিবারণ করিতেও তাঁহার বহুল প্রয়াস পাইতে হইল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। সান্ধ্য আকাশের তারার ন্যায় একে একে ভক্তগণ সমাগত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদকে ঘেরিয়া বসিলেন, কৃষ্ণকথার প্রবাহ বহিল। এই সময়ে মহাপ্রভু প্রসাদ আনার জন্য গোবিন্দ দাসকে ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ দাস মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রসাদ সহ সমুপস্থিত হইলেন। পুরী ও ভারতী-দিগকে কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীপাদস্বরূপ শ্রীল রামানন্দ, ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সকলকেই প্রসাদ দিলেন। প্রসাদের সৌরভ্য ও মাধুর্য্য সকলের নিকটই অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলেই অলৌকিক স্বাদে বিস্মিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণের সমক্ষে প্রসাদের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা তুলিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভু কহে এই সব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গগব্য॥
রসবাস গুড়ত্বক আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সভার অনুভব॥
সেই দ্রব্যের এই স্বাদ-গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥

আস্বাদ দূরে রহু যার গন্ধে মাতে মন।
আপন বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধস্বাদ অন্য বিস্মারণ।
মহামোদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥
অনেক সুকৃতে ইহারা হঞাছে সংপ্রাপ্তি।
সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥

শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থই মহাপ্রভুর এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য-প্রকটন। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের আস্বাদন অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণের পক্ষে সাধারণের ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বিষয়ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানুধ্যানে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত প্রেমিকা গোপীদেরই সম্ভোগ্য। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধরামৃতের আস্বাদন করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষেও যে ইহা দুর্ল্লভ নহে, মহাপ্রভু মহাপ্রসাদের আস্বাদনে ভক্তগণকে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু দেখাইলেন মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহামাদক, কেন না উহা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতে পরিসিক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করিলে অপর রাগ থাকে না। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীল রামরায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ইহার প্রমাণ দিলেন যথা :—

সুরত-বর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

শ্রীল রামরায়ের শ্লোক-পাঠ-পরিসমাপ্তি হইলে, মহাপ্রভু শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাসূচক একটী শ্লোকে অধরামৃতের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার সেই শ্লোক বা তদ্ভাবাক্রান্ত একটী শ্লোক তদ্-রচিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্যথা :—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥

অর্থাৎ যাঁহার অধরামৃত ব্রজের অতুল কুলাঙ্গনাগণের অন্য তৃষ্ণা হরণ করে, যাঁহার ভক্ষ্যপেয়াদির ভুক্ত পীতাবশেষ ভাগ্যবান্ জন-গণের লভ্য, যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল, সুধার আস্বাদনকেও ধিক্কার করে, সখি সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হইল। অশ্রু-বিন্দুতে নয়নপ্রান্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, রোমাঞ্চে শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইল। মহাপ্রভু কিয়ৎক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন, ক্ষণকাল পরে প্রাগুক্ত শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম শ্রীল কবি-

রাজ গোস্বামী শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শুনিয়া নিম্নলিখিত পদে প্রকাশ করিয়াছেন।

তনু মন বাড়ে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ শোকাদি ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর! শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরূপ সব পাসরায়॥
অচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর।
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা,
গোপীগণে জানায় নিজপান।
অহো শুন গোপীগণ! বলে পিয়ো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান॥

অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভোক্তা ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণফেলা॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায়॥

মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভোর হইয়া অভিমানভরে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অচেতন বেণুকে সচেতন করিয়া তাহাকে অধররস পানের অধিকার দিলেন, অথচ যাঁহারা তাঁহার অধর-রসের নিমিত্ত নিরন্তর আকুল, সেই ব্রজ গোপীদিগকে সে রসে বঞ্চিত করিলেন। এই বলিয়া ক্রোধভাব প্রকাশ করিতে করিতে সহসা এই ভাবের প্রশমন হইল, এবং উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হইল। তিনি ভাবপরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি নির্লজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে।
যোগ্যজন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥

তাহে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেখায় কৃষ্ণ কৃষ্ণাধরামৃতফল ॥

প্রভু এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে করিতে শ্রীল রামরায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "রামরায়, তোমার মুখে এসম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" শ্রীল রামানন্দ প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া শ্রীভাগবতের গোপিকা-বচনের একটী শ্লোক পড়িলেন, তদ্‌যথা :—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং * হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥

ব্রজাঙ্গনারা বলিতেছেন, "সখিগণ, এই নীরস দারুময় বেণু পূর্ব্বজন্মে বা ইহজন্মে কি তপস্যাই বা করিয়াছিল। বেণু উদ্ভিদ ও পুরুষ জাতীয় হইয়াও গোপীদের একমাত্রসম্ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্নান-পান-কালে এই বেণুনাদরূপ উচ্ছিষ্ট পান করিয়া মানসগঙ্গা কালিন্দী প্রভৃতি নদীগণও বিকশিতকমলাদিরূপে রোমাঞ্চিত হয়, তরুগণও যমুনার সেই জলমিশ্রিত মধু মূলদ্বারা পান করিয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতেছে। কুলবৃদ্ধ আর্য্যগণ যেমন আপনাদের বংশে ভগবৎসেবক দেখিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করেন, আজ শ্রীবৃন্দা-বনের বৃক্ষগণও সেইরূপ আনন্দাশ্রু-পাত করিতেছে। কেন না

* "অবশিষ্টরসং" পদের অর্থ-বাহুল্য তোষণী ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হইবে।

বেণু তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পানে কৃতার্থ হইতেছে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃত-কার স্বীয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত পদে উহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্‌যথা ঃ—

এহো ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজ ধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥
গোপীগণ কহ সভে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে।
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা যে কৈল অমৃতসুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এ বেণু অযোগ্য অতি* একে স্থাবর পুরুষ জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান॥

---

* "পুংস্ত্বনির্দ্দেশেন তস্য তদ্ভোগাযোগ্যতা" ইতি তোষণী।

অর্থাৎ পুংস্ত্বনির্দ্দেশ দ্বারা এই অধরসুধাভোগে বেণুর অযোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন ঃ—"অধর-সুধায়াং হি গোপীকানামস্মাক-মেব সত্বং কৃষ্ণস্য গোপজাতিত্বাদিস্মায়প্রাপ্তেঃ। বেণুস্তু বিজাতীয়ঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতীয়, আমরা গোপিকা, তাঁহার অধর-সুধায়, আমাদেরই অধিকার, বিজাতীয় বেণুর তাহাতে অধিকার নাই।

যার ধন না কহে তারে *
পান করে বলাৎকারে, †
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥
মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুর ঝুটাধর রস, হঞা লোভাপরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥
এবে নারী রহ দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী।

---

* তোষিণী টীকায় লিখিত আছে :—তস্য যুষ্মদীয়কান্তস্য করে হৃদয়ে বদনে চ সদা বর্ত্ততাম্ নাম অধর-সুধামপি স্বয়ং যুষ্মৎসম্মতিং বিনৈব ভুঙ্‌ক্তে। অর্থাৎ এই বেণু তোমাদের কান্তের হৃদয়ে ও বদনে সর্ব্বদা থাকে থাকুক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বেণু তোমাদের সম্মতি ব্যতীত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা আস্বাদন করে।

† তত্রাপি ধার্ষ্ট্যেন পুনঃ পৌরুষমাবিষ্কৃত্য সংভুঙ্‌ক্তে, তত্রাপি পরকীয়ং ধনং তত্রাপি স্বয়মেব নত্বস্মঃ জনমেকমপি সঙ্গিনং করোতি। তত্রাপি চৌর্য্যেণ কিন্তু ধনস্বামিনীরস্মান্ ফুৎকারেণ জ্ঞাপয়িত্বা এব,—ইতি শ্রীচক্রবর্ত্তী।

অর্থাৎ বেণুর ধৃষ্টতা দেখ। বেণু পরের ধন বলাৎকারে সম্ভোগ করে, অন্য কাহাকেও সঙ্গী করে না। যে পরের ধন বলাৎকারে সম্ভোগ করে, সে অবশ্যই চোর। কিন্তু এই চোরের আবার ধৃষ্টতা দেখ, বেণুফুৎকার দ্বারা ধনস্বামিনী-দিগকে আহ্বান করিয়া নিজে সেই গোপীভোগ্য অধরামৃত পান করে।

নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকশিত,
মধু মিশি বহে অশ্রুধার ।
বেণুকে মানি নীচ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্রনাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার ।*
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে †
ভত অযোগ্য আমরা যোগ্যা নারী ।
যা না পেয়ে দুঃখে মরি, অযোগ্যে পিয়ে সহিতে নারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে এইরূপ ভাবে বিভোর থাকিতেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ দুই একটী মাত্র উদাহরণের উল্লেখ করিয়া বিরহ-ব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তলীলার আভাস দিয়া রাখিয়াছেন । আলোচিত যোড়শ অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন :—

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপরাম রায় ।

---

* আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ—
ইতি শ্রীধর স্বামী ।

অর্থাৎ কুলবৃদ্ধগণ আপন কুলে বৈষ্ণব দেখিলে যেমন আনন্দিত হন ।

† তৎপুণ্যে জ্ঞাতে বয়মপি তদর্থং যতাম ইতি ভাবঃ ।

অর্থাৎ বেণুর পুণ্য জানিতে পারিলে আমরাও সেইরূপ তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিব—ইতি ভাব ।

কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রিদিন যায়॥

প্রেমিক ভক্তগণ পাঠকগণের পক্ষে অন্ত্যলীলার উন্মাদ প্রলাপের আভাস আস্বাদন-সম্বন্ধে উল্লিখিত উদাহরণ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি পরম কারুণিক গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে আরও বহুতর লীলা-ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বরূপ ও রামানন্দের সেবা।

গম্ভীরায় কি প্রকারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিন যামিনী অতিবাহিত হইত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি অল্প কথায় তাহার পরিস্ফুট প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া উহা আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥
এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধ রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু প্রলাপ করিয়া॥

উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-বিহ্বল মহাপ্রভুর ভাব এবং শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের কার্য্যের আভাস অতি সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। মহাপ্রভু দিনযামিনী দিব্যোন্মাদের চেষ্টায় ও প্রলাপে বিভোর থাকিতেন, শ্রীবৃন্দাবনের মধুময়ী লীলামাধুরী নিরন্তর তাঁহার নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হইত, ক্ষণে ক্ষণে তিনি প্রাণের প্রাণ, নয়নোৎসব শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য সন্দর্শন করিতেন, ক্ষণে ক্ষণে সে রূপরাশি তাঁহার দর্শনাতীত হইত, আর তিনি "হা কৃষ্ণ প্রাণবল্লভ তুমি কোথায়" বলিয়া আকুল প্রাণে আর্ত্তনাদ করিতেন, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতেন, অসহিষ্ণু ভাবে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ঘর্ম্মে পরিপ্লুত হইত, স্বর্ণকান্তি কর্দ্দমে পরিষিক্ত হইত, কেহ ধরিয়া তুলিলে কাঁপিতে কাঁপিতে আবার ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বিবশ হইয়া পড়িত। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, আবার কিঞ্চিৎ চেতনার উদয় হইত, এই চেতনায় বাহ্য বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। তিনি যে পুরীধামে আছেন, শ্রীপাদ স্বরূপ বা শ্রীপাদ রামরায় যে তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে ব্যজন করিতেছেন, অথবা তাঁহার সেবা করিতেছেন এই অবস্থায় তাঁহার এরূপ জ্ঞান থাকিত না। মূর্চ্ছা হইতে চেতনা লাভ করিয়াও তিনি "হা কৃষ্ণ" বলিয়া বিরহ-ব্যাকুলা গোপীদের ভাবে ভাবিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হইতেন।

তাঁহার ভাব বুঝিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের

কিংবা শ্রীবিদ্যাপতির অথবা শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের এক একটি পদ কোমল মধুর স্বরে গাইয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। নিশীথে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় এই গানের কোমল তান তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিত। তিনি ব্যাধের বংশী-নিনাদ-মুগ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সেই গান শুনিয়া কিয়ৎকাল মুগ্ধের মত স্থির ভাবে থাকিতেন, আবার "হা কৃষ্ণ তুমি কোথা গেলে" বলিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শত প্রকার প্রলাপ করিতেন, প্রলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইতেন। তাঁহার প্রিয়তম পার্শ্বচরগণ এই সময়ে প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতেন, তাঁহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যখন ক্ষণকাল একটুকু চেতনা লাভের চিহ্ন প্রকাশ করিতেন, তখন হয় ত শ্রীল রামরায় মহাশয় তাঁহার ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিতেন, শ্লোকটী রায় মহাশয়ের কণ্ঠ হইতে নিঃশেষিত হইতে না হইতেই মহাপ্রভু তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতেন, ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রলাপের মধুময় বাক্যলহরী প্রবাহিত হইত, প্রলাপ করিতে করিতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, ভক্তগণ বহুযত্নে আবার তাঁহাকে সচেতন করিতেন।

এই সময়ে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রামরায় কেবল গানে ও কৃষ্ণকথায় তাঁহার চিত্ত সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না; তাঁহার শ্রীঅঙ্গেরও বহুল সেবা ইঁহাদিগকে করিতে হইত। কেহ ঘাম মুছাইতেন, কেহ কর্দ্দম মুছাইতেন, কেহ বা বাতাস করিতেন আবার কেহবা কোনও সময়ে আপন কোলে তাঁহার চরণ-যুগল

রাখিয়া কেবল কৃষ্ণনাম করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের লীলা-কুঞ্জে বিরহ-দশায় বিষাদিনী শ্রীমতী রাধিকার পার্শ্বে ললিতা বিশাখা এবং নীলাচলে কাশীমিশ্রালয়ের গম্ভীরায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের পার্শ্বে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীপাদ রায় রামানন্দ—এই দুই চিত্রই এক ভাবময়—এই উভয় চিত্রেই একই প্রকার মহাভাবের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ চিত্রকর চিত্রফলকে তুলিকায় আঁকিয়া ইহার লেশাভাসও প্রকাশ করিতে পারে না। সাধারণ লেখনীর লিপিকুশলতায় এই ভাবের কোটী অংশের এক অংশও অভিব্যক্ত হইবার নহে। পাঠকগণ কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-কৃপাতেই এই চিত্রের আস্থ লেখা স্বীয় হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন। সাধকের যাহা চরমলক্ষ্য, মানব-আত্মার যাহা শেষ আকাঙ্ক্ষা—এই মহাচিত্রে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর নিকট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ সম্বন্ধে এক অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল মহাপ্রভু-বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, তিনি কেবল কৃষ্ণ-কথা আলাপনে ও কৃষ্ণরূপ-অনুমানে দিন যামিনী যাপন করিতেন। দিবাভাগ নানারূপে চলিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রিকালে প্রভুর বিরহ-ব্যাকুল চিত্ত সিন্ধুর উচ্ছ্বাসের ন্যায় উছলিয়া উঠিত। এই সময়ে শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনার উপায় করিতেন।

এই সময়ে এক এক দিবসের ঘটনা অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক। এক দিবস সন্ধ্যার পর হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কথার তরঙ্গ বহিয়া চলিল, শ্রীপাদ স্বরূপ মধ্যে মধ্যে সুমধুর কোমল স্বরে জয়দেব বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের পদ গাহিয়া প্রভুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, নানা লীলা, নানা লীলা-প্রসঙ্গে নানা ভাবে এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি চলিয়া গেল। মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় শয়ন করাইয়া শ্রীপাদ রাম রায় আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, শ্রীপাদ স্বরূপ স্বীয় শয়ন-কক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন। গোবিন্দ দাস গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন বটে কিন্তু মহাপ্রভুর উচ্চ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে তাঁহার নিদ্রা হইল না। মহাপ্রভুর নেত্রে নিদ্রা নাই, বিরহ ব্যাকুলতায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ-গান কীর্ত্তন করিতে করিতে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে গোবিন্দের নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হইল না, মহাপ্রভুর উচ্চ কীর্ত্তন গোবিন্দের কর্ণযুগল অধিকার করিয়া বসিল।

অদ্ভুত ঘটনা।

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীরা একেবারে নীরব হইয়া পড়িল, এই নিস্তব্ধতায় গোবিন্দের হৃদয়ে কি-জানি কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, গোবিন্দ ভালরূপে কাণ পাতিয়া রহিলেন, গম্ভীরায় প্রভু বিদ্যমান আছেন কি না গোবিন্দের মনে সন্দেহ হইল। গোবিন্দ উঠিলেন, আলোক জ্বালিলেন, গম্ভীরার দ্বারে আলোক লইয়া গিয়া দেখিলেন গম্ভীরায় প্রভু নাই; গোবিন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি "হা গৌরাঙ্গ

হা গৌরাঙ্গ” বলিতে বলিতে শ্রীপাদ স্বরূপের শয়ন মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি ও অন্যান্য ভক্তগণ দেউটী জ্বালিয়া প্রথমতঃ ত্রিকোষ্ঠসমন্বিত কাশী মিশ্রালয়ের অন্তস্তম প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এই প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না। এই প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে যাইতে হইলে একটা দ্বার না খুলিলে বাহির হইবার উপায় নাই। সেই দ্বারদেশে যাইয়া ইঁহারা দেখিলেন দ্বার যেমন রুদ্ধ করা হইয়াছিল, তেমনই আছে। সকলে বিস্মিত হইলেন, দ্বার খুলিয়া অপর প্রকোষ্ঠে অনুসন্ধান করিলেন, সেখানেও প্রভুকে পাওয়া গেল না। ভক্ত মণ্ডলীর হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইঁহারা এই প্রকোষ্ঠের দ্বারও যথারীতি সংরুদ্ধ দেখিতে পাইলেন। বিস্ময় ও বিহ্বলতায় এ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ইঁহারা বহিঃপ্রকোষ্ঠে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এখানেও তাঁহাকে পাইলেন না অথচ সদর দরজা যেরূপভাবে সংরুদ্ধ ছিল সেই ভাবেই সংরুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সদর দরজা খুলিয়া ভক্তগণ চারিদিকে প্রভুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। আলোক লইয়া একদল ভক্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিলেন। সিংহদ্বারের পার্শ্বে যাইয়া ইঁহারা দেখিতে পাইলেন কতকগুলি গাভী একত্র হইয়া সতৃষ্ণভাবে যেন কি একটী পদার্থের আঘ্রাণ লইতেছে। ইঁহারা যে অলৌকিক অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহারা মহাপ্রভুর শ্রীমুখকান্তি দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ধন,—ভক্তচকোরগণের চিরবাঞ্ছিত পূর্ণচন্দ্র,—এখানে পড়িয়া ধূলিরাশিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন, আর সুরভিগণ তাঁহারই শ্রীঅঙ্গের সুধাসৌরভে ব্যাকুল হইয়া সেই গন্ধ-আঘ্রাণে বিহ্বল হইতেছে। কিন্তু একি! প্রভুর হস্তপদ কোথায়? সেই আজানুলম্বিত ভুজ, শ্রীঅঙ্গের সেই সুদীর্ঘ অধঃশাখাদ্বয় কোথায়! হস্তপদ যেন কূর্ম্মের ন্যায় উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীঅঙ্গে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখে ফেনোদ্গম হইতেছে আর সেই পদ্মপলাশ নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, প্রভু অচেতন। কিন্তু দেহে অচেতনার ভাব পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার শ্রীমুখ-কান্তিতে আনন্দের জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভক্তগণ গাভীগুলিকে দূর করিয়া মহাপ্রভুকে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুরভিগণ তখন শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, দূর করিলেও শ্রীঅঙ্গগন্ধে ব্যাকুল হইয়া প্রভুর নিকটে আসিতেছে। ইঁহারা মহাপ্রভুকে সচেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেতনা হইল না। তখন রাত্রি প্রভাত হয় নাই। এই অবস্থায় ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া প্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন, এবং তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন শ্রীঅঙ্গের প্রত্যঙ্গাদি আবার পূর্ব্ববৎ সুপ্রকট হইল।

শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় এই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে তদ্‌যথা :—

পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড-ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তর আনন্দে বিহ্বল॥
গাভীসব চৌদিকি শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া হস্তপদ বাহিরাইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥

এই লীলায় দুইটী অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। একটী ঘটনা :—রুদ্ধদ্বার উচ্চ প্রাচীরত্রয় লঙ্ঘন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বহির্গমন, এবং অপরটী,—শ্রীঅঙ্গে হস্তপদাদির সংবরণ,—এই দুইটী ঘটনাই অলৌকিক ও অদ্ভুত। কিন্তু ইহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। শ্রীভগবদ্দেহ অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ, উহা প্রাকৃত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন নহে। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের পক্ষে এ সকল কিছুই অসম্ভব নয়, এমন কি যোগীদেরও এইরূপ বিভূতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই অদ্ভুত। সুতরাং অবিশ্বাসীদের ইহাতে অবিশ্বাস হইতে পারে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের সূচনা-শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

লিখ্যতে শ্রীল গৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের অত্যদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ চেষ্টা যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াই এই অদ্ভুত অলৌকিকী লীলা লিখিত হইল। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্দাস গোস্বামিমহোদয়ের শ্রমুখাৎ শুনিয়া এই বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী নিজের কৃত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্প-বৃক্ষে এই লীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যথা :—

অনুদ্ঘাট্যদ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

"অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিন প্রকোষ্ঠের তিনটী দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া এবং তিনটি অত্যুচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কালিঙ্গিক গভীগণ মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বিরহ-বৈকল্যে যাঁহার তনু সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মের আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রেমত্ত করিয়া তুলিতেছেন।" ইহা সাধুভক্ত শ্রীমদ্দাস রঘুনাথের প্রত্যক্ষ ঘটনা।

ভক্তিহীন জ্ঞানীর চক্ষে উপরি উক্ত আখ্যায়িকাটী অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের প্রেম-মার্জ্জিত নেত্রে ইহার এক বর্ণও অসত্য বা অসম্ভব বোধ হইবে না। কেন না যাঁহাদের অপ্রাকৃত শক্তির জ্ঞান ও সেই শক্তিতে বিশ্বাস নাই,

তাঁহারা এ সংসারে প্রাকৃত শক্তি ও প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না;—কোনরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিলেই স্তম্ভিত হইয়া যান। হয়, তাহার নৈসর্গিক হেতু বা নিয়ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, না হয়, অমূলক,—অস্বাভাবিক,—অসম্ভব ঘটনা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। অহঙ্কার হইতে কেবল একমাত্র আপন জ্ঞানবুদ্ধিরই নির্ভর হয় এবং সেই নির্ভর হেতু অপ্রাকৃত দর্শন পরিস্ফুট হইতে পায় না। শুদ্ধ ভক্তের এরূপ বিড়ম্বনা ঘটে না। তিনি বিশ্বাস করেন, এক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী চিন্ময়ী প্রেমোন্মাদিনী পরাশক্তি প্রতি জড় পরমাণুতে প্রতিক্ষণ প্রেমনৃত্য করিতেছেন, জীব-শক্তি ও জড়া শক্তি (মায়া শক্তি) তাঁহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ; কাহারও স্বতন্ত্রতা নাই। উভয়েই সেই চিন্ময়ীর আজ্ঞাবাহিকা—চিন্ময়ীর যে গতি—এ উভয়েরও সেই গতি। একটী অনন্ত সুন্দর অনন্ত মধুর চিন্ময় পরাৎপর পুরুষের চরণ-সেবা, তাঁহার সুখসাধন ব্যতীত সেই চিন্ময়ীর অন্য গতি নাই। তৎপরিচারিণী জীবশক্তি ও জড়াশক্তিরও ঐ সেবা-কার্য্য-সহায়তা ব্যতীত অন্য গতি নাই। পরম পুরুষ ও পরা-প্রকৃতির এই নিত্য প্রেমলীলায় শুদ্ধ ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস হেতু তিনি ভক্তি-মার্জ্জিত নেত্রে এইরূপ কতশত অদ্ভুত লীলা নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। নিত্যলীলার উপাদান কখন অনিত্য হইতে পারে না। জড়াশক্তি বা মায়াশক্তি কখন চিচ্ছক্তির অনধীন হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ জড়-রাজ্যের নিয়মাধীন নহে, প্রত্যুত তাদৃশ চিচ্ছক্তিই জড় পদার্থের পরিচালিকা ও নিয়ামিকা। চিন্ময়

রাজ্যের নিয়ম স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে সহসা গম্ভীরা হইতে অদৃশ্য হইলেন কেন, তিনি সিংহদ্বারে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন কেন,—তাহার কারণও শ্রী চরিতামৃতে লিখিত আছে, যথা:—

বিবিধ ভাবাবেশ।

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিল পয়াণ॥

চেতনা পাইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজ মুখে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলেন। তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে বলিলেন "স্বরূপ, তুমি আমাকে কোথায় আনিলে? আমি শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, যাইয়া দেখি,—গোষ্ঠমাঝে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাইতেছেন, তাঁহার সঙ্কেত-বেণুর রবে শ্রীমতী আসিয়া দেখা দিলেন, তাঁহাকে লইয়া তিনি কেলিকৌতুক-মানসে কুঞ্জ-গৃহে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারের শিঞ্জিনীরবে আমার চিত্ত আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। আমি বিবশার ন্যায় তাঁহার পাছে পাছে যাইতে লাগিলাম। সহসা অন্যান্য গোপীরা আসিয়া এই আনন্দ-লীলায় যোগদান করিলেন, গোপীগণ সহ তিনি বিহার ও হাস-পরিহাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া আমার কর্ণ উল্লাসে নিমগ্ন হইল। আহা, সেই সুধামধুর উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়া, সেই ভূষণশিঞ্জিনী শুনিয়া কর্ণের যে মহামহোৎসব হইয়াছিল, তোমাদের কোলাহলে সহসা তাহা ফুরাইয়া গেল। তোমরা

জোর করিয়া আমাকে এখানে টানিয়া আনিলে। আমি আর সেই সুধামধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না, সুধানিঃস্যন্দিনী শিঞ্জিনীধ্বনি ও মুরলীরব আর শুনিতে পাইলাম না।"

প্রভু যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীমুখ-কমল নয়নাশ্রুতে পরিষিক্ত হইতে ছিল, স্তম্ভিতকণ্ঠে বাক্য গদ্‌গদ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন গুরুতর শোকাকুলের ন্যায় বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ক্ষণ-কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল, নয়নের তারা ডুবুডুবু হইয়া পড়িল, অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবাবেশে গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "স্বরূপ সেই সুধামধুর ধ্বনি শুনিবার জন্য আমার কর্ণ যেন তৃষ্ণায় আকুল হইতেছে, তুমি আমার এই তৃষিত কর্ণের রসায়ন স্বরূপ একটী শ্লোক বল,—শুনি!"

শ্রীপাদ স্বরূপ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন :—

কা স্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

(শ্রীভাগবত ১০।২৯।৪০)

শ্রীপাদ স্বরূপের কণ্ঠ স্বভবতঃই অতি মধুর। তিনি ভাবরসে বিবশ হইয়া অতি মধুর স্বরে শ্রীভাগবতীয় এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া নীরব হইলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ নীরব হইলেন বটে, কিন্তু ইহাতে ভাবনিধি মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবের শত শত তর

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আবার আত্মহারা হইলেন, গোপী-ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাসে প্রবিষ্ট হইলেন, কৃষ্ণের উপহাসময় উপেক্ষা বাক্য শুনিয়া গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, মহাপ্রভু তদ্ভাবভাবিত হইলেন এবং রোষভরে বলিতে লাগিলেন ঃ—

নাগর, কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যানারী,
তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয়॥
কয় রবে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন।
উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্য পথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়াও বেণুদ্বারে, হানি কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও।
এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগ দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস, নারীর হয় সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী॥
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে,
অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্জিত।

তিন অমৃত হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমন নারী ধরিবেক চিত। *

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন করিয়া সরোষে বলিতে লাগিলেন, নাগর তুমি আমাদিগকে পাতিব্রাত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছ; জিজ্ঞাসা করি এই ত্রিজগতে যত যত পতিব্রতা আছেন, তোমার বেণুধ্বনি শুনিয়া কাহার চিত্ত আকৃষ্ট না হয়? তুমি বেণুধ্বনি করিলে জগতে কোন্ নারী স্থির থাকিতে পারে? তোমার বেণুধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রের যোগিনীস্বরূপিণী দূতীবিশেষ। বংশীধ্বনি দূতীরূপে

* এই ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যার রীতঅনুযায়ী একটুকু পূর্ব্বভাস আছে, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কৃষ্ণের মধুর হাস্তবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন।

অর্থাৎ কৃষ্ণের পরিহাস বাক্য গোপীরা সত্য বলিয়া মনে করিলেন। গোপীভাব-ভাবিত মহাপ্রভুও সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যকেই সত্য বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলেন। অর্থাৎ তিনি যে "ফিরিয়া যাও" বলিয়া আদেশ করিয়াছিলেন এই আদেশে বিচলিত না হইয়া রুষ্ট হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ওলাহন দিয়া উদ্ধৃত শ্রীভাগবতীয় পদ্যের ব্যাখ্যাবাক্যে-উক্ত পদের ভাবানুসারে প্রলাপ করিতে লাগিলেন।

এস্থলে যে রোষের কথাটুকু শ্রীচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীভাগবতের পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিমহোদয় বৃহৎতোষিণী টীকায় লিখিয়াছেন :—"তত্র সদৈন্যরোষমাহঃ।" লঘুতোষিণীতেও এই কথাই লিখিত আছে। তবে শব্দের বিপর্য্যস্ত বিন্যাস করা হইয়াছে মাত্র যথা— "সরোষদৈন্যমাহ।"

নারীদের শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া উঁহাদের চিত্ত আনিয়া তোমার চরণে অর্পণ করে উঁহাদের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া উঁহাদিগকে আর্য্যপথ হইতে বিচ্যুত করে এবং তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া দেয়। তুমি বেণু দ্বারা লোকের ধর্ম্ম নষ্ট কর এবং কটাক্ষশরে উঁহাদের লজ্জা ভয়াদি দূরে অপসারিত কর। তোমার বেণু দ্বারা তুমি নারীধর্ম্মের সর্ব্বনাশ কর, এক্ষণে ধার্ম্মিক হইয়া আমাদিগের নিকট ধর্ম্ম-শিক্ষা-চ্ছলে পতিত্যাগের দোষ-কীর্ত্তন করিতেছ। বল দেখি, ইহাতে আমাদের কি দোষ ? তোমার মনে এক, মুখে আর, আচরণ আবার আরও স্বতন্ত্র। শঠপারিপাট্য বিলক্ষণরূপেই তোমাতে আছে। তোমার পরিহাসে যে রমণীদের সর্ব্বনাশ হয়! এই সকল কুটিনাটি এখন ত্যাগ কর। তোমার বেণুনাদ এক অমৃত, তোমার বচনও অমৃত, আবার তোমার ভূষণ শিঞ্জিনীরব অপর এক অমৃত,। এই তিন অমৃত কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া কর্ণ ও মন প্রাণ হরণ করে। ইহাতে নারীগণের চিত্ত কিরূপে স্থির থাকিবে ?

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যাবলম্বনে প্রলাপ করার পরে মহাপ্রভু কিয়ংক্ষণ ভাবাবেশে নীরব রহিলেন। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া উৎকণ্ঠাসূচক একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে এই স্থানে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা :—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণহারিসচ্ছিঞ্জিতঃ

সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।*

* সনর্ম্মসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ—ইহাতে জানা যাইতেছে যে প্রাকৃত

রমাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন, "সখি! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি জলদগম্ভীর, যাঁহার ভূষণশিঞ্জন শ্রুতিহর, যাঁহার বাক্য পরিহাসময় ও মধুর ভঙ্গীময়, এবং যাঁহার মুরলীরব রমাদি বরাঙ্গনাগণের হৃদয়হারি, সেই মদনমোহন আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।" শ্রীচরিতামৃতের পদ্যে এই শ্লোকের যে তাৎপর্য্যময় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা এই :—

১। নবঘন ধ্বনি জিনি, কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি,
যার গানে কোকিল লাজায়।
তার এক শ্রুতকণে, ডুবায়ে জগতের কাণে,
পুনকাণ বাহুড়িয়া না যায়॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণরস শব্দ গুণে, হরিল আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥

লোকের "বচনে" রস প্রকাশ পায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বচনের অক্ষরগুলিও রসসূচক। সেই অক্ষরগুলিগ্রথিত পদের অর্থকৌশলময়ী উক্তিও অমৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। টীকাকার এই স্থলের আরও দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা :—যথা রসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য। যদ্বা সর্ব্বরসসূচকাক্ষরপদার্থানাং ভঙ্গী ভঙ্গবান্ লহরীমান্ অর্থাৎসর্ব্বরসসমূহঃ তদ্রূপোক্তির্যস্য সঃ।

২। নুপুর কিঙ্কিণি-ধ্বনি, হংসসারস জিনি,
কঙ্কণ-ধ্বনি চটকে লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥

৩। সেই শ্রীমুখ ভাষিত অমৃত হইতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানারস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্মবিভূষিত॥ *
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥

৪। যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবি বন্ধ পড়ে খসি, বিনা মূল্যে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায়॥

---

* মূল শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যে "পদার্থ" পদটী আছে উহার সন্ধিবিচ্ছিন্ন করা হইলে পদ ও অর্থ এই দুইটী শব্দ পাওয়া যায়। পদ ও অর্থের সাহায্যে ভাষাদ্বারা প্রকাশযোগ্য রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভাষার দুইটী শক্তি—একটি শব্দ শক্তি, অপর—উহার অর্থ-শক্তি। অলঙ্কারশাস্ত্রাভিজ্ঞগণ এই নিমিত্ত শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের আলোচনাদ্বারা ভাষার দুই শক্তির সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন।

যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তিঁহো কাকলী শুনি,
কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায় ।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারী,
সেই কর্ণ ইহা করে পান ।
ইহা যেই নাহি শুনে, সেই কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥

কি প্রকারে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে হয়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রেমিক ভক্তগণের নিমিত্ত তাহার উপদেশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাত শ্লোকে ও পদ্য-ব্যাখ্যায় আমরা কর্ণগ্রাহ্য শব্দ-মাধুর্য্যের আস্বাদন-লালসার বিষয় জানিতে পারি। এই ব্যাখ্যায় অতি স্পষ্টভাবে চারি প্রকার শব্দামৃতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

১। কণ্ঠনাদ। ২। শিঞ্জিনী নাদ। ৩। সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তি। ৪। বেণুনাদ।

ইতঃপূর্ব্বের শ্লোকব্যাখ্যায় তিন প্রকার অমৃতের কথা বলা হইয়াছিল যথা :—

১। "বেণুনাদামৃত।" ২। "অমৃত সমান মিঠাবোল।" ৩। "ভূষণ শিঞ্জিত"।

ভাবোৎকর্ষের ক্রমিক বৃদ্ধির সহিত মাধুর্য্য-গ্রহণের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এস্থলে "সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরের পদার্থভঙ্গ্যুক্তি"

নামক আর একটী অমৃতের অনুভূতি স্পষ্টতঃই সূচিত হইয়াছে। এই অমৃত শ্রবণেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য। শ্রীকৃষ্ণের মধুময় ভাবরাজ্যের ইহা এক বিশিষ্ট বৈভব,—একবার এ রস-মাধুর্য্য আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে উত্তরোত্তর নিত্য নব ভাবের অনুভব হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের চরম পরিণতি—শ্রীশ্রীভগবদ্রসাস্বাদনে। পরমমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—সিদ্ধবৈষ্ণবের পক্ষে কেবল অনুমানের বিষয় নহে—আস্বাদনের বিষয়। লীলারসময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় লীলায় এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শব্দমাধুর্য্যরসাস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলাপের ফলে ক্রমশঃই উদ্বেগ বাড়িয়া উঠিল,—কেবল উদ্বেগ নয়, উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুল ভাব যুগপৎ উপস্থিত হইল। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাঁহো নাহি অবলম্বন।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
মনোভাব হইল মিলন॥
ভাবশাবল্যে রাধা উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেইভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
সেই অর্থ না জানে সব লোক॥ *

* উদ্বেগ প্রভৃতির লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

ভাবনিধি মহাপ্রভুর ভাবরাশি সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত এবং নিরন্তর উদ্বেলিত। তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ তাহার বিবিধ ভাব অনুভব করিতেন। প্রাকৃত হৃদয়ের ভাবই ভাষায় প্রকাশ করা

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদোদয় উদীরিতাঃ॥

অর্থাৎ মনের উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, স্তম্ভতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ইষ্টানবাপ্তিঃ প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধির্বিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং।
বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ॥

অর্থাৎ, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে।

শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণং মতিঃ।
অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোদয়োঽপি চ॥

অর্থাৎ, শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি কহে। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদন হেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি উপজাত হয়।

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।
মুখশোষত্বরাচিন্তানিশ্বাসস্থিরতাদিকৃৎ॥

অভীষ্ট বস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা,

যায় না, অপ্রাকৃত ভাব তো একেবারেই প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বোপরের কথা এই যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বভাবতঃই

তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে।

ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্‌ঘোরসত্ত্বোগ্রনিঃস্বনৈঃ।

পার্শ্বস্থালম্বরোমাঞ্চ কম্পস্তম্ভভ্রমাদিকৃৎ॥

অর্থাৎ বিদ্যুৎ বা ভয়ানক প্রাণিগণের প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আলম্বন রোমাঞ্চ, কম্পস্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে।

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

অর্থাৎ ভগবদনুভব ও ভগবৎসম্বন্ধরূপ জ্ঞানদ্বারা দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহার না ধৃতি, ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না।

যা স্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থ প্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।

দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ॥

অর্থাৎ সদৃশ-দর্শন অথবা দৃঢ়াভ্যাসজনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে।

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং।

অর্থাৎ ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য।

উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।

অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থ-চেষ্টিতম্॥

প্রলাপধাবনক্রোশবিপরীতক্রিয়াদয়ঃ॥

ভাবগম্ভীর। সেই অগাধ গম্ভীর ভাব-রাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাকৃত জনের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার ভক্ত-পরম্পরার কতকগুলি বিশিষ্টভাবের লেশাভাস এজগতে প্রকটন করিয়াছেন। ভক্তগণ তাহা পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন।

দিব্যোন্মাদে মহাপ্রভুর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল, সাগর-তরঙ্গের ন্যায় ভাব-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় অনবরত বিক্ষুব্ধ। এই সকল ভাব-তরঙ্গের পরস্পর প্রতিঘাতই "ভাবশাবল্য" নামে অভিহিত। তাঁহার হৃদয়ে কত ভাবের উদয় হইত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত ভাবের উদ্গম ও কত ভাবের লয় হইত, আবার যুগপৎ কত ভাবের শাবল্যে সেই সমুদ্র-প্রশান্ত ও সমুদ্র-গম্ভীর প্রেমময় হৃদয়ে ভাবতরঙ্গের যে সমরলীলা অনুষ্ঠিত হইত, তাহার লেশাভাসের ধারণা করাও আমাদের ন্যায় জীবের পক্ষে অসম্ভব। এই অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে ভাবাবেশে এক একটী শ্লোক পাঠ করিতেন এবং উহার ব্যাখ্যা করিতেন, পরম কারুণিক পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের যে একটী শ্লোক বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে যথা :—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ

অর্থাৎ অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত হৃদ্‌ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে

মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।

প্রথমতঃ আবেগোদয়ে শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি, আমি কি করিব, কি করিয়া তাহার দর্শন পাইব? এই বলিয়া তাঁহাদের মুখপানে তাকাইলেন, দেখিলেন সখীরা সকলেই অতি ব্যগ্র, ইহাতে তাঁহার চিন্তার উদয় হইল, তখন বলিলেন, "তবে আমার এই যাতনার কথা আর কাহাকেই বা বলি, ইহারাও তো, দেখিতেছি আমারই মত আকুল হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থায় আমার পক্ষে কি উপায় অলম্বনীয়, তাহা অপর কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? এই কথা বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কথা স্মরণে "মতি আখ্যা" ভাবোদ্গম হইল। তখন তিনি মনে করিলেন, এমন শঠের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ভাল করি নাই, "আশাহি পরমং দুঃখম্" পিঙ্গলা বলিয়াছিল আশাই দুঃখের কারণ, নৈরাশ্যই পরম সুখ। সেই শঠের আশায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আর "আশা করিব না" ইহা বলিতে বলিতে ঈর্ষার উদয় হইল, তখন বলিলেন "তবে আর সেই অকৃতজ্ঞের কথা লইয়া কালক্ষেপ করিব কেন? অপর কোন সৎপ্রসঙ্গ করাই ভাল।"

এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে হৃদয় যেন কামশরে বিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন হাতে বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন "সখি তাহার কথা হৃদয়ে আর স্থান দিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু হায় এখন আমার হৃদয় যে কামশরে বিদ্ধ হইয়া গেল, এখন প্রাণ যায়, কি করি?" পরক্ষণেই আশ্চর্য্যান্বিত

হইয়া বলিলেন, "যাহার কথা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এই যে সে আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। এখন কি করি, কৃষ্ণকথা ত্যাগ করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু নয়নোৎসবস্বরূপ, সাক্ষাৎমন্মথমদনস্বরূপ, সুমধুর কৃষ্ণের জন্য আমার উৎকণ্ঠাময়ী অতিদীনা তৃষ্ণা অনুক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।"

এই শ্লোকে ভাবশাবল্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উল্লিখিত গদ্য ব্যাখ্যাটী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যাবলম্বনে লিখিত। শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তদ্‌যথা :—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছো, কে কহে উপায়॥
হা হা সখি! কি করি উপায়?
কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়॥ ॥
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাবমতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।

ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,

যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ।

কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফুর্ত্তি,

সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।

যাহে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে,

কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥

রাধা ভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,

কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।

কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,

এই বৈরি না দেয় পাশরিতে॥

ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে, জিতি অন্য ভাবসৈন্যে,

উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে।

মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,

দুঃখে মনে করে ভর্ৎসনে॥

মন মোর বাম দীন, জল বিনু যেন মীন,

কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে মরি যায়।

মধুর হাস্য বদন, মনোনেত্র রসায়ন,

কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায়॥

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,

হা হা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর।

হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বরধর,

হা হা রাসবিলাস নাগর॥

কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল লৈয়া॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীত গোবিন্দের গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥

অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

এই মত মহাপ্রভুর প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ় প্রেমের হয় চেষ্টা-জ্ঞান॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য॥

সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ধন॥

আমাদেরও প্রার্থনা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণের শরণ গ্রহণ করিয়া প্রেমধন লাভ করুন। প্রেমের অভাবে জগতের অমঙ্গল, প্রেমই সর্ব্বমঙ্গলের নিদান। শ্রীগৌরাঙ্গচরণ হইতেই সেই প্রেম-মন্দাকিনীর উদ্ভব।

সমুদ্রে পতন ও মূর্চ্ছা।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহব্যাকুল মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ নানা প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। পরম কারুণিক গ্রন্থকার কোথাও উদাহরণ দ্বারা ভাববিশেষ প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, কোথাও বা তাঁহার প্রলাপের মর্ম্ম কাব্যময় শব্দে বিবৃত করিয়াছেন, কোথাও বা আবার কেবল ইঙ্গিতে এই মহিয়সী লীলার আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন:—

দ্বাদশ বৎসরে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন॥

ভাবের চিত্র ভাষায় আঁকিয়া তোলা অসম্ভব। প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত ভাবই ভাষায় ফোটে না, সাধারণ মানুষের হৃদয়জাত প্রেমের ভাবটুকু প্রকাশ করার জন্যই ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই আমাদের মনে হয়, প্রেমের ভাষা—কেবল অশ্রুজল, আনন্দে অশ্রু, নিরানন্দেও অশ্রু;—সম্ভোগে অশ্রু, বিরহেও অশ্রু। একবিন্দু

প্রেমাশ্রুতে প্রেমের বিশাল বিপুলকাহিনী সংযতভাবে নিহিত থাকে। ভাবুকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে সেই বিশাল ভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সেই সাঙ্কেতিক নীরব ভাষা অপরের দুরধিগম্য। সাধারণ লোকের সাধারণ প্রেম সম্বন্ধেই এই কথা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম সেই প্রেমের একমাত্র উৎস। শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রেম—মানব ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তাই শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

> প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
> চাঁদ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥
> বায়ু যৈছে সিন্ধু জলের হরে এক কণ।
> কৃষ্ণ-প্রেম-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন॥
> ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত।
> জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত॥

মানুষের ভাষায় এপর্য্যন্ত যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যময় এমন প্রকৃত সত্য অতি অল্পই মানুষের সমাজে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রেমের বিকার প্রকৃতই অবর্ণনীয়। শ্রীল কবিরাজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার মানস নেত্র-সমক্ষে প্রেমের এক উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগর;—সে সাগর অসীম, অনন্ত, দুস্পার ও অতল-স্পর্শ। তিনি বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অবশ হইয়া পড়িলেন, তিনি বুঝিলেন যে কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা মানুষের ভাষার অতীত, মানুষের ধারণারও অতীত। তাই তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় চরম সত্য প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—

ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত॥

শ্রীল কবিরাজ মানস-নেত্রে প্রেমসিন্ধু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহার তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, লিখিতে লিখিতে তাঁহার লেখনীর গতি প্রথমে ধীর মন্থর এবং অবশেষে স্তম্ভিত ও স্থগিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি স্বকীয় অসমর্থতা বুঝিতে পারিয়া লিখিলেন :—

জীব-ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত।

তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় তাঁহার এই উৎকট প্রয়াস অতীব নিষ্ফল। বায়ু যেমন অসীম অনন্ত সিন্ধু-জলের কণামাত্র গ্রহণ করে, তদতিরিক্ত ধারণ করিতে আর সমর্থ হয় না এবং তাহাতেই তাঁহার তাপ দূরীভূত হয়, নিজে সুশীতল হয় এবং জীবদিগকে শীতল করে; জীবও সেই প্রকার বহু ভাগ্যফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সাগরের কণামাত্র স্পর্শ করিতে পারিলেই কৃতার্থ ও বিবশ হইয়া পড়ে। যাহা ধারণায় আনা অসম্ভব, কে কখন তাহা বর্ণনা করিয়া অপরকে বুঝাইতে পারে? সমুদ্র-গম্ভীর ও সমুদ্র-বিশাল এই শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদের মহাভাবের কণা মাত্র পরিগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু তথাপি পরম কারুণিক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় এই অপার গম্ভীর লীলারসামৃতসমুদ্রের নাম শ্রবণ করিতেছি এবং শুকের পঠনের ন্যায়, তাঁহার লিখিত কথা পাঠ করিয়া আত্মশোধন করিতেছি। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন :—

জীব ইঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপন শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥

লীলা-বর্ণন করার সৌভাগ্য আমার নাই, কেবল শুকের পঠনের ন্যায় শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনা পাঠ করিয়াই কৃতার্থ হইতেছি। শ্রীচরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে যে অদ্ভুত মহীয়সী লীলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই এক্ষণে দুই একটী কথা স্মরণ করিয়া আত্মশোধনে প্রবৃত্ত হইব।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রায়শঃই শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের রাসলীলার শ্লোকের রসাস্বাদ করিতেন। শ্রীচরিতামৃতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

এই মতে মহাপ্রভু নীলাচলে বইসে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥
শরৎ কালের রাত্রি শরৎ চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি-সকল॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে॥

এই মত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সভার অর্থ করে কভু পায় হর্ষ-শোক ॥

গোপীভাবে নিমগ্ন মহাপ্রভুর হৃদয়ে রাসরসের উচ্ছ্বাস সততই স্বাভাবিক। শরৎকাল, শারদচন্দ্রের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল চন্দ্রিকায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কাননে কাননে জ্যোৎস্নাশুভ্র কুসুমকুল প্রস্ফুটিত হইয়া জ্যোৎস্ন-শোভা অধিকতর বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিল, রাসকেলিকুঞ্জের মধুর স্মৃতি মহাপ্রভুর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া আত্মহারা হইয়া রাসলীলার শ্লোক-পাঠ, গোপীদের লীলানুকরণ এবং রাস-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জলকেলির একটী শ্লোক তাঁহার মনে উদিত হইল, তিনি পড়িতে লাগিলেন :—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তোগজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ।

(ভা ১০।৩৩।২২)

শ্রান্ত গজেন্দ্র যেমন মত্ত মাতঙ্গিনীদের সহিত জলপ্রবাহে প্রমত্ত হয়, গোপিকাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণও যমুনার জলে সেইরূপ জলকেলিতে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের এই ভাব মহাপ্রভুর মনে ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। তিনি সমুদ্র-ধারের একটী কুসুম-কাননে উপস্থিত হইলেন। অদূরে নীলসিন্ধুর তরঙ্গ-লহরীতে শারদ-

চন্দ্রকিরণসম্পাতে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। মহাপ্রভু একবার সেদিকে তাকাইলেন, দেখিবামাত্রই তাঁহার দেহ যেন অবশ হইতে লাগিল। আত্মহারা মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান যেটুকু ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। তিনি সিন্ধুর শ্যামজলে নীল যমুনার প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিলেন, যমুনার শ্যামজলে শ্যামসুন্দরের অনুপম জল-কেলি-লীলার স্ফূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনি মন্ত্রচালিতের ন্যায় বিবশ ভাবে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইলেন, নীলসিন্ধু মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীযমুনায় পরিণত হইলেন, উহার তরঙ্গাদি জলকেলিলীলাবিহারের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। মহাপ্রভু শ্রীযমুনাজ্ঞানে অনন্ত সিন্ধুর উত্তালতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, রত্নাকর আজ এক অদ্বিতীয় অমূল্য রত্ন আপন বক্ষে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এই বিবরণ শ্রীচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে যথা :—

> পড়িতেই হৈলা মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
> কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
> তরঙ্গ বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাঠ।
> কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
> কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়া যায়।
> কভু ডুবাঞা রাখে আর কভু বা ভাসায়॥

বাহ্যজ্ঞানহারা মহাপ্রভু আপন ভাবের রসাস্বাদে নিমগ্ন।

তিনি যমুনার জলে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি-লীলা সন্দর্শন সুখে বিভোর হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। "প্রভু কোথায় গেলেন" বলিয়া চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, ভক্তগণ চারিদিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কেহ বা জগন্নাথ মন্দিরে, কেহ বা অপরাপর দেবালয়ে, কেহ বা উদ্যানে, কেহ বা গুণ্ডিচা-মন্দিরে, কেহ বা নরেন্দ্রে, কেহ বা চটক পর্ব্বতের দিকে কেহ বা পুরীধাম হইতে পূর্ব্বদিকে কোণার্কের অভিমুখে যাইয়া মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে রাত্রির প্রায় অবসান হইয়া আসিল। কিন্তু কোথাও প্রভুকে পাওয়া গেল না। ভক্তগণের হৃদয় একবারে দমিয়া গেল; তাঁহারা মনে করিলেন তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর বুঝি এবার একবারেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, আর বুঝি তাঁহারা আর তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন-সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন না। এই চিন্তায় সকলেই অধীর হইয়া পড়িলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট-আশঙ্কা বিনু মনে নাহি আন॥

এই সময় ভক্তগণের চিত্তে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাঁহারা কিরূপ ব্যাকুল ভাবে মহাপ্রভুর অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সহজেই হৃদয়ে সে ধারণা করা যাইতে পারে। ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে সমবেত হইলেন, একদল লোক চিরাইয়া

পর্ব্বতের দিক গমন করিলেন। স্বরূপ প্রভৃতি পূর্ব্ব দিকে যাইয়া প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলে। যথা শ্রীচরিতামৃতে :---

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরাইয়া পর্ব্বত দিকে কথোজনে গেলা॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কথোজন।
সিন্ধুতীরে-নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ॥

এইরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীপাদ স্বরূপ সম্মুখে সহসা এক মৎসজীবীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার স্কন্ধদেশে জাল, সে কখন হাসিতেছে, কখন বা কাঁদিতেছে আবার কখন বা হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। উহার এই ভাব দেখিয়া স্বরূপ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে, এই পথে কোন লোককে যাইতে দেখিয়াছ, আর তোমারই বা এ ভাব কেন?"

মৎসজীবী বলিল "এই পথে আমি কাহাকেও যাইতে দেখি নাই, আমি সমুদ্রে জাল বাহিতে ছিলাম, সহসা আমার জাল ভার বোধ হইল, মনে করিলাম জালে একটা বড় মাছ পড়িয়াছে, উঠাইয়া দেখিলাম যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা নহে, একটী মৃত মনুষ্য! দেখিয়াই ভয় হইল। জাল খুলিতে তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শ হইল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমার দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে, বাক্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছে, শরীর রোমাঞ্চ হইতেছে। সেই মৃতের শরীর পাঁচ সাত হাত দীঘল, এক এক হাত তিন তিন হাত করিয়া দীর্ঘ, হাত পায়ের অস্থিসন্ধি সমূহ খসিয়া গিয়াছে, দেখিলে প্রাণ চমকিয়া উঠে। উহার চক্ষু দুইটীর

তারা উপরে উঠিয়াছে। কখনও গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, কখন বা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে। এই শবদেহ-স্পর্শে আমি ভূত-গ্রস্ত হইয়াছি। এক্ষণে ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রতি রাত্রিতে এখানে মৎস্য ধরি, আর নৃসিংহ স্মরণ করিয়া থাকি, ইহাতে আমায় ভূতে ছুঁইতে পারে না। কিন্তু নৃসিংহ নামে এ ভূতের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠে। সাবধান, তোমরা ওদিকে যাইও না।"

শ্রীপাদ স্বরূপের দেহে প্রাণ আসিল। তিনি বুঝিলেন সাক্ষাৎ মহাপ্রভুই মৎসজীবীকে কৃপা করিয়াছেন। স্বরূপ বলিলেন "আমি ওঝা, কিরূপে ভূত ছাড়াইতে হয় আমি তাহা জানি, তোমার কোনও ভয় নাই।" এই বলিয়া স্বরূপ আপন মনে দুই একটী কথা বলিয়া উহার মাথায় কর-স্পর্শ করিলেন এবং উহার দেহে তিন বার চাপড় মারিয়া বলিলেন "আর তোমার ভয়ের কারণ নাই, ভূত পালাইয়া গিয়াছে। একে মহাপ্রভুর স্পর্শে প্রেমে ধীবর অধীর হইয়াছিল, তাহার উপরে আবার ভূতের ভয়! সুতরাং উহার মনোবিকারের প্রবলতা কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীপাদ স্বরূপের প্রক্রিয়ায় উহার ভয় তিরোহিত হইল। ধীবর কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইল। স্বরূপ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যাঁহাকে জালে পাইয়াছ, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রেমাবেশে সমুদ্রে পতিত হইয়াই তিনি তোমার জালে আবদ্ধ হইয়াছেন। যাঁহাকে যোগীন্দ্রগণও আবদ্ধ করিতে পারেন না, তিনি তোমার জালে আবদ্ধ হইয়াছেন ইহা তোমার মহাভাগ্য। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ

স্পর্শেই তোমার এই প্রেমের উদয় হইয়াছে, ভয়ের কোন কারণ নাই, তিনি কোথায়, আমাকে একবার দেখাও।”

কিন্তু মৎস্যজীবীর ইহাতে বিশ্বাস হইল না। সে বলিল “আমি কতবার প্রভুকে দেখিয়াছি, প্রভু কেমন সুন্দর, তাঁহাকে দেখিলে চক্ষু আর কিছু দেখিতে চায় না। কিন্তু এ এক ভয়ঙ্কর বিকৃত আকার। হাত পায়ের জোড়া ছাড়িয়া গিয়াছে, দেখিলে ভয় হয়।” স্বরূপ বলিলেন, “প্রেমের বিকারে এইরূপ হয়—তিনি বাস্তবিকই তোমার সেই নয়ন-ভুলানো প্রাণের ঠাকুর।” ধীবর আশ্বস্ত হইল, সকলকে লইয়া গিয়া মহাপ্রভুকে দেখাইয়া দিল। ইহারা প্রভুকে যে অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীচরিতামৃতে তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে যথা :—

> ভূমে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়।
> জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
> অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
> দূর পথ, উঠাঞা ঘরে আনন না যায়॥

প্রভুর এই অবস্থার শ্রীমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভক্তগণ নয়নজল সংবরণ করিতে পারেন না, যাহা হউক মহাপ্রভুকে ইহারা ধরিয়া তুলিলেন, তখনও তিনি অচেতন, ভিজা কৌপীন ত্যাগ করাইয়া শুষ্ক কৌপীন পড়াইলেন। বালুকা ঝাড়িয়া বহির্বানে শোয়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সচেতন করার এক মাত্র মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন। ইহারা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ পরে প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণ-নাম

প্রবেশ করিল। তিনি হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া বসিলেন, আর তৎ-ক্ষণাৎ শিথিল সন্ধিসমূহ পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগিল। ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দস্রোত বহিয়া চলিল। কিন্তু তখনও তাঁহার পূর্ণ বাহ্যাবস্থা হইল না। প্রভু অৰ্দ্ধ বাহ্যদশায় ইতঃস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তিন দশায় সময় অতি-বাহিত করিতেন,—অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্য দশা ও বাহ্যদশা। অন্তর্দ্দশায় এক বারেই মূর্চ্ছাভাব,—ইহাতে বাহ্যজ্ঞানের লেশ-মাত্রও থাকিত না, তিনি এই অবস্থায় পূর্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলারসাস্বাদন করি-তেন, অৰ্দ্ধ বাহ্যে অন্তর্দশার কিছু ঘোর থাকিয়া যাইত, কিছু বাহ্য-জ্ঞানও প্রকাশ পাইত। এসম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :—

অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আকাশে কহেন, সব শুনে ভক্তগণে॥

এই অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রভু আপন মনে প্রলাপ বলিতেন, ভক্তগণ যে তাহার সমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার এ জ্ঞান অতি অল্প থাকিত। এই অবস্থায় তিনি শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দরায়কে সখী বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। উপরি উক্ত ঘটনার পরে অর্দ্ধবাহ্য-দশায় মহাপ্রভু তাঁহার প্রত্যক্ষের বিবরণ বলিতে লাগিলেন :—

কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি।
যমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে মধুময়ী লীলাদৃশ্য দর্শনে বিমুগ্ধ ছিলেন, এই ছত্র কয়টীতে তাহার সংক্ষিপ্ত লেশাভাস প্রকাশ পাইয়াছে।

মহাপ্রভু মূর্চ্ছাবস্থায় শ্রীযমুনায় যে অত্যদ্ভুত জলকেলি-লীলা-দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় শ্রীচরিতামৃতে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন
জলকেলি রচিল সুঠাম॥

* * *

সহস্রকর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপীদেখে,
সহস্র পাদ নিকটে গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে॥

* * *

যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন।

নীলাব্জ হেমাব্জ ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুক দেখে তীরে সখীগণ ॥
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জলে হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের করে নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দোহার রণ ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়।
ইহা দুহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাক লুঠে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ-অলঙ্কার ॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার পরকাশ,
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ জুড়াইল ॥

* * *

হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সে সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥*

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু চেতন হইলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইল, তিনি শ্রীপাদ স্বরূপকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "স্বরূপ তোমরা আমায় এখানে আনিলে কেন ?" শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, "তাত বটেই, তুমি আমাদের হাতের পুতুল কিনা ? তোমার রঙ্গে যে আমাদের প্রাণান্ত হয়, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখ না। যমুনাভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িয়া তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, এই ধীবর জালে করিয়া তোমায় উঠাইয়া

* এইরূপ অদ্ভুত জল-কেলির বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও প্রকটিত হয় নাই। "সহস্র করে জলসেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে, সহস্র পদে নিকটে গমন" ইহা বৈদিক মন্ত্রেরই মূর্ত্তিবিশেষ। ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে এই লীলাময় পুরুষের যে আভাস আছে, এখানে তাহার পূর্ণ মধুর লীলা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই জলকেলির পরেই বস্ত্রহরণ। বস্ত্রহরণের রহস্য অতি নিগূঢ়। অনেকে ইহার অনেক প্রগাঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চক্রবাক্, হেমাব্জ ও নীলাব্জের ইন্দ্রজাল-লীলা প্রেমিকভক্তগণেরই আস্বাদ্য। বিরোধাভাস ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারের লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে দ্রষ্টব্য। প্রেমিক পাঠকগণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দৃষ্ট এই অত্যদ্ভুত জলকেলি লীলার রসাস্বাদ সম্ভোগ করুন। অভক্তগণের ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই।

তোমার স্পর্শে প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিল। আমরা গত রাত্রিতে তোমায় দেখিতে না পাইয়া সকলে সারানিশি তোমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছি। ভাগ্যে ধীবরের মুখে তোমার সংবাদ পাইয়াছিলাম। তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে ক্রীড়া দেখ, আর তোমার মূর্চ্ছা দেখিয়া আমরা সকলেই অস্থির হইয়া পড়ি। যাহা হউক, কৃষ্ণনাম করিতে করিতে তোমার অর্দ্ধ বাহ্য হইল, সেই অবস্থায় এতক্ষণ তুমি প্রলাপ করিতেছিল।"

ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "স্বপ্নে দেখিলাম, শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ গোপীগণ-সঙ্গে রাস করিতেছেন। অতঃপরে জলক্রীড়া করিয়া বন্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, আমার মনে হয় আমি বুঝি সেই স্বপ্নের প্রলাপ করিতেছিলাম।" স্বরূপ বলিলেন, "তুমি যা কর তাই ভাল। এখন উঠ।" এই বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া ঘরের ধনকে ঘরে আনিলেন, ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সারানিশি জাগিয়া যে হারাণ ধনের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। সকলে প্রেমানন্দে প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই লীলাটীর আস্বাদ অত্যদ্ভুত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই লীলার আভাস দিয়া আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটী আশীর্ব্বাদময় মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, যথা :—

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোহস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।

নিমগ্নো মুর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥

অর্থাৎ যিনি শরৎজোৎস্নাপুলকিত সিন্ধু-দর্শনে যমুনাভ্রমে হরি-বিরহতাপার্ণবের ন্যায় বিশাল সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং সেই সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সারানিশি সমুদ্র জলে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিলেন, প্রভাতে যিনি স্বগণ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচী-সুত আমাদের রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন, কিন্তু যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত, তখন মহাভাগবতের ন্যায় তাঁহার হৃদয় ভক্তিভাবে পরিপ্লুত থাকিত, এই সময়ে অনুচর সহচর প্রভৃতি কে কোথায় কি ভাবে আছেন, তিনি তাঁহাদের সংবাদ লইতেন, স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর কথা তাঁহার মনে পড়িত। তিনি প্রতিবৎসরই মায়ের খবর লইতেন। মায়ের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। বৃদ্ধা জননী তাঁহার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন, রন্ধনশালায় যাইয়া রন্ধন করিতে বসিয়া কেবল তাঁহারই কথা ভাবিতেছেন, দুইটী বাস্তুশাক দেখিয়া মনে করিতেছেন "আমার নিমাই এই বাস্তুশাক কত ভালবাসে, আমি এই শাক রাঁধিতেছি, হায় আমার নিমাই কোথায়, স্নেহময়ী মা আমার এইরূপ ভাবিয়াই বা কত অশ্রুপাত করিতেছেন।" শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধা স্নেহময়ী জননীর এই সকল ভাবের কথা স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে মায়ের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেন। প্রেমিক হৃদয়ের ইহাই স্বভাব। জননীকে

মাতৃভক্তি।

প্রবোধ দিবার জন্য মাতৃভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতি বৎসর অতিপ্রিয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে বঙ্গদেশে পাঠাইতেন, পণ্ডিত জগদানন্দ বৃদ্ধা শ্রীশ্রীমাতার নিকট আসিয়া নিমাইর প্রাণের কথা বলিতেন,— নিমাই যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল থাকেন, নিমাই যে সতত তাঁহাকে স্মরণ করেন, শ্রীশ্রীশচীমাতার চরণে পণ্ডিত জগদানন্দ তাহা নিবেদন করিতেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভুর অত্যন্তপ্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥

পণ্ডিত জগদানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ কত প্রাণের কথা বলিয়া দিতেন, সে সকল কথা মনে করিলেও অশ্রু সংবরণ করা যায় না। পণ্ডিত জগদানন্দ নবদ্বীপে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, মহাপ্রভু মায়ের জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনাইয়া নিজ হাতে উহা বাঁধিয়া দিতেছেন, আর জগদানন্দকে বলিতেছেন, "আমার দুঃখিনী মাকে মহাপ্রসাদ দিয়া আমার প্রণাম জানাইও, আমার হইয়া তুমি তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া আমার মাকে প্রণাম করিও এবং বলিও, 'মা আমার মনে করিলেই আমি তাঁহার শ্রীচরণের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বন্দনা করি, যখন তিনি রন্ধন করিয়া আমার কথা মনে করেন, আমি তৎক্ষণাৎ যাইয়া তাঁহার প্রস্তুত অন্নাদি আহার করি'। মাকে আরও বলিও যে তোমার নিমাই বলিয়া দিয়াছে, 'মাতার সেবা করাই আমার পরম ধর্ম, কিন্তু বাতুল হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ

করিয়াছি, তাঁহার সেবা না করায় আমার যে অপরাধ হইতেছে, দয়াময়ী জননী যেন আমার এই অপরাধ ক্ষমা করেন, আমি চিরদিনই তাঁহার আজ্ঞাকারী সন্তান। তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞাতেই আমি এই নীলাচলে পড়িয়া রহিয়াছি, এজীবনে তাঁহার শ্রীচরণ ভুলিতে পারিব না।' জগদানন্দ, বিশেষ করিয়া আমার মায়ের চরণে আমার এই কথাগুলি বলিও।"

এই কথা বলিতে বলিতে মাতৃভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ মায়ের জন্য নিজ হাতে মহাপ্রসাদগুলি বাঁধিয়া দিলেন, মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার কমলনেত্রে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, একটী একটী করিয়া অশ্রু বিন্দু গড়াইয়া গড়াইয়া পাণ্ডু গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া তুলিল। অতি কষ্টে সে বেগ সংবরণ করিয়া জগদানন্দকে বিদায় দিলেন। এই বিবরণ অতীব মধুময়ী ভাষায় শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে, যথা—

নদীয়া চলহ, মাতারে কহিও নমস্কার।
মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিও মাতারে, "তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার॥

নীলাচলে আমি আছি তোমার অজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিবে ছাড়িতে॥"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর হৃদয়ে মাতৃভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, এই কয়েক ছত্র পাঠে তাহার সমুজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত উন্মাদিকা ভক্তির এইরূপ মাখামাখির সমুজ্জ্বল উদাহরণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি সংসাররূপিণী ক্ষুদ্রতটিনী হল পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের অনন্তসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, দিনরজনী তাহাতেই যিনি বিভোর ছিলেন, এখন বাহ্যজ্ঞানের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দুঃখিনী জননীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি মায়ের জন্য মহাপ্রসাদ বাঁধিতে বসিলেন, এবং নয়ন-জলে নেত্র ভাসাইয়া মায়ের শ্রীচরণে বলিবার জন্য পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট কত কথা বলিয়া দিলেন। তাই অনন্তভাবগ্রাহী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদের বন্দনা শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

বন্দে তং কৃষ্ণ-চৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং
প্রলপ্য মুখ সঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাসঃ স॥

অর্থাৎ যিনি প্রেমোন্মাদে ভিত্তিতে মুখ-সঙ্ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং মধূদ্যানে প্রলাপ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্তশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের বন্দনা করি। শ্রীল কবিরাজ পয়ারেও লিখিয়াছেন —

মাতৃভক্তের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥

ভক্তমাত্রেরই প্রভুর এই লীলাটী নিরন্তর অনুকরণযোগ্য। মাতৃ-

ভক্তি কৃষ্ণভক্তির সাধন-স্বরূপ। প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপিণী স্নেহময়ী জননীর কথা স্মরণ করিলেও মাতৃভক্ত সন্তানের হৃদয়ে ভক্তির বন্যা প্রবাহ উপস্থিত হয়।

নদীয়ায় জগদানন্দ

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় যথাসময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। শচীমার হাতে মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার প্রাণের নিমাই ভক্তিভরে যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, জগদানন্দ ধীরে ধীরে একে একে সেই সকল কথা শচীমার নিকট কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলেন। স্নেহময়ী জননীর নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল পরিসিক্ত করিয়া চলিল, তাঁহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল জগদানন্দের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। জগদানন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"মা স্থির হউন, আপনার অঞ্চলের নিধি স্নেহের নিমাইর কোন দুঃখ নাই। তিনি দিনরজনী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকেন, আমরা সকলেই প্রাণপণে তাঁহার সেবা করি। যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে, তখন তিনি যত কথা বলেন, তাহার মধ্যে আপনার কথাই বেশী। এমন মাতৃভক্তি,—মায়ের প্রতি এরূপ অনুরক্তি আর কোথাও দেখি নাই। মা বলিলেই তাঁহার ঢলঢল নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠে, বাক্য গদ্‌গদ হইয়া পড়ে, মাতৃহারা শিশুর ন্যায় আপনারে নিমাই মা মা বলিয়া অধীর হন।"

স্নেহময়ী জননী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা জগদানন্দ নীরব

হও, ও সকল কথা আর আমার নিকট বলিও না। আমি,—অভাগিনী ; তাই পুত্রহারা হইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছি। আমার নয়নের মণি তোমাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছি, তোমরাই তাহাকে দেখিও।" এই বলিয়া শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর প্রদত্ত প্রসাদাদি খুলিলেন, উহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া গৃহাভ্যন্তরে বধূমাতার নিকটে গেলেন, দেখিতে পাইলেন বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের কোণে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। মেঘে ঢাকা চাঁদের মত তাঁহার মুখমণ্ডলে রুক্ষ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, নয়ন জলে বদনমণ্ডল কেশগুলিসহ পরিসিক্ত হইয়া গিয়াছে। শচীমাতা বধূমাতার অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে কান্দিয়া উঠিলেন, তাঁহার রোদন শুনিয়া প্রতিবেশী ঠাকুরাণীরা উপস্থিত হইলেন, বধূমাতাকে সচেতন করিলেন, শচীমাতাকে শান্ত করিলেন এবং পণ্ডিত জগদানন্দের আহারের ব্যবস্থা করিলেন।

পণ্ডিত জগদানন্দের আগমনে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সকলেই জগদানন্দের নিকট মহাপ্রভুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীর অশ্রুজলের বিরাম নাই। তিনি এই অবস্থাতেই সকলের হাতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। ধীরে ধীরে জনতা অপসারিত হইল। জগদানন্দ একমাস কাল শচীমাতার নিকট থাকিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে মহাপ্রভুর সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপরে তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য পণ্ডিত জগদানন্দকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন, মহাপ্রভুসম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-

লেন। জগদানন্দ আচার্য্যের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নিবিষ্টভাবে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; অপরাপর ভক্তগণ একমনে জগদানন্দের সুধামাখা কথা শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য এই সময়ে জগদানন্দকে তরজা-প্রহেলিকার ভাষায় ঠারেঠোরে একটী নিগূঢ় কথা বলিয়া দিলেন, যথা—

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও, লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও, কাজে না আছে আউল।
বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল॥ *

---

* শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য সাধারণ লোকের নিকট নিগূঢ় সংবাদ অপ্রকাশ রাখিবার নিমিত্তই প্রহেলিকার ভাষায় এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সাধারণ লোকে ইহার অর্থ না বুঝিতে পারে, ইহাই যখন আচার্য্যপ্রভুর অভিপ্রায় ছিল, তখন আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে এই প্রহেলিকার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও ধৃষ্টতা মাত্র। সুপণ্ডিত সুযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যেরূপ ইহার অর্থ বুঝিবেন, অপরকেও তাঁহারা সেইরূপ বুঝাইবেন। তবে এই প্রহেলিকার অর্থ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় শ্রীমুখে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন, যথাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে। এস্থলে আমরা কেবল "বাউল' ও 'আউল" এই দুইটী শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছি। "বাউল" শব্দটী বাতুল শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দুস্থানী ভাষায় এই

আচার্য্যপ্রভুর প্রহেলিকা শুনিয়া পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ একটুক হাসিয়া বলিলেন "একি প্রহেলিকা! আচ্ছা, আমি ঠিক এই কথাই মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া বলিব।"

পণ্ডিত জগদানন্দ যথাসময়ে নীলাচলে পঁহুছিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট শ্রীশচীমাতার সংবাদ দিলেন, নদীয়াবাসীদের ও শান্তিপুরবাসীদের সংবাদ দিয়া শ্রীমদাচার্য্যের প্রহেলিকাটী অবিকলভাবে বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা তাহাই হইবে" এই বলিয়া নীরব হইলেন। শ্রীপাদস্বরূপ এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। যখন পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীমদাচার্য্যের প্রহেলিকা বলেন, স্বরূপ তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ

নীলাচলে জগদানন্দ

শব্দটী "বাঅলো" "বাওল" বাওলী ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়। বাতুলে, বাউরা, বাউলা ইত্যাদি রূপেও অশিক্ষিত ইতর লোকেরা পশ্চিমাঞ্চলে এই শব্দটির ব্যবহার করিয়া থাকে। বাউল শব্দের অর্থ বাতুল। ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত ব্যক্তিগণের উন্মাদ লক্ষণ দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে "বাউল" নামে অভিহিত করিত। শ্রীচরিতামৃতে বহুস্থানে 'বাউল' শব্দের এইরূপ ব্যবহার আছে, যথা—"দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি" "আমিত বাউল এক কহিতে আন কহি, কৃষ্ণের তরঙ্গে আমি সদা যাই বহি।" আউল শব্দটী আব্বল শব্দের অপভ্রংশ। শব্দাপভ্রংশের নিয়মানুসারে আব্বল শব্দটীই আউল শব্দে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই আউল শব্দের অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজে নাহিক "আউল" অর্থাৎ কাজে কেহ উত্তম নহে। এই কাম কোন্ প্রকার কাজ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাও বুঝিয়া দেখিবেন। কোন্ প্রকারের বাউলের কার্য্যে কোন্ প্রকারের ক্ষতি হয় তাহাও বিবেচ্য। "হাটে না বিকায় চাউল" এই হাট ও চাউল কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও বিবেচ্য।

করিতেছিলেন। মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, শ্রীপাদস্বরূপ তাহাও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন, প্রহেলিকার মর্ম্ম বুঝিয়া তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন, "আচার্য্যপ্রভু একি হেঁয়ালী বলিয়া পাঠাইয়াছেন! আমিতো ইহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না"। শ্রীপাদ স্বরূপের কথায় মহাপ্রভু এই তরজার একটুকু আভাস দিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে—

প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কথোকাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ কিবা তার মন।
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তর্জ্জার অর্থ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, আচার্য্য প্রভুর তর্জ্জার যে অর্থের আভাস দিলেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে, যে আচার্য্যপ্রভু তাঁহাকে উপাসনার নিমিত্ত এবং প্রেমভক্তি বিস্তারের নিমিত্ত আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হওয়ায় এখন উপাস্য দেবতাকে "গচ্ছ গচ্ছ পরমং স্থানম্" বলিয়া বিদায় দেওয়ার জন্যই যেন এই প্রহেলিকাময় সংবাদ দিয়াছিলেন।

ইহাতে মনে হয়, মহাপ্রভুর অবতারের পূর্ব্বে লোকসকল অন্তক্ষণ বিষয়-সুখে মগ্ন থাকিত, বিবেক-বৈরাগ্যের লেশাভাসও তাহারা

হৃদয়ে উদিত হইত না, প্রেমভক্তি ত অতি দূরের কথা। শ্রীমদ্-আচার্য্য প্রভু জীবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীভগবানের অবতারের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। যোগেশ্বর আচার্য্য প্রভুর আরাধনায় স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনে বিলাসের স্থানে বৈরাগ্য ও নাস্তিকতার স্থানে ভগবদ্ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিত হইল, অবশেষে প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়" এমন অবস্থা দাঁড়াইল। লক্ষপতির সন্তান শ্রীরঘুনাথ দাস কৌপিন পড়িয়া পথের ভিখারী হইলেন। সংসারের দিকে অনেকেরই আকর্ষণ রহিল না। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যেও লোকের আর তেমন যত্ন রহিল না। আচার্য্য প্রভুর নিকট এ দৃশ্যও অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে মহীয়সী শক্তির মহাপ্রভাবে এই বিশাল বন্যা প্রবাহে সমগ্রদেশ ভগবৎপ্রেমে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, শ্রীমদ্আচার্য্যের নিকট তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইল, উহার সংযম ও সংবরণ প্রার্থনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল।

তাই মহাপ্রভু বলিলেন, "আচার্য্য পূজক। তিনি উপাসনায় জন্য আবাহন করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাসনার উদ্দেশ্য শেষ হইয়াছে, এখন দেবতা বিসর্জ্জন দিতেছেন। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার তর্জ্জার মর্ম্ম, অথবা ইহাই কিনা, তাহাই বা কি করিয়া বলিব ? আচার্য্য প্রভু মহাযোগেশ্বর। কিরূপে তর্জ্জা করিতে হয়, তিনিই তাহা জানেন। তাঁহার প্রহেলিকার অর্থ অপরের দুর্ব্বোধ্য।" শ্রীপাদস্বরূপ মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া বিমনা হইলেন। ভক্তগণের সুনীল হৃদয়াকাশে সহসা এক কাল মেঘ দেখা দিল, সকলেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

এই দিন হইতে মহাপ্রভুর ভাবরাজ্যে সহসা এক বিশাল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি ইহজগতে অবস্থান করিয়াও যেন জগৎছাড়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের দারুণ দশা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। দিনযামিনী কেবলই উন্মাদাবস্থা,—কেবলই প্রলাপ। মহাপ্রভুর এই দশা দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অতি অল্পক্ষণই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত, তাহাও পূর্ণ জ্ঞান নহে—অর্দ্ধবাহ্য দশা মাত্র। একটা কথার উত্তর দিতে না দিতেই তিনি আবার বিভোর হইয়া কৃষ্ণময় রাজ্যের মহাস্বপ্নে প্রমত্ত হইতেন,—কৃষ্ণবিরহের সেই আকুলতা, সেই হাহাকার, সেই মূর্চ্ছা মহাপ্রভুর এই মহাভাবতরঙ্গে ভক্তগণ একবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। এক মুহূর্ত্তও তাঁহাকে একাকী রাখিয়া কেহ কোন স্থানে সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। এই দশা লিখিয়া প্রকাশ করার বিষয় নহে, গম্ভীরার মহাগম্ভীর ভাব মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। আকারে, ইঙ্গিতে, স্বরে, ভাব-ভঙ্গীর গভীরতায় যাহা প্রকাশ পায়, ব্যঞ্জনা-শক্তিতে যাহা অভিব্যক্ত হয়, বিশেষতঃ জড়াতীত মহারসময় মহাভাবের যে প্রবাহ, মহাপ্রেমিকের হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাষায় বা আকারে ইঙ্গিতে ঈষদ্ ব্যক্ত হয়, সেই সকল ভাবের আভাস দর্শক বা শ্রোতৃবর্গ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারেন, উহা অপরে সম্পূর্ণ অবোধ্য।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের তরজা-প্রহেলিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহোন্মাদ অধিকতর প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতার অপর যে এক গভীরতর ভাবের উদ্গম

হইত, তাহা উদ্‌ঘূর্ণা দশা নামে অভিহিত। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা (*) হৈল উন্মাদ-লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।
স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজ সখীজন॥

(*) উদ্‌ঘূর্ণা দিব্যোন্মাদেরই অন্তর্ভাব। ইহার লক্ষণ এইরূপ :—

"স্যাদ্‌বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্"

নানাপ্রকার বিচিত্র লক্ষণপূর্ণ বৈবশ্য-চেষ্টাই উদ্‌ঘূর্ণা নামে অভিহিত। উদ্‌ঘূর্ণার উদাহরণ এইরূপ—

শয্যা কুঞ্জগৃহে কচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা
নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিত্তর্জ্জতি।
আঘূর্ণত্যভিসারসংভ্রমবতী ধ্বান্তে কচিদ্দারুণে
রাধা তে বিরহোদ্গমপ্রমথিতা ধত্তেন কাং বা দশাম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীমতী রাধার কথা জিজ্ঞাসা করায় উদ্ধব বলিলেন "হৃদয় শ্রীমতী তোমার বিরহে ভ্রান্তিবশতঃ বাসকশয্যার ন্যায় কুঞ্জগৃহ সজ্জিত করেন, কখন খণ্ডিতাভাবে রুষ্ট হইয়া নীল মেঘকে তর্জ্জন করেন, কখন বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করেন, শ্রীরাধাপ্রেমের গতি অতি বিচিত্র। তোমার বিরহে উঁহার কোন্ দশাই বা না হইতেছে।"

শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দ রায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কিরূপ সেবা করিতেন, ইহা হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপে গৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবে বিভোর হইয়া একবারে বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শ্রীপাদ রামানন্দকে সম্মুখে পাইয়া বিশাখা মনে করিয়া তাঁহার গলে হাত দিয়া তিনি মর্ম্মভেদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিতেছেন :—

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্মম সুহৃত্তম ক বত হন্ত হা ধিগ্ বিধিম্। *

সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়, শিখণ্ডভূষণ মন্দ্রমুরলীরব শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি আমার সেই শ্যামসুন্দর কোথায়, সেই রসতাণ্ডবী কোথায়, সখি আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি কোথায়; হায় হায়, আমার সেই সুহৃত্তম কোথায়? হাহা, এতাদৃশ প্রিয়তমের সহিত যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধিকে ধিক্!

---

* এটি ললিতমাধবের ৩ অঙ্কের ২৫ শ্লোক। শ্রীল রূপগোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উদ্‌ঘূর্ণা লক্ষণ ও উহার উদাহরণ লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন—

মথুরানগরং কৃষ্ণে লব্ধে ললিতমাধবে।
উদ্‌ঘূর্ণেয়ং তৃতীয়াঙ্কে রাধায়াঃ স্ফুটমীরিতঃ॥

অর্থাৎ ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পরে শ্রীমতীর উদ্‌ঘূর্ণা দশা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—

ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগৎ উজোর।
যার কান্ত্যামৃত পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে
ব্রজজনের নয়ন-চকোর॥
সখি হে! কোথাও কৃষ্ণ করাও দরশন।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত কুমুদিনী,
নিজকরামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি! রাখ মোর প্রাণ॥
কাঁহা সেই চূড়ার ঠাম, শিখি পুচ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তমালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥
একবার যার নয়ন লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পৈশে যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায়।

শৃঙ্গাররস ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না ছানি,
জানি বিধি নিরমিল তার ॥
কাঁহা সে মুরলী-ধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ।
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃতধার ॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি! মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
তিঁহো করে এত বিড়ম্বনা।
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।
বিধিকে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণ দেয় ওলাহন্,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক।

সেই শ্লোকটী এই :—

অহো বিধাত স্তব ন কচিদ্দয়া,
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং,
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৩ ॥

ভা ১০।৩২।১২।

অর্থাৎ গোপীরা বলিতেছেন, হে বিধাত! তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই। তুমি কিনা জীবদিগকে মৈত্রী ও প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া

তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত কর। তোমার এই চেষ্টা বালকের ন্যায় অসঙ্গত। শ্রীচরিতামৃতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাপদ আছে।

না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইএ়, তবে তোরে শিক্ষা দিএ়
এমন যেন না করিস বিধান ॥
অরে বিধি! তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্যদুর্লভ জন, প্রেমে করিয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর ॥
অরে বিধি! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলি আমার;
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্যস্থান,
পাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥
অক্রূর করে তোমার দোষ, আমায় কেনে কর রোষ
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণে নিলি চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥
আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইল নিঠুর ॥

সব তেজি ভজি যারে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥"
এই মত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়,
"হা হা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি?".
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলপয়ে,
"গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥" *

মহাপ্রভুর এইরূপ বিশাল ব্যাকুলতায়,—এইরূপ চিন্তোন্মাদক অলৌকিক ব্যাপারের সময়, শ্রীপাদস্বরূপ ও শ্রীরামরায় তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সান্ত্বনা ও পরিচর্য্যা করিতেন।

হৃদ্‌বিদারক ব্যাপার

শ্রীচরিতামৃতকার লিখিতেছেন:—

তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।

* ইতঃপূর্ব্বে শ্রীভাগবতের "অহো বিধাতঃ" শ্লোকের এবং ইহার ব্যাখ্যার পদ্যটীর আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না।

গাইয়া সঙ্গম-গীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥

মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু প্রলাপের সে ঝঙ্কার থামিল না, বিরহের সেই বিপুল তাপ মিলন-সঙ্গীতেও নিভিল না। মহাপ্রভু এক একবার এক প্রকার ভাবে আগ্নেয় গিরির ন্যায় হৃদয়ের বিরহানলের দাহকরী শিখা প্রলাপের ভাষায় বহির্ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হইল, দণ্ডের পর দণ্ড এইরূপ ভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বরূপ ও রামরায় ভাবের সবিশেষ বাহ্য প্রাবল্য না দেখিয়া মনে করিলেন, প্রভুর হৃদয়ের তরঙ্গ বুঝি প্রশমিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এখন আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই, এইরূপ মনে করিয়া শ্রীপাদস্বরূপ মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় শয়ন করাইলেন, রামানন্দ ও স্বরূপ আরও কিয়ংক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভু নীরব,—এ যে কিরূপ নীরবতা,—তাঁহারা সে বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিলেন না। বিশেষতঃ ভাবগম্ভীর মহাপ্রভুর ভাব-রহস্য অনুসন্ধান বুদ্ধির অতীত। স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভুকে বিশ্রামাগারে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শ্রীপাদ রামানন্দ আপনার ভবনে উপস্থিত হইলেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। ইঁহাদিগের তখন একটু নিদ্রাবেশ হইল।

এই সময়ে গম্ভীরার মধ্যে আবার এক হৃদ্‌বিদারক ব্যাপার উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু কিঞ্চিৎকাল শয়ন করিয়াছিলেন। সে শয়ন আদৌ শয়ন নহে, বিরহের তীব্রতায় এক প্রকার মূর্চ্ছা মাত্র। এই

ভাব অপনোদিত হওয়া মাত্রই মহাপ্রভু উঠিয়া বসিলেন এবং আপন মনে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আবার বিরহ-ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, তিনি ভাবাবেশে জ্ঞানহারা ও অধীর হইয়া গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁহার নাকে মুখে ও গণ্ডে বহুল ক্ষত দেখা দিল, উহা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবাবেশে বিহ্বল মহাপ্রভু গোঁ গোঁ শব্দে এই হৃদ্‌বিদারক ব্যাপারে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া স্বরূপ তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিয়া গম্ভীরায় যাইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, আলো জ্বালিয়া দেখিলেন, মহাপ্রভুর নাক, মুখ ও গণ্ড হইতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া রক্তধারা পড়িতেছে। এ দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। উভয়ে জল সেচন করিয়া অনেক যত্নে প্রভুকে সুস্থির করিলেন।

প্রভু সুস্থির হইলেন পরে স্বরূপ বলিলেন, "বল তো তোমার একি লীলা! তোমাকে রাখিয়া একটুকু চক্ষু বুজিতে গিয়া কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি!"

প্রভু বলিলেন, "কি করিব, চিত্তের উদ্বেগে কিছুতেই আর ঘরে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত দ্বার খুঁজিতে ছিলাম। দ্বার ঠিক করিতে পারি নাই, চারিদিকে দ্বার অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও দ্বার পাই নাই, কেবল ভিত্তিতে মুখ লাগিয়া লাগিয়া নাকে মুখে ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে ছিল, তাই বাহির হইতে পারি নাই ইহার বেশী আর কিছুই বলিতে পারি না। স্বরূপ, আমার প্রাণধন

কৃষ্ণ কোথায়? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এখন আমার উপায় কি, বল? আমি কি করি—কোথায় যাই। *

এই দিন হইতে শ্রীপাদ স্বরূপের হৃদয়ে একটা অতি গুরুতর ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি মনে করিলেন, এই প্রেমোন্মত্ত প্রাণের ধনকে এখন আর একাকী গম্ভীরার ভিতরে রাখা নিরাপদ্ নহে। তিনি ভক্তগণের নিকট মনের ভাবনা প্রকাশ করিলেন, সকলেই বলিলেন এই বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত।

শঙ্কর পণ্ডিত বলিলেন "যদি আপনাদের কৃপানুমতি হয় তবে আমার একটী প্রার্থনা আছে। আপনারা দয়া করিয়া এই দীনের প্রতি ঐ মহান্ অনুগ্রহ করুন—এ অধম প্রভুর শ্রীচরণতলে শ্রীচরণ-সেবার জন্য সারা রজনী পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত। আপনারা কৃপাময় বৈষ্ণব, দয়া করিয়া এই দীনকে এই অধিকার দান করুন।"

প্রহরী-নিয়োগ

---

* শ্রীমদ্দাস গোস্বামী তৎকৃত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষ স্তোত্রে এই লীলাটির সূত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন তদ্‌যথা :—

স্বকীয়স্য প্রাণার্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥

অর্থাৎ স্বকীয় কোটিকোটিপ্রাণতুল্য শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিকল হইয়া প্রলাপ-উন্মাদে ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ করিয়া ক্ষত-রক্তে যাঁহার শ্রীমুখমণ্ডল শোণিতাক্ত হইয়াছিল, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রমত্ত করিতেছেন।

শঙ্কর পণ্ডিত ভক্তশিরোমণি ও অতি সুধীর। সকলেই এই প্রস্তাব মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। ভক্তগণের অনুরোধই প্রবল হইল। এই দিন হইতে শঙ্কর পণ্ডিতের মহাভাগ্যের উদয় হইল। এই দিন হইতে তিনি মহাপ্রভুর পদতলে উপাধানের ন্যায় শয়ন করিতেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করেন পাদ-প্রসারণ॥
"প্রভু-পাদোপাধান' বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥ *

শ্রীমৎ শঙ্কর পণ্ডিত যে ভাবে প্রভুর পদসেবা করিতেন, সে দৃশ্য অতি আহ্লাদজনক। শঙ্কর শ্রীগৌরাঙ্গের পদপ্রা: প্ত ৰ'- ঽ শ্রীপদসম্বাহন করিতেছেন, আর এই অবস্থায়,—থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার একটু নিদ্রার আবেশ হইতেছে। শঙ্কর তখন ঝুমিয়া পড়িতেছেন, তাঁহার হস্তদ্বয় প্রভুর পদসেবার কার্য্যে বিরত না হইলেও মাথাটী নিদ্রার আবেশে ঠিক থাকিতেছে না, এক একবার ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তিনি আবার তৎক্ষণাৎ চমকিয়া মাথা তুলিয়া

* শ্রীভাগবতে লিখিত আছে : —

ইতিব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ ৩।১৩৫॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ক্রোড়ে পাদপ্রসারণ করিতেন, সেই বিদুর বিনীত হইয়া ঐ রূপ কহিলেন, মৈত্রেয় মুনি আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ইত্যাদি। এই লীলায় শঙ্কর পণ্ডিতই,—বিদুর।

শ্রীপদসেবা করিতেছেন। এইরূপে শঙ্কর পণ্ডিত দেহপ্রকৃতির সঙ্গে কিয়ংক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পরাস্ত হইলেন, তাঁহার দেহ বিকল হইয়া পড়িল, প্রভুর পাদপদ্ম তাঁহার ক্রোড়ে রহিল, শঙ্করের দেহ ধীরে ধীরে শয্যায় গলিয়া পড়িল। প্রভুর নিদ্রা নাই, তাঁহার কেবল,—শ্রীকৃষ্ণভাবনা। কিন্তু বাহ্য জ্ঞানের লোপ হয় নাই, প্রভু বুঝিলেন, শঙ্কর ঘুমাইয়াছেন, তিনি আপন কাঁথাখানি শঙ্করের গায়ে জড়াইয়া দিলেন। শঙ্করের গাত্রে কাঁথা স্পর্শ হওয়া মাত্রই তিনি চমকিয়া আবার উঠিয়া বসিলেন, এবং অপরাধীর ন্যায় প্রভুর কাঁথাখানি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে জড়াইয়া দিয়া আবার পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন †। মহাপ্রভু বলিলেন—"শঙ্কর তুমি সারারাত্রি এরূপ করিলে আমার দুঃখ ভিন্ন সুখ হয় না। আমি তোমার এত ক্লেশ সহিতে পারি না।" শঙ্কর বলিলেন, "করুণাময়, আপনার চরণ-সেবার ন্যায় সুখ আমার আর কি আছে? দুষ্টা নিদ্রা আমার পরম শত্রু। যোগীরা বিগতনিদ্র হইয়া দিনরজনী যে পাদপদ্মের ধ্যান করেন, সেই শ্রীপাদপদ্ম আমার এই চর্ম্মচক্ষুর সমক্ষে বিরাজমান, আমি

---

† শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন॥
উঘার অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পাদ চাপি করেন রাত্রি জাগরণ॥

শ্রীচৈঃ অন্ত্য ১৯ পরিচ্ছেদ।

আমার চর্ম্মমাংসের প্রাকৃত হস্তে সেই অপ্রাকৃত ধনের সেবা করায় অধিকার পাইয়াছি। প্রভো! ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সুখ আছে!" প্রভু নিরুত্তর হইলেন।

শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রলাপাদির সূচনা লিখিত হইয়াছে। সেই সকল অতীব ভাবগম্ভীর। এখানে তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

তীব্র বিরহ ও অলৌকিক অবস্থা।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ *

---

* এই শ্লোকটীর কয়েকটী টীকা আছে, একটী টীকা এইরূপ :—

(ক) "অস্মিন্ পরিচ্ছেদে (অস্যাগ্রন্থস্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) অন্ত্যলীলায়াঃ সূত্রানুবর্ণনে প্রভোঃ গৌরস্য কৃষ্ণবিরহজন্যপ্রলাপাদিঃ অনুবর্ণ্যতে অর্থাৎ ময়েতি শেষঃ।" এই টীকাকার কে, তাঁহার নাম প্রকাশিত নাই।

("বৈষ্ণবসুখদা" নামে শ্রীচরিতামৃতের অপর একখানি টীকা আছে। বৈষ্ণবসুখদাকার লিখিয়াছেন :—প্রভোর্গৌরস্য অন্ত্যলীলায়াঃ শেষখণ্ডস্য যা লীলা যৎসূত্রং দিগ্‌দর্শনরূপং ন তু সম্যক্ তস্য অনুবর্ণনং যত্র ; এবম্ভূতে অস্মিন্ বিচ্ছেদে প্রভোঃ কৃষ্ণস্যেতিশ্লিষ্ট একস্যানেকার্থত্বাৎ। যদ্বা প্রভোরিত্যস্য পূর্বার্দ্ধেনান্বয়ঃ গৌরস্যেত্যস্য পরার্দ্ধেন। এই টীকাটীর বিশেষ অর্থ এইরূপ :—

সূত্র—অর্থাৎ দিগ্‌দর্শন রূপমাত্র ; সেই লীলার সম্যক্ বর্ণন নহে। অনুবর্ণনমাত্র—এখানে ঈষদর্থে "অনু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রভোঃ—কৃষ্ণস্য। "একের অনেক অর্থ হইতে পারে," এই ন্যায় অনুসারে প্রভু শব্দটী "কৃষ্ণ" অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে অর্থাৎ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে। আবার

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাসূত্রবর্ণনাত্মক এই পরিচ্ছেদে (বিচ্ছেদ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিচ্ছেদ জন্য) প্রলাপাদির অনুবর্ণন করা যাইতেছে।

অন্ত্যলীলার আভাস এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভেই সূচিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

পরার্দ্ধের সহিত অন্বয় করিয়া গৌরের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন।

এইস্থলে অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণনা করা হইল কেন, তাহার কারণও এই পরিচ্ছেদের শেষেই স্বয়ং গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন তদ্‌যথাঃ—

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃ-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখি এ নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্র মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রো নাহি নিদ্রালব।
ভিত্তো মুখ শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারের কবাট—প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে—কভু সিন্ধুনীরে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে অন্ত্যলীলার সূত্রানুবর্ণন কেন করিয়াছেন, তাহার কারণ ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা গেল। অন্ত্য-লীলার প্রলাপ বর্ণন ভক্তগণের প্রাণধন। পরমকারুণিক শ্রীল কবিরাজ মনে করিতে ছিলেন, জীবন অনিত্য, তাঁহাতে তিনি জরাতুর কখন কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। কি জানি যদি গ্রন্থসমাপনের পূর্ব্বেই তাহার জীবন-লীলা শেষ হয়; তাহা হইলে তো তিনি এই সুধা-মধুর লীলার আভাস ভক্তগণকে প্রদান করিয়া যাইতে পারিবেন না;—এই আশঙ্কায় পূর্ব্বে তিনি ইহা সূত্ররূপে সূচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তসুহৃদ্ বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ নিজের লীলামাধুরী সম্পূর্ণ করিয়া লিখিবার নিমিত্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিয়াছিলেন।

চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত পদের সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্তপদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা—বাক্যে হা-হা হুতাশ॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক॥
এই মত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

শ্রীল রামানন্দরায়ের নাটকের যে শ্লোকটীর কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই :—

"প্রেমচ্ছেদরুজঃ" শ্লোক।

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং নচ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।

অন্যো বেদ নচান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ ॥ *

* এই পদ্য জগন্নাথ বল্লভ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের নবম শ্লোক। এটী মদনিকার প্রতি শ্রীরাধিকার বাক্য। ইহার কতিপয় টীকা আছে। নিম্নে দুই একটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে :--

১ম টীকা—অয়ং হরিঃ (হরতি মনো যঃ সঃ হরিঃ) শ্রীনন্দনন্দনঃ প্রেমচ্ছেদেন প্রেমভঙ্গেন যা রুজঃ ব্যথাঃ তা ন অবগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। শঠত্বাৎ ইতি ভাবঃ। অত্র অবপূর্ব্বগচ্ছতের্জ্ঞানার্থত্বেঽপি সর্ব্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চেতি নিয়মাৎ প্রাপ্ত্যর্থত্বং। তর্হি কথং তস্মিন্ শঠে প্রেম ত্বয়া কৃতং ইত্যত্রাহ প্রেমেতি,—প্রেম বা প্রেমাপি স্থানাস্থানং পাত্রাপাত্রং ন জানাতি। অপিচ মদনো নো অস্মান্ দুর্ব্বলা অবলাঃ ন জানাতি। অতঃ সোঽস্মাসু শরসন্ধানং করোতি। ননু শরবিদ্ধানাং যুষ্মাকং দুঃখং দৃষ্ট্বা স কথং ন দয়তে—তত্রাহ অন্য অন্যস্য অখিলং প্রচুরতরং দুঃখং ন বেদ ন জানাতি। ননু তর্হি কিয়ন্তং কালং অপেক্ষতু ভবতী, অবশ্যং করুণাসিন্ধুঃ কৃষ্ণস্তামঙ্গীকরিষ্যতি। তত্রাহ জীবনমপি ন আশ্রবং ন বচনাধীনং শীঘ্রং করিষ্যে ইতিভাবঃ। ননু কৃষ্ণানুরাগিণীনাঃ যুষ্মাকং জীবনং ন ঝটিতি যাস্যতি তং কৃষ্ণং তব মনোহরং যৌবনমাকৃষ্য ঘটয়তি ইত্যত্র আহ—দ্বিত্রীণি দিনানি অত্যল্পকালমেব যৌবনং তিষ্ঠতি। হা হা বিধে! কা গতিঃ। তব কীদৃশী সৃষ্টিরিত্যর্থঃ।

২য় টীকা—অয়ং হরিঃ প্রেমচ্ছেদজন্যরুজঃ পীড়াঃ নাবগচ্ছতি ন জানাতি। প্রেম স্থানাস্থানং ন অবৈতি ন জানাতি। মদনঃ নোঽস্মান্ দুর্ব্বলাঃ ন জানাতি। অন্যস্যাখিলং দুঃখং অন্যো ন বেদ না জানাতি। জীবনং আশ্রবং অস্থিরং। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণি দিনানি, হা হা ইতিকষ্টে। বিধের্বিধাতুঃ কা গতিঃ কা সৃষ্টিঃ।

৩য় টীকা বৈষ্ণবসুখদা—অয়ং সততানুভূতো হরিঃ সর্ব্বদুঃখহারকোঽপি প্রেমচ্ছেদো ভঙ্গঃ তজ্জন্যা রুজঃ পীড়া নাবগচ্ছতি। ননু তর্হি কথং অস্মিন্ প্রেম করোসি

শ্রীমতী মদনিকাকে বলিতেছেন, "সখি উপজাত প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিয়া গেলে যে কিরূপ মনোবেদনা ঘটে, এই হরি পরদুঃখহারী হইয়াও তাহা জানেন না। শঠ হরি প্রেমভঙ্গের দুঃখ কখনও পান নাই। আমি যে ইঁহার সহিত প্রেম করিয়াছিলাম, তাহাতে আমারই বা দোষ কি, কেন না প্রেমত পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান জানে না। আমি যে দুর্ব্বলা অবলা, মদনও সে বিচার না করিয়া আমার প্রতি শর-সন্ধান করে। সখি একের দুঃখ কি অপরে বুঝিতে পারে? "করুণা-সিন্ধু কৃষ্ণ কোন সময়ে অঙ্গীকার করিবেন", এ কথাতেও আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি না। জীবের জীবন অতি চঞ্চল, ইহা কাহারও বাক্যাধীন নহে। যদি বা জীবন কোন প্রকারে বজায় থাকে, কিন্তু সখি, এই যৌবন কয়দিন থাকিবে? রমণীর যৌবন যে দুই চারিদিন মাত্র স্থায়ী। হায় হায় বিধাতঃ এখন আমার গতি কি?" শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যাপদ অতীব পরিস্ফুট ও সুগভীর ভাবাত্মক। তদ্‌যথা :—

ত্যাহ, নবেতি প্রেমকর্ত্তৃ স্থানং কুত্র তিষ্ঠামীতি ন অবৈতি ন জানাতীত্যর্থঃ। মদনোঽপি স্থানাস্থানং ন জানাতি। যতো নো অস্মান্‌ দুর্ব্বলা অবলা ন জানাতীতি স্থানাস্থানাজ্ঞত্বে লিঙ্গমিতি কাব্যালঙ্কারঃ। নম্বেতে ন জানন্তু, অঙ্গসঙ্গিন্যঃ সখ্যস্তু জানন্তীত্যাহ, অন্যো বেদিতি অন্যঃ পরমপ্রেষ্ঠাদিপঞ্চবিধঃ সখীজনোঽপি জনঃ নাম্না-গ্রহণস্তু "ধীরা ভব কদাপাঙ্গীকার্য্যং তেন ভবতীতি", সখীনাং বচনেন সক্রন্দনৈং তাঃ প্রতীর্য্যাভাসাবেশাৎ। ন কেবলমীর্য্যাভাস এব কিন্তু তদুত্তরমপ্যাহ নো জীবনমিতি, আশ্রবং বচনস্থং বচনেস্থিতে আশ্রব ইত্যমরাৎ। ননু অল্পকালঃ সহস্বেতি বচনোত্তরমাহ—দ্বিত্রীণেবেতি দিনানি ব্যাপ্য ইদং যৌবনমিতি বক্তব্যে বিপরীতবর্ণনন্তু অবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষদুষ্টমপি তাদৃশাবস্থায়াস্তাদৃগবর্ণনং গুণাস্তঃপাত্যেব।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর,
কৃষ্ণ তাহা নাহিক করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান ॥
সখি হে ! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥
কুটিল প্রেমা আগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর-শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছি, নারি উকাশিতে ॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ-বাণ, সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাঁহা লিখি, নাহি জান প্রাণ-সখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি ! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,

তত দিন জীবে কোনজন ॥

শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন-অন্ত,

এই বাক্য কহনা বিচারি।

নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,

সে যৌবন দিন-দুই-চারি ॥

অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,

পতঙ্গেরে আকর্ষিয়ে মারে।

কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়ে হয়ে মন,

পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপে দুঃখের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া প্রলাপ কহিতেন।

প্রলাপকথনে উদ্ধৃত আর একটী শ্লোক এই—

"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণ-শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেহহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ *

---

* এই শ্লোকটী কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীপাদ স্বরূপের কড়চা হইতে শ্রীল কবিরাজ মহাশয় দিব্যোন্মাদের বহুল ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্রীগ্রন্থখানি আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। সম্ভবতঃ শ্রীল কবিরাজ উক্ত কড়চা গ্রন্থ হইতেই এই শ্লোকটী সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। যাহাই হউক, নিম্নে ইহার টীকা প্রকাশ করা যাইতেছে—

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণ ব্যতীত আমার দিনসমূহ ও আমার চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অত্যন্ত ব্যর্থ হইতেছে। হায় হায়, পাষাণ শুষ্ককাষ্ঠেন্দ্রিয়বৎ এই সকল অকর্ম্মণ্য ইন্দ্রিয়দিগকে নির্লজ্জ হইয়া কিরূপেই বা বহন করিব।" শ্রীচরিতামৃতে ইহার ব্যাখ্যা-পদ এই :—

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ-বিনু সকল বিফল॥

(ক) রূপাদিপদেন রূপরসগন্ধস্পর্শাদিকং নিষেবণং বিনা দর্শনাদি বিনা যে মম সম্বন্ধেঽহানি ব্যর্থানি। অখিলেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরসনানাসাকর্ণত্বগাদীনি। হতত্রপো বিগতলজ্জঃ সন্ তানীন্দ্রিয়াণিকথং কেন প্রকারেণ বিভর্মি ধারয়ামি। পাষাণবৎ শুষ্কেন্ধনবৎ ভারকানি। অহো খেদঃ।

(খ) বৈষ্ণবসুখদাটীকা,—যেঽহানি ব্যর্থানি তাৎপর্য্যশূন্যানি জাতানীত্যর্থঃ। ননু সমর্থানীন্দ্রিয়াণি কথমেতাদৃশানীত্যাহ পাষাণেতি যে ইন্দ্রিয়াণি অখিলেন্দ্রিয়াণি পাষাণশুষ্ককাষ্ঠবৎ ভারকাণ্যেব মন্তব্যান্যেব তর্হি কথং ধারয়সীত্যাহ অহো ইতি খেদে হতলজ্জোঽহং কথং বা কিমর্থং বা তানি বিভর্মীতি ন জানে ইত্যাক্ষেপঃ। বা শব্দস্য তদর্থত্বাৎ। যদ্বা অহানি ব্যাপ্যাপিলানি ইন্দ্রিয়াণি ব্যর্থানি নিতঃ পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকানি, অস্মাত্মসমানম্।

কৃষ্ণের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র-সম, জানহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলমে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রের সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা-সম॥
কৃষ্ণ কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারেখার,
সেই বপু লোহসম জানি॥

শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ সাধকের হৃদয় সঙ্গলাভের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হয়, কিরূপ উদ্বিগ্নভাবে দিনযামিনী শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত লালায়িত রহে, এইরূপ পদে তাহার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। যিনি সকল সত্যের সার সত্য, যিনি সকল জ্ঞানের মূল জ্ঞান, আর যিনি সকল আনন্দের মূল প্রস্রবণ,—সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ ভিন্ন জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ যে অতি বিফল এবং

উহারা যে শুষ্ক কাষ্ঠ, পাষাণ বা লৌহময় জড়পদার্থমাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে নয়নে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত না হয়, যে কর্ণে বেণুমাধুর্য্যের স্ফূর্ত্তি না হয়, সেই নয়ন ও শ্রবণ—জড়পদার্থ বই আর কি?

শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক হইতে আরও একটী শ্লোক প্রলাপকথনে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্লোকটী এই—

"যদা যাতো" শ্লোক

> যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
> তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
> পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
> বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ। *

অর্থাৎ "যখন ভাগ্যাদৃষ্টবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হন, তখন পোড়া মদন আমার চিত্ত চুরি করিয়া লয়। সখি, পুনরায় যখন ক্ষণতরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব, সেই সময় অখিলঘটিকা-রত্নখচিত করিব।" শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যাপদ অতি পরিস্ফুট—

---

* ১ম টীকা—যদা যস্মিন্ কালে দৈবাৎ ভাগ্যবশাৎ অসৌ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ লোচনপথং যাতঃ প্রাপ্তঃ, তদা তস্মিন্ কালে মদনহতকেন অস্মাকং চেতঃ হৃতং অভূৎ। হতকেনেত্যাক্ষেপোক্তিঃ। পুনর্যস্মিন্ কালে এষ শ্রীকৃষ্ণো দৃশোঃ পদবীং এতি আগচ্ছতি, তস্মিন্ কালে অখিলঘটিকাঃ সময়ঘটিকাঃ রত্নখচিতা বিধাস্যামঃ বিধানং করবাম ইত্যর্থঃ।

২য় টীকা—যদেতি অসৌ সঃ অনপৃক্তস্যাপি তদর্থবাৎ মদন এব হতকস্তেনা-আকৃষ্টমনঃ আহৃতমভূৎ। এষমধুরিপুঃ যস্মিন্ স্থানে ক্ষণমপি বা দৃশঃ পদবীং এতি আগচ্ছতি তস্মিন্ স্থানে অখিলঘটিকা রত্নৈঃ খচিতা বিধাস্যামঃ। বৈষ্ণবতুষণী।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥
পুন যদি কোনক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দর্শন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল।
দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তারে পুছে আমি না চৈতন্য?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য?
শুন মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥
পুন কহে, "হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়,
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।
শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,"
এত বলি শ্লোক উচ্চারয়॥

মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রলাপ করিতে করিতে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া পড়িতেন, আবার সময়ে সময়ে সহসা বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইতেন। এই প্রলাপ-বর্ণনে দেখা যায় মহাপ্রভু অতি

সত্বরেই বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মসংবরণপূর্ব্বক বলিতেছেন, "তোমরা আমার সম্মুখে কে, আমি ত ব্রজগোপী নই, আমি ত সেই কৃষ্ণচৈতন্য; সহসা স্বপ্নের ন্যায় কি দেখিলাম, কি দেখিয়া কি প্রলাপ করিলাম, তোমরা কিছু শুনিয়াছ কি?" এই বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামরায়। তখন দৈন্য ও বিষাদে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রাণের বান্ধব, প্রাণের ধন কৃষ্ণ ভিন্ন আমার জীবন শূন্য-শূন্য বোধ হইতেছে, আমার দেহেন্দ্রিয় সকলই বৃথা" এই বলিয়া গভীরার্থযুক্ত প্রাকৃত ভাষায় একটী পদ্য উচ্চারণ করিয়া আবার প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্‌যথা :—

"কইব" শ্লোক

"কৈঅবরহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ।
জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই॥"*

অর্থাৎ কৈতবরহিত প্রেম মনুষ্যলোকে হয় না। আর যদি তাহা হয়, তবে সে বিরহে বিরহী প্রেমিক জীবন ধারণে সমর্থ হয় না। শ্রীচরিতামৃতে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—

---

* ১ম টীকা—কৈতবরহিতং প্রেম মনুষ্যলোকে ন ভবতি, যদি ভবতি তদা বিরহো ন ভবতি, বিরহে সতি কোঽপি ন জীবতি।

২য় টীকা—কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহঃ? বিরহে ভবতি কোঽপি ন জীবতীতি। মানুষে লোকে ভুবনে পৃথিব্যামিত্যর্থঃ। যথা মানুষলোকস্য ভুবনে জন ইত্যমরঃ। যদি যস্য মানুষলোকস্য ভবতি তৎ প্রেম, তদা বিরহো ন ভবতি। [illegible] বিরহে ভবতি সতি কোঽপি প্রায়ঃ [illegible] ন জীবতি।

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য়॥"
এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয় কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাইয়া॥

এই বলিয়া বিরহব্যাকুল শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। তদ্‌যথা :—

"ন প্রেমগন্ধ" শ্লোক

ন প্রেম-গন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥*

---

* ১ম টীকা—হরৌ শ্রীকৃষ্ণে মে মম প্রেমগন্ধো দরাপি ঈষদপি নাস্তি; তথাপি লোকে সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ক্রন্দামি। শ্রীকৃষ্ণমুখাবলোকনং বিনা যৎ প্রাণ-পতঙ্গকান্ বিভর্ম্মি তৎ বৃথা নিরর্থকমিত্যর্থঃ।

২য় টীকা—হরৌ মম দরাপি ঈষদপি প্রেমগন্ধো নাস্তি। ঈষদর্থে দরাব্যয় মিত্যমরঃ। কপটপ্রেমগন্ধোঽপি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নাস্তীত্যর্থঃ কুতঃ শুদ্ধপ্রেমা? নতু তর্হি কথং রোদিষীত্যাহ ক্রন্দামিতি প্রকাশিতুং প্রকটয়িতুম্ অর্থাৎ সর্ব্বত্র নন্বেবং কথং ব্রবীষি প্রেমবতীনাং শিরোমণিরসি। বংশীতি, প্রাণ এব পতঙ্গকাস্তান্ বৃথা বিভর্ম্মি ধারয়ামীতি যদীতি হেতোঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেম নাই, তবে যে তাঁহার কথা বলিয়া ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্য প্রকাশ করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ-মুখাবলোকন বিনা যে প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ করিতেছি, তাহা একেবারেই বৃথা। শ্রীচরিতামৃতের পদ-ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"দূরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণ-প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধ প্রেমসুখ-সিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউল কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়?"
এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামা-নন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।

বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখজ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥

যথা বিদগ্ধমাধবে (২।১৮)

"পীড়াভির্নব-কালকূট" শ্লোক

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥*

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন, সুন্দরি নন্দনন্দনের অনুরাগ জনিত প্রেম যাহার অন্তরে জাগরিত হয়, সেই এই

টীকা, বৈষ্ণবতুষণী।—শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কং প্রেমমহত্ত্বং শ্রীপৌর্ণমাসী শ্রীনান্দীমুখীং প্রতি সতত্ত্বমাহ:—হে সুন্দরি নন্দনন্দনবিষয়কঃ প্রেমা যস্য অন্তরে হৃদয়ে জাগর্ত্তি জাগ্রদ্রূপতয়া স্ফুরতি, অস্য প্রেম্নো বিক্রান্তয়ো বিক্রমা স্তেনৈব জনেন জ্ঞায়ন্তে ইত্যন্বয়ঃ। স্ফুটমিত্যুৎপ্রেক্ষায়াং স্বভাবোক্তৌ বা। বিক্রান্তয়ঃ কীদৃশঃ বক্রমধুরাঃ বিচ্ছেদে বক্রাঃ সংযোগে মধুরাঃ—এতদেব বিশেষণদ্বয়েন স্পষ্টয়ন্ বিয়োগমহত্ত্বং দর্শয়তি, প্রেমা কীদৃশঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগাদ্ যা পীড়া বাধাঃ তাভির্নবকালকূটস্য নববিষস্য যা কটুতা বা তীক্ষ্ণতা তস্যা যো গর্ব্বঃ "অহমেব সর্ব্বেভ্যস্তীক্ষ্ণ ইত্যহঙ্কার স্তস্য নির্ব্বাসনো তত্ত্বনঃ পুনঃ মধুরিম্নো মধুরস্য যোঽহঙ্কার স্তস্য সঙ্কোচনঃ।

প্রেমের বক্র ও মধুর বিক্রম জানে। কৃষ্ণপ্রেমের এমনই রীতি, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত জ্বালা কালকূটের পীড়াদায়িকা শক্তির গর্ব্বকেও খর্ব্ব করে, আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যে আনন্দ হয়, তাহাতে অমৃত-মাধুর্য্যের অহঙ্কারও খর্ব্বীকৃত হয়।”

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এই সময়ে কি ভাবে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতেন, তাহার আভাসও এইস্থলে লিখিত হইয়াছে যথা—

যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরামসুভদ্রাসাথ,
তবে জানে আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হইল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনুমননেত্র ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে।
গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥
তাহা হৈতে ঘরে আসি, মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন ॥*

* “নখে করে পৃথিবী লিখন”—ইহা বিরহিণী নায়িকার চিন্তা-দশার লক্ষণ-বিশেষ, যথা :—

ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টা নাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতং।
শ্বাসাধোমুখতাভূমিলেখবৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ।

অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত ধ্যানের নাম চিন্তা। ইহাতে দীর্ঘ নিশ্বাস, অধোমুখতা, ভূমি-লিখন, বৈবর্ণ্য, নিদ্রাহীনতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা ও দৈন্য প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

"আহা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই শ্রীবংশীবদন ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীতহাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥"
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হইল উদ্বেগ
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হইল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥

এইরূপেই গম্ভীরা-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-জ্বালাময় দিনগুলি অতিবাহিত হইত। শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহাপ্রভু অনেক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের সুধামধুর শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাস-ময় প্রবাহে পার্শ্বচর ভক্তগণের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্যথা—

"অমূন্যধন্যানি" শ্লোক

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥*

* সারঙ্গরঙ্গদাটীকা—অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যবর্ণনাৎ স্বস্য সহিষ্ণুতাং অসহমানা, কচো অমুদ্ধমন্নাহ অমুনীতি। হে হরে অমূনি দিনানি

অর্থাৎ "হে হরি তোমায় না দেখিয়া আমার দিন সকল বৃথা যাইতেছে। হে অনাথবন্ধো, হে করুণাসিন্ধু, আমি তোমায় না দেখিয়া কিরূপে কাল কাটাইব ?"

অস্য অহোরাত্রস্য অন্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতিবিশেষঃ। অমূনি কোটি-কল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুম্ অশক্যানি ইতি বা। হা খেদে, হন্ত বিষাদে, তয়োরতিশয়ে বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতিবাহয়ামি। তৎ ত্বমেব উপদিশেত্যর্থঃ। তন্ধেতোরেবাংশ্যানি। নমু যদি অনন্যগতাসি তদা পত্যাদীন্ কোবিচিন্তয়তীতি দিশা ত্বমেব গচ্ছ ইত্যুক্ত্যা পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্ ইতিবদাহ। হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং ত্বমেব বন্ধুরসি, তে তু দুঃখদা ত্যাজ্যা এব ইত্যর্থঃ। নমু ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র "চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতা" মিতিবদাহ, হে হরে চিত্তেন্দ্রিয়াদিহারিন্ সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। নমু কামিন্যো বয়ং চপলা এব। ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্যঃ ? তত্র "তন্নঃ প্রসীদেতি"বৎ সদৈন্যমাহ, হে করুণৈকসিন্ধো কৃপাসিন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য নো অনু-গৃহাণেত্যর্থঃ। অন্তর্দশায়াং অনয়া তথা ক্রীড়িতস্তব দর্শনং বিনা অন্যৎ সমানম্।

সুবোধিনী টীকা :—অথাত্যুদ্রিক্তোৎকণ্ঠার্ত্তাঃ কালনির্যাপনাসামর্থ্যাৎ আবে-দয়ন্নাহ, হে হরে ত্বদবলোকনং বিনা অমূনি অধন্যানি দিবসানামান্তরাণি মধ্যানি রাত্রীরিত্যর্থঃ। কেনোপায়েন অতিবাহয়ামীতি ত্বমেব উপদিশেত্যর্থঃ। কথং এব উপদিশামীত্যত আহ যা অনাথা হে তাসাং বন্ধো, যতঃ হে করুণৈকসিন্ধো কারুণ্যে-নৈবতদাভিসারস্থায়ককালনির্বাহোপায়ং উপদিশেত্যর্থঃ।

রসময়ীতরঙ্গিণী টীকা :—ন বিদ্যতে নাথো নাথান্তরং যস্য তস্য বন্ধো প্রতিপালক।

বৈষ্ণবসুখদা টীকা :—অমূনীতি হে হরে ত্বদালোকনান্তরেণ বিনা অমূনি দিনান্তরাণি অধন্যানি কথং নয়ামি গময়ামিন গময়িতুং শক্নোমি, ইতিধ্বনিঃ। তৎ দর্শনং দেহীত প্রতিধ্বনিঃ। যদি দর্শনং ন দদাসি তদা মরিষ্যামীতি অনুরণনধ্বনিঃ। অত এবোক্তমোত্তমং কাব্যম্। অনেন ক্ষুব্ধোদ্দাপরে তদপরাহোহোমোত্তমং ইতি।

শ্রীচরিতামৃতে ইহার এইরূপ পদব্যাখ্যা আছে—

"তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণতীর্থ-ভ্রমণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকেই তিনি এমন মাধুর্য্য অনুভব করিতেন, যে একটী মাত্র শ্লোকের রসাস্বাদনে দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া যাইত, তিনি শ্লোকের ভাবে বিভোর থাকিতেন, আবার ঐ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রলাপ করিতেন। শ্রীল কবিরাজ, মহাপ্রভুর প্রলাপ-কথনে এই গ্রন্থ হইতে যে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিম্ন লিখিত শ্লোকও তন্মধ্যে একটী :—

"ত্বচ্ছৈশবং" শ্লোক

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥ *

---

* সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকাসহ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ সুদীর্ঘ টীকাটী উদ্ধৃত করা হইল না। অপর দুইটী টীকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(ক) সুবোধিনী টীকা। অথাত্মনস্তদ্দর্শনাসম্ভবমননাৎ সদৈন্যমাহ ত্বদিতি। ত্বৎ শৈশবং ত্রিভুবনস্য বিস্মাপকম্ অদ্ভুতকেতি ত্বমেব জানীহি। মচ্চাপলঞ্চ অদর্শ-[illegible] ত্বদ্বিষয়কম্ তব বা মৎকৃতত্বম্ কচিদবিবেকসময়ে মম জাতং গোপয়

অর্থাৎ শ্রীমতী উদ্ঘূর্ণাদশায় বলিতেছেন, হে "নাথ, তোমার কৈশোর-মাধুর্য্যের আকর্ষণ অতীব অদ্ভুত, আমার চাপল্য ও অদ্ভুত ; ইহা উভয়েরই জানা আছে। এখন বল দেখি নাথ তোমার মুরলীবিলাসি মুখাম্বুজখানি আমি কিরূপে দেখিতে পাইব ?"

শ্রীচরিতামৃতের ব্যাখ্যা-পদ এই :—

"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥"
নানা ভাবের প্রাবল্য, হইল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।

স্তত্তোমুখাম্বুজমীক্ষণাভ্যামুচ্চৈর্বীক্ষিতুং কিং কমুপায়ং করোমি, যৎকৃতে তৎদৃষ্টং প্রাপ্স্যামি তং ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ বিরলং দুর্লভং যতো মুরলীবিলাসি অতো মুগ্ধং মনোহরমিত্যর্থঃ।

(খ) দুর্গমসঙ্গমনী টীকা।—বিরলং কচিৎকচিদেব ভাগ্যবদ্ভিরেবোপলভ্যং তস্মাৎ বিরলং। কচিদেব ভাগ্যবদ্ভিরেবোপলভ্যং তব মুখাম্বুজং ঈক্ষিতুং অহং সাধনং করোমি।

(গ) বৈষ্ণবসুখদা টীকা।—শৈশবং শিশুপ্রায়ং বস্তুতঃ কৈশোরমিত্যর্থঃ বাল্যস্ত্র ষোড়শাবধীতি শাসনাৎ বালত্বমতিদুর্লভমিত্যত্র শ্রীভাগবতে তত্রৈব ব্যাখ্যানাৎ। অবৈহি জানীহি। অধিগম্যং ন তু অন্বেষ্যমিত্যর্থঃ। তৎ ঈক্ষণাভ্যাং তব মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুম্ দ্রষ্টুং কিং করোমিতি কীদৃশং মুগ্ধং শ্রীগোপীনাং তাদৃশভাবলুব্ধতয়া মুহ্যমানং সুন্দরং বা (মুগ্ধঃ সুন্দরমূঢ়য়োরিত্যমরাৎ। পুনঃ কীদৃশং মুরলীবিলাসি মুরল্যা বিলাসো অস্মিন্ অস্তি ইত্যস্ত্যর্থে ইন্; যদ্ বা তাচ্ছিল্যে ইন্।

ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু-মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥

"হে দেব" শ্লোক

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ১০ ॥ *

---

* (ক) সুবোধিনীটীকা।—পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যপগমে ভাবশাবল্যোদয়াৎ সদৈন্যমাহ হে দেবেতি প্রথমং ক্রীড়ানন্দাবিষ্টত্বমেতৎ দুঃখং ন জানাসি ইতি সদৈন্যমাহ। হে দেব ক্রীড়াবিষ্ট। হে ইতি খেদে। কস্মিন্ কালে ত্বং মে দৃশোঃ পদং গতিং স্বদ-প্রাপ্তিজপীড়ামনুভবিষ্যসি। অত্র হেতুঃ—হে দয়িত দয়িততয়া তদনুভবে কৃপালু-স্ত্বং দৃগ্‌গোচরো ভবিষ্যসি, অভিপ্রায় ইতি তদুপপাদয়ন্নাহ; ভুবনানামেকঃ কেবলো নিরুপাধিকো যো বন্ধুঃ হে কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষকানন্দঃ স্বনামগুণাদিনা জগদাকৃষ্টকপ্রাণ-জগবন্ধুঃ তর্হি কুতো দুর্ল্লভতা? তত্রাহ হে চপল স্বচ্ছন্দাচরিত তাই কুতঃ প্রাপ্ত্যাশা? করুণৈবৈকা মুখ্যা যত্র হে তাদৃশসিন্ধো। তত্রাপ্যন্যো বৈশিষ্ট্যমাহ, হে নাথ অস্মৎপালক। তদপি কুতঃ হে রমণ, মহাভীষ্টপতে, অতএব নয়নয়োরভিরাম-রতিজনক।

(খ) বৈষ্ণবসুখদা—হে দেব-বিলাসিন্, হে কৃষ্ণ আনন্দনন্দনন্দন, ননু ভোঃ কদা মে দৃশোঃ পদং ভবিতাসি, প্রাপ্স্যসি, অত্রভবতে প্রাপ্তুর্থত্বাৎ। যদা অনুভবিতাসি অনুভবিষ্যসীত্যর্থঃ। উপসর্গেন ধাত্বর্থভেদাৎ সকর্ম্মকত্বম্।

(গ) কস্যচিৎ টীকা—হে সম্বোধয়তি। দেবত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। হে

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন রীতি,* মানগর্ব্ব ব্যাজস্তুতি,
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন॥
ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কোন ক'রে মান॥
তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥

দয়িত তত্র মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং ত্যক্ষ্যসে তদ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে ভুবনৈক-বন্ধো তত্রাত্র কো দোষঃ? ত্বং কেবলং মমেব সর্ব্বগোপীনামপি কিমুত তাসা-মেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি, তৎসর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছ ইত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ শ্যামসুন্দর হে চিত্তাকর্ষক, চিত্তং তয়া হৃতং কিং মে মানেন তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহি ইত্যর্থঃ। হে চপল বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ ইত্যাদি।

* "সোল্লুণ্ঠবচন" প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দ্রষ্টব্য।

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,

বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।

তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,

এ তোমার বৈদগ্ধ্য বিলাস ॥

মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছেড়ে গেল জানি

শুন মোর এ স্তুতি বচন।

নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,

হা হা পুন দেহ দরশন ॥

স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,

দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।

হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতিউতি ধায়,

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,

কহে—এই আইলা মহাশয়।

কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,

শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥

"মারঃ স্বয়ং" শ্লোক

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যোতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু,
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ *

* বৈষ্ণবসুখদা—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য নিশ্চয়তো সন্দেহালঙ্কারেণ বিতর্কয়ন্নাহ মার ইতি। "নু" ইতি বিতর্কে। নু কিং স্বয়মেব মারঃ মারশক্তি ব্যথ-

অর্থাৎ এই কি স্বয়ং মদন, অথবা এটি কি একটি মধুরদ্যোতি-মণ্ডল, অথবা ইহা কি মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য, কিংবা এটী আমার মন ও নয়নের অমৃত-স্বরূপ, সখি ইনিই কি আমার বেণী-উন্মোচনকারী প্রাণবল্লভ? সেই শ্রীকৃষ্ণ কি সত্যই আমার নেত্রসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন? শ্রীচরিতামৃতের পদব্যাখ্যা এইরূপ—

> কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান,
> কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
> কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
> সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥

শ্রীচরিতামৃতকার, ভাবরসময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহের ভাবময়ী মূর্ত্তি নিরন্তর মানসক্ষেত্রে সন্দর্শন করিতেন। গম্ভীরা-লীলায় মহাপ্রভু

মতীতি মারঃকামঃ— স্বয়মাগতঃ। ভ্রুকীড়িয় "অয়ং মাং প্রাপ্য প্রার্থয়িষ্যতীতি কটিন্দ্রামোদাবাগতঃ তর্হি ক আগত ইত্যাহ দ্যু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং পরিচ্ছিন্নং দৃষ্ট্বা তন্নিষিধ্যাহ, "মাধুর্য্যমেব" দ্যু মধুরঃ ধর্ম্ম এব মূর্ত্তিমান্ ইত্যর্থঃ। তস্যোন্মাদকত্বা-ভাবাৎ তদপি নেত্যাহ—"মনোনয়নামৃতম্" দ্যু মনোনয়নয়োরানন্দকং কিমপীত্যর্থঃ। তত্রাবয়বদর্শনাদিদমপি কদাচিদেবেত্যাহ বেণীমৃজ ইতি বেণীং মাষ্টীতি বেণীমৃজ মম জীবিতস্য বল্লভঃ নমু কিং ইতি অতিশয়োক্ত্যা চিরস্থিতিঃ। বেণীমৃজ ইতি ইন্দুপাদুভবাৎ অতিপ্রত্যয়ঃ, অয়ং জীবিতবল্লভঃ কিশোর মম লোচনং সুখয়িতুং অভ্যু-দয়তে। যথা শ্রীলীলাশুকঃ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা স্ফূর্ত্যা তমেব বিলোক্য বিতর্কয়ামাস ইতি। অত্র মম জীবিতস্য প্রাণস্বরূপায়াঃ শ্রীরাধাবল্লভ ইতি। অক্ষর সমাসম্। অত্র এবমং ভেদোক্ত্যা সন্দেহালঙ্কারঃ। স সন্দেহস্তু ভেদোক্তৌ ইতি কাব্যপ্রকাশে ততো নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহঃ।

কি ভাবে দিনযামিনী যাপন করিতেন, কবিরাজ গোস্বামী স্থানে স্থানে দুই একটী মাত্র বাক্যে বহুবার তাহার পরিস্ফুট প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানেও সেই ভাবচিত্রের একটী আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে যথা :—

গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্যহর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দের শুদ্ধ দাস্য-রস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ॥
লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে ইথে কি বিস্ময়।
তাহে-মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।

শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥
আপনি করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হয় তার দাসানুদাস সঙ্গ ॥
চৈতন্যলীলা-রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্তগণ দিল এই ভেটে ॥

এই অধ্যায়ের উপসংহার এইরূপ—

পাঞা যার আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস।

চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু, কল্লোলের একবিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥

বাস্তবিকই এই লীলা, সিন্ধুর ন্যায় অপার ও অসীম, সিন্ধুর ন্যায় গম্ভীর ও উচ্ছ্বাসময় এবং সিন্ধুর ন্যায় নিত্য তরঙ্গময়। এই লীলা-সিন্ধুর বিন্দুকণা স্পর্শ করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় বর্ণিত শেষ ঘটনা এইরূপ:—

বসন্তকাল ও ললিতলবঙ্গলতা গান। বৈশাখ মাস, বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ্র কিরণে জগন্নাথবল্লভ উদ্যান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, বৃক্ষবল্লরী কুসুমদামে প্রফুল্লমাধুরী বিস্তার করিয়া পুরীধামে শ্রীবৃন্দা-বনমাধুর্য্য ছড়াইয়া রাখিয়াছে, শুকসারী পিকবধূ ও ভৃঙ্গগণের ঝঙ্কারে কানন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কুসুমবাসে চারিদিক আমোদিত; মলয়পবন, লতাবল্লরী ও বৃক্ষ শাখাগণকে নাচাইয় নাচাইয়া যেন ভক্তগণকে ভক্তির নৃত্য শিক্ষা দিতেছে। রজত-শুভ্র চন্দ্রালোকে তরুলতা ঝলমল করিয়া একে অপরের গায়ে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে। জগন্নাথবল্লভ উদ্যানের এই রমণীয় বাসন্তীশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে রূপময়বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ কাননে প্রবেশ করিলেন। কানন-শোভা-সন্দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জয়দেবের কৃত "ললিতলবঙ্গলতা" গানটী মনে পড়িল, স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণকে ঐ পদটী গাইতে বলিলেন। স্বরূপ গাইলেন—

ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ কুটীরে ॥

স্বরূপের কণ্ঠ শুনিয়া পিকবধূ চমকিত হইল, উহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইয়া গেল। মধুকরগণের কণ্ঠ-মাধুরীর সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া স্বরূপ আবার তান ধরিলেন। বেণুরব-মুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় মহাপ্রভু গানের দিকে কর্ণসংযোগ করিয়া রহিলেন, আর এক একবার দক্ষিণে ও বামে তাকাইতে লাগিলেন। স্বরূপ, মহাপ্রভুর দিকে হস্তসঞ্চালন করিয়া আবার গাইলেন :—

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতীজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

মহাপ্রভু চকিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন, ইতস্ততঃ ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি করিতে করিতে দুইপদ অগ্রসর হইয়া বকুল-মূলে বসিয়া পড়িলেন, অলিকুলের তানে ও স্বরূপের গানে তাঁহার হৃদয়ে ব্রজস্মৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, স্বরূপ আবার গাইলেন :—

উন্মদমদন-মনোরথপথিক-বধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুমসমূহ-নিরাকুলবকুলকলাপে॥
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ-নবদলমালতমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুক-জালে॥

পলাশের লোহিতরাগ, প্রভুর হৃদয়ে ব্রজরসের মঞ্জিষ্ঠা আগ বিকশিত করিয়া তুলিল। মহাপ্রভু বিবশভাবে বলিলেন "সখি তার পর?" স্বরূপ পদ ধরিলেন—

মদন-মহীপতি-কনক দণ্ডরুচি-কেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটল-পটলকৃত-স্মর-তূণবিলাসে॥

বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্তমুখাকৃতি-কেতকীদন্তুরিতাশে॥

ভাববিবশ মহাপ্রভু মাধবী-লতার তলে গিয়া বলিলেন "সখি এই যে মাধবীকে দেখিতে পাইতেছি, আমার প্রাণের মাধব কোথায়? এই মাধবীতলে আমার প্রাণবঁধু আমার লাগিয়া যোগীর ন্যায় ধ্যান ধরিয়া বসিয়া থাকেন।" এই বলিয়া মহাপ্রভু "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, স্বরূপ গাইলেন ঃ—

মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালতিজাতিসুগন্ধৌ।
মুনি-মনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ॥
স্ফুরদতিমুক্তালতাপরিরম্ভণ-মুকুলিত-পুলকিতে চূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসরপরিগত-যমুনা-জলপূতে॥

মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানবিহীনের ন্যায় ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, স্বরূপ মহাপ্রভুর বামদিকে বসিয়া গাহিলেন—

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণ-স্মৃতিসারম্।
সরসবসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগত-মদন-বিকারম্॥

স্বরূপের ঝঙ্কার সহসা থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র কানন যেন নীরব হইয়া পড়িল। মহাপ্রভু এতক্ষণ আড়নয়নে অশোক তরুর পানে তাকাইতেছিলেন। তিনি চকিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "সখি, অই সেই, অই ত বটে—অশোকের মূলে দাঁড়াইয়া,—ঐ দেখ" এই বলিয়া মহাপ্রভু অশোক তরুর দিকে ধাবিত হইলেন, কিয়দ্দূর

শ্রীকৃষ্ণ সৌরভে উন্মত্ততা

অগ্রসর হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হায় হায় একি হলো, এই যে নিঠুর শঠ এইখানে দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিতেছিল, আবার কোথায় গেল, হায় হায় কৃষ্ণ কোথায় ? সখি, আমায় রক্ষা কর, আমার প্রাণ—" এই বলিয়া মহাপ্রভু ঢলিয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছিত হইলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইঞা চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা ॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুন হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইঞা ॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিল। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকিয়া, তাঁহার কিঞ্চিৎ চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ সম্বন্ধে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার, স্বরচিত গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ হইতে তদ্ভাবসূচক একটী সংস্কৃত কবিতা ও উহার বাঙ্গালা-পদ্যব্যাখ্যা শ্রীচরিতামৃতে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্‌যথাঃ—

কুরঙ্গমদজিদ্‌বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥

ইহার পদ্যানুবাদ, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে, কৃষ্ণ-গন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাহা বৈসে,
কৃষ্ণ পাশে ধরি লঞা যায়॥
নেত্র-নাভি-বদন, কর-যুগ-চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সে গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে॥
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহা অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি ডাকাতি যেন কৈল চুরি॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ।
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙো পিঙো তভু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়।

মদন মোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনি মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘরে যাইতে পথ নাহি পায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে কুসুম-কাননে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। মরীচিকাভ্রান্ত তৃষাতুর মৃগ যেমন পুরোভাগে প্রসন্নসলিলা তটিনীতরঙ্গ দেখিয়া প্রধাবিত হয়, কিন্তু ক্রমশঃ বহুদূর অগ্রসর হইয়াও আর জলের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয় না, অবশেষে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, গৌরহরিও সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে চপলার চমকের ন্যায় নবজলধর শ্যামসুন্দরের নয়নরঞ্জন শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা ধরিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার অঙ্গগন্ধে ব্যাকুল হইয়া সেই জোছনাপুলকিত-যামিনীটি সেই কুসুম-কাননেই অতিবাহিত করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও রায় রামানন্দ বিবিধ উপায়ে প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।*

এইরূপে শেষ দ্বাদশবৎসর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গম্ভীরার কক্ষে প্রেমের যে গম্ভীর লীলা করিয়াছিলেন তাহাতে জীবের সহিত

---

* এই স্থানে পাঠকগণ বঙ্গের অমরকবি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃত "তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো" এই সুবিখ্যাত গানটীর অন্তর্গত "তব নন্দন গন্ধনন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে" এ চরণটী স্মরণ করিতে পারেন।

শ্রীভগবানের মহামধুর সম্বন্ধ অতি পরিস্ফুট রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি এই লীলায় শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এবং সেই মাধুরী-আস্বাদনে শ্রীরাধার সুখাতিশয় আস্বাদন করিয়াছেন; ইহা অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য। কিন্তু এই মহীয়সী গম্ভীরা-লীলায় মানবীয় ভজনের চরম আদর্শ পরিস্ফুট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেমের ব্যাকুলতা ভিন্ন ভগবদ্দর্শন অথবা সেই "রসো বৈ সঃ" রসিক-শেখরের রসাস্বাদন অন্য কিছুতেই হয় না। এই লীলা আমার অধম ও অসমর্থ ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। তথাপি মূকের রসাস্বাদন-প্রকাশের ন্যায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ-চেষ্টা করা হইল মাত্র।

উপসংহার

শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার উপসংহার পরিচ্ছেদে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-লিখিত শ্লোকটী এই—

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-উদ্ভাবিত হর্ষ-ঈর্ষা উদ্বেগ-দৈন্য ও আর্তিমিশ্রিত প্রলাপ ভাগ্যবান্‌দেরই আস্বাদ্য। গ্রন্থকার মহোদয় পয়ারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ বিহ্বলে ॥
স্বরূপ-রামানন্দ এই দুই জনার সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক-আস্বাদনে ॥
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগআর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥

স্বরূপ ও রামরায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মূলে বসিয়া কি ভাবে দিন-যামিনী আকৃষ্ট থাকিতেন, তাঁহারা শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরের প্রান্তে বসিয়া কি কার্য্য করিতেন, পরম কারুণিক প্রেমভক্তির প্রকৃত কবি-রাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস স্থানে স্থানে দুই একটী ছত্রেই সেই দ্বাদশ বৎসরের প্রতিচ্ছবি ভজননিষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণের নিমিত্ত আঁকিয়া তুলিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামরায় রসময় কৃষ্ণ-কথা বলিতেন, শ্রীপাদ স্বরূপ রসকীর্ত্তন করিতেন, এইরূপে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন হইত, আর ঐ কৃষ্ণকথা ও রসময় সঙ্গীতের রসাস্বাদনে মহাপ্রভুর হৃদয়ে হর্ষ, শোক, রোষ, দৈন্য, উদ্বেগ, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও সন্তোষ প্রভৃতি ভাবোদ্গম হইত। মহাপ্রভু ভাবানুসারে নিজে শ্লোক-রচনা করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া দুই বন্ধুকে (স্বরূপ ও রামরায়কে) শুনাইতেন, ইঁহারা ঐ সকল শ্লোকের রসাস্বাদন করিতেন, তদ্‌যথা :—

শিক্ষাষ্টক-শ্লোক।

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লৈঞা॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥

প্রভু এক দিবস স্বরূপ ও রায় রামানন্দকে আহ্বান করিয়া হর্ষভাবে বলিলেন, "স্বরূপ রামানন্দ, কলিকালের জীব নিস্তারের পথ কেবল একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন," এই বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোক পাঠ করিলেন। প্রভু বলিলেন কলিকালে নামযজ্ঞই সর্ব্ব-যজ্ঞসার। এই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেই কলিতে শ্রীকৃষ্ণারাধনের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতঃপরে তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনে মহাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া বলিলেন :—

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥

এই বলিয়া স্বরচিত একটী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিলেন তদ্‌যথা :—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্‌॥

এইটী শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ইহাতে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের, মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ,—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা বিমলিন চিত্তরূপ-দর্পণ বিমার্জ্জিত হয়, সংসার-মোহরূপ দাবানল নির্ব্বাপিত হয়, উহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের অভ্যুদয় হইয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিদ্যাবধূ সরস্বতীর জীবন স্বরূপ এবং উহা হইতে আনন্দ-সমুদ্র প্রবর্দ্ধিত হয়, উহার প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহার দ্বারা সকলের আত্মাই স্নিগ্ধ স্নপিত হইয়া শীতল হয়। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন অতীব জয়যুক্ত হউন।

দ্বিতীয় শ্লোকটি বিষাদ-দৈন্য-সূচক ও নাম মাহাত্ম্য-প্রকাশক, তদ্‌যথা :—

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অর্থাৎ হে, ভগবন্‌, তুমি বহুলোকের বহু বাঞ্ছা-পূরণের জন্য বহু-নাম প্রকটন করিয়াছ, আবার সেই সকল নামে নিজের সকল শক্তিই

অর্পণ করিয়াছ, অথচ সেই নাম-স্মরণের জন্য কালাকালের কোনও নিয়ম বিধান কর নাই, অর্থাৎ সকল সময়েই তোমার নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাতে শৌচাশৌচ-কাল-বিচার নাই। হে দয়াময়, তোমার কৃপা এতই প্রচুর! কিন্তু আমার আবার এমনি দুর্দ্দৈব, তোমার এ হেন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।"

তৃতীয় শ্লোকটী সুবিখ্যাত "তৃণাদপি" শ্লোক। প্রভু বলিতেছেন—

যেরূপে লইলে নাম হয় প্রেমোদয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই শ্লোকটী বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারিত্বনির্ণয়সূচক। বৈষ্ণব হইতে হইলে প্রথমতঃই এই সকল লক্ষণ-লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতে হইবে। এই সকল গুণসম্পন্ন না হইলে কাহারও হরিকীর্ত্তনে প্রেমলাভে অধিকার বা যোগ্যতা জন্মে না!*

অতঃপরে দৈন্য ভাবের উদয়ে শ্রীগৌর ভগবান্ শুদ্ধভক্তি-প্রার্থনার প্রণালীপ্রদর্শন করার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

---

* কলাপ ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে :—"শকি চ কৃত্যা।" কৃৎ। ৪২৬। বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—"শকনং শক্, শক্যার্থবিশিষ্টাদ্ধাতোর্গর্হত্যার্থবিশিষ্টাচ্চ কৃত্যা ভবন্তি।" অর্থাৎ শক্তি ও অর্হ (যোগ্য) অর্থে বর্ত্তমান ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় হয়। কৃত্য কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে বৈয়াকরণ শিবরাম শর্ম্মা কৃন্মঞ্জরীতে লিখিয়াছেন :—

তব্যানীয়ৌ ক্যপ্ ঘ্যণৌ যঃ পঞ্চৈতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ।

অর্থাৎ তব্য, অনীয়, ক্যপ্, ঘ্যণ্, এবং যঃ এই পাঁচটী কৃত্যসংজ্ঞক।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

কবিরাজ গোস্বামী ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

ধন জন নাহি মাগোঁ, কবিতা সুন্দরী।

শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

নামাশ্রয়ের পরে শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা, তাহার পরেই দাস্য ভক্তির প্রার্থনা, তদ্‌যথা—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং মাং বিচিন্তয়।

ইহার অনুবাদ এইরূপ :—

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।

পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞা॥

কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।

তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

ইহাও দৈন্যার্ত্তি। কিন্তু কেবল দৈন্যে কৃষ্ণলাভ হয় না। দৈন্যের সহিত উৎকণ্ঠার প্রয়োজন। উৎকণ্ঠা বা ব্যাকুলতা ভিন্ন অভি-

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ" এই শ্লোক-পাদে আমরা "কীর্ত্তনীয়ঃ" এই কৃদন্ত পদে যে "অনীয়" প্রত্যয় দেখিতে পাইতেছি। উহা "অর্হ" অর্থাৎ যোগ্য-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, যিনি অমানী এবং অপরের মানদ, তিনি হরিনাম কীর্ত্তনের যোগ্য। অর্থাৎ নামাশ্রয় করিতে হইলে এবং নাম-ভজনে প্রেমরূপ পুরুষার্থতা লাভ করিতে হইলে এই সকল গুণে আপনাকে যোগ্য করিয়া তুলিতে হয়।

লষিত পদার্থের সাক্ষাৎকার ঘটে না। মহাপ্রভু স্বরচিত শ্লোকে তাঁহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।

অর্থাৎ "হে নাথ, আমার এমন দিন কবে হইবে যে দিন তোমার নাম গ্রহণকালে নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় পরিসিক্ত হইবে, রুদ্ধবাক্যে বদন গদ্‌গদ হইবে, এবং পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হইবে।"

ইহা উৎকণ্ঠাময় দৈন্য। এই উৎকণ্ঠাময় দৈন্যই ভক্তভাবের উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি। ইহার উপরের সোপানই ভক্ত ও ব্রজবধূদের প্রেমের মাঝামাঝি তটস্থ ভাবসূচক। তদ্‌যথা :—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

অর্থাৎ "হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে চিত্তের উদ্বেগে নিমেষ-কাল ও যুগের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, বর্ষায় অবিশ্রান্ত বারিধারার ন্যায় অশ্রুধারা বর্ষণ হইতেছে, হায় হায় সমস্ত জগৎ শূন্য-শূন্য বোধ হইতেছে।"

এই অবস্থা হইতেই ভক্তের আত্ম-বিস্মৃতি আরম্ভ হয়, নিজের দেহ গেহ ভুলিয়া যাইয়া সাধক ধীরে ধীরে শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম-নিকুঞ্জে অতিথির বেশে দণ্ডায়মান হন। তখন ব্রজবধূগণের ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া তিনি পূর্ণরূপে তদ্ভাব-বিশিষ্ট হইয়া পড়েন, পুরুষ-ভাব তিরোহিত হয়, পার্থিব ভাব ও প্রাকৃত জগতের সমস্ত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া সাধক আপনাকে শ্রীবৃন্দাবনের কেলি-নিকুঞ্জের সহচরী বলিয়া মনে করেন।

শিক্ষাষ্টকের সর্ব্বশেষ শ্লোকটীতে অন্তর্দ্দশার চরম বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম। শ্রীরাধার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে নিরন্তর বিবিধ ভাবের উদয় হয়। সেই সকল ভাবরাশি মানুষে সম্ভবে না, মানুষের ভাষাতেও অভিব্যক্ত হয় না। এমন কি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিতে ঐ সকল ভাবের ধারণা করাও অসম্ভব। কিন্তু যিনি শ্রীরাধার ভাব-মাধুরী এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণানুভাবজনিত সুখাস্বাদন করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারই কৃপায় প্রেমিক ভক্তগণ দিব্যোন্মাদ-লীলার সেই নিগূঢ় রসের কিঞ্চিৎ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্রজলীলা-রসাস্বাদী পরমকারুণিক গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজগোস্বামী অতি অল্পাক্ষরে উহার আভাস প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—

> হর্ষা উৎকণ্ঠা, দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
> এতভাব একঠাঞি করিল উদয়॥
> এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল।
> সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি যে শ্লোক পড়িল॥
> সেইভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
> শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল॥

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হন। সুতরাং তাঁহার লীলার প্রগাঢ় ভাব—শ্রীরাধাভাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরাধা-ভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন :—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।

অর্থাৎ সখি, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণদাসী, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তিনি আমার সুখরাশিস্বরূপ। তাঁহাকে ভিন্ন আমি অন্য কিছু জানি না। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন, কিংবা দেখা না দিয়া আমায় মর্ম্মহতা করুন, কিম্বা সেই লম্পট যথেচ্ছ ব্যবহার করুন কিন্তু তথাপি তিনিই আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণবল্লভ। তিনি তো কোনরূপ আমার পর নহেন।

শ্রীচরিতামৃতে এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।* এই

---

* শ্রীচরিতামৃতে উক্ত শ্লোকটি নিম্নলিখিত রূপে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহ রস সুধারাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন, তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
* * * সখিহে শুন মোর নিশ্চয় বচন।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করি ক্রীড়া, সেই নারীগণ দেখাইয়া ॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট, অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া তবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, তার সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ, তার হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাইঞা হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাব হাতে ধরি, ক্রীড়া করাঞা করো তারে সুখী

শ্লোকটীতে ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে, ইহাতে আত্মসুখের গন্ধমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। নিজের অনন্ত ক্লেশেও যদি প্রণয়ীর সুখ হয়, তাহাই সুখকর বলিয়া স্বীকার্য্য। প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা বলেন, "আমি আপনার দুঃখ গণনা না করিয়া, কেবল কৃষ্ণের সুখেই আমার সুখ মনে করি। আমায় দুঃখ দিয়াও যদি তাঁহার সুখ হয় আমার পক্ষে তাহাই সুখ।" ইহাই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম—এই অকৈতব প্রেম এ জগতে পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে এই মহা প্রেমের বিবিধ রস আস্বাদন করিয়া

কান্তা কৃষ্ণ করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখপান, ছাড়ে মান অল্প সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্ম্মব্যথা জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজসুখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, পতিলাগি কৈল বেশ্যা-সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃতপতি, তুষ্টকৈল মুখ্য তিন দেবা॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ, এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, তাহে হয় দাসী অভিমান।
কান্ত সেবা সুখপূর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী॥

প্রলাপে অনেক গূঢ়-রহস্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রজভাবে দিবা-নিশি বিভোর থাকিয়া মহাপ্রভু অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের যে অমল কৌমদীচ্ছটা ইহজগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকাশের যোগ্য ভাষা নাই, ধারণার উপযুক্ত হৃদয় নাই। শ্রীল কবিরাজ যথার্থই বলিয়াছেন :—

প্রভুর গম্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিতে প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত স্বভাবতঃ কোটি-কোটি সমুদ্রবৎ গম্ভীর হইলেও শ্রীরাধার ভাবচন্দ্রোদয়ে তাঁহার সেই সমুদ্রগম্ভীর হৃদয়ও চন্দ্রোদয়ারম্ভে অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় সমুচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত। সেই ভাব-তরঙ্গের কণা মাত্র ধারণা করাও আমাদের ন্যায় জীবের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীমন্মদনগোপালের করধৃত যন্ত্রস্বরূপ শ্রীচৈতন্য-লীলা-লেখক পরমভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন :—

আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনী।
সে যৈছে তৃষায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥

সুতরাং আমার ন্যায় পতিত-অধমের সম্বন্ধে আর কথা কি? শ্রীরাধার মহাভাব, ভজনের চরম আদর্শ। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে সেই ভাব প্রকটন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে, কৃষ্ণকর্ণামৃতে, গীত-গোবিন্দে, জগন্নাথবল্লভ নাটকে ও চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদে যে সকল ভাব পরিলক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহব্যাকুল দিব্যোন্মাদী

শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সেই ভাবের শ্লোক পাঠ করিয়া প্রিয়তম সহচর শ্রীপাদ স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত দ্বাদশ বৎসরকাল দিন যামিনী যে কৃষ্ণরস আস্বাদন করিতেন, মানুষের ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। শ্রীল কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন :—

যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণ-রস আস্বাদয়ে দুই বন্ধুসনে॥
সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কি পারি বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপন শোধিতে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপসংহারে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কেবল ভক্ত-কবির স্বভাবসুলভ দৈন্য-প্রকাশ নহে—তিনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় রাধাভাবের যে উত্তালতরঙ্গে মহাপ্রভুর হৃদয় দিবানিশি উদ্বেলিত হইত, গম্ভীরার নিভৃতকক্ষ-নিবাসী শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীপাদ রামানন্দরায় সে তরঙ্গলীলা সন্দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেন এবং অনেক সময়েই কর্ত্তব্যতাবিষয়ে বিমূঢ় হইয়া পরিতেন। মহাপ্রভুর এই দুই হৃদয়-বন্ধুই সেই মহীয়সী লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। প্রলাপের হা-হুতাশে,—বিরহের মর্ম্মদাহী বিষাদজ্বালায়,—উন্মাদের

বিবিধ বিকার-চেষ্টায় এবং অন্তর্দ্দশার পূর্ণতম মূর্চ্ছায়—এই দুই মর্ম্ম-সুহৃদ্‌ই নিরন্তর শ্রীচরণের নিকটে বসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিতেন এবং বিরহব্যথা ও মূর্চ্ছা অপনোদনের উপায় করিতেন। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপাদ স্বরূপ স্বকীয় কড়চাগ্রন্থে এই লীলা-সূত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ তাহারই আভাসে দিব্যোন্মাদ-বর্ণনে অন্ত্য লীলাটী প্রেমসুধাময়ী করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা পরম কারুণিক শ্রীল কবিরাজ মহোদয়ের মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া উপসংহারে বলিতেছি :—

জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাহা কি পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে॥

* * * *

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্ত করিল লীলাকে করি নমস্কারে॥

দয়াময় পাঠকমহোদয়গণের নিকট এই ধৃষ্টতার নিমিত্ত আমি কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দূর হইতে এই লীলা সুধা-সমুদ্রকে সভক্তি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ এই চির-আশ্রিতকে ক্ষমা করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন,—শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তগণের চরণে যেন অধমের কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হয়।

(সমাপ্ত)

যে উপকার সাধন করিয়াছেন, এক মুখে তাহা বলিতে পারি না। এই কার্য্য আপনার লেখনীকে ধন্য করিয়াছে, এবং নিজেও ধন্য হইয়াছেন, ভক্ত-সমাজ ধন্য করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড পুস্তক দিয়া আমাকেও ধন্য করিয়াছেন। ব্রহ্মা যাহাকে "অতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে পবিত্র কমণ্ডলুতে যত্নের সহিত রাখিয়াছেন, জগৎকে পাপে তাপে সন্তপ্ত দেখিয়া ব্রহ্মাই আবার আজ তাহা জগতে ঢালিয়া দিয়াছেন। আমি * * * আমিও তাহার সংস্পর্শে, পবিত্র হইলাম। যেমন বিচার, লিখাও সেইরূপ; এরূপ ভাবপূর্ণ, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা অল্পলোকের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে। দুর্ভাগ্য এই যে, রংপুর এইরূপ সুলেখককে হারাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত রঙ্গপুরের ক্ষণিক সৌভাগ্যও গিয়াছে। এক হইয়া যিনি শত কর্ম্ম করিতে পারেন, এইরূপ কর্ম্মঠ লোকও আর দেখি নাই, এক হইয়া যিনি নানাভাবে নানাভঙ্গিতে লিখিতে পারেন, এরূপ সুলেখকও আর দেখি নাই।"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত জজ, প্রবীণতম সাহিত্যিক
সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়

লিখিয়াছেন :—প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—এতদিনে "শ্রীরায় রামানন্দের" কথা পড়িয়া শেষ করিলাম। এরূপ সুন্দর ভক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক রহস্য সমন্বিত গ্রন্থ অনেক দিন পড়ি নাই। ইহাতে উপদেশ ও অনুসন্ধান একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল। আপনি পূজ্যপাদ, তাহার উপর গ্রন্থ লিখিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বসুমতী।

১৯১১ সালের ৯ই মার্চ্চের সংখ্যায় সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধান্যকুড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বদান্য জমীদারপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত।

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ বঙ্গ-সাহিত্যে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক। ইতিপূর্ব্বে তিনি পাঁচ ছয়খানি বৈষ্ণব-গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন ভগবৎ-প্রেমে অপ্লুত হইয়া উঠে, নয়ন প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যায়, হৃদয় কৃষ্ণ-রস-সুধার্ণবে আত্মহারা হইয়া নিমগ্ন হয়। রসিক বাবুর ভাষা যেমন ভক্তিরসে আপ্লুত, তেমনই প্রসাদগুণবিশিষ্ট, তেমনই ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য। ইদানীং অনেক লেখকই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার সময় ব্যাকরণাদির বিধি-নিষেধের কথা বিস্মৃত না হইয়া দুই চারি ছত্রও লিখিতে পারেন না। রসিক-বাবু সে শ্রেণীর লেখক নহেন। তাঁহার প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক পাঠ করিলাম; কিন্তু কোথাও ভাষার দোষ দেখিতে পাইলাম না। ক্বচিৎ কোথাও দুই একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা এত অল্প যে তাহার উল্লেখ না করাই কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখানি ভক্তিগ্রন্থ। অসাধারণ ভক্ত গৌরাঙ্গ-প্রেমিক পরমভাগবত শ্রীল রায় রামানন্দের জীবন-কথাই এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। বিদ্যাবিত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে তিনি মহাপ্রভুর ও সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জীবন-চরিত ও তাঁহার অসাধারণ কৃষ্ণ-প্রেমের কথা এই গ্রন্থ-পাঠে সকলেই

বুঝিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ভিন্ন গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ও ভক্তি-তত্ত্বের অনেক গূঢ় রহস্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থে রসিক-বাবুর অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্য-সাধারণ গৌরাঙ্গ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে এইরূপ গ্রন্থের যতই প্রচলন হয়, ততই মঙ্গল। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ধান্যকুড়িয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার বদান্য লোকপালক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সাউ মহোদয় এই গ্রন্থ-প্রণয়নের সম্পুর্ণ ব্যয় ভার বহন করিয়া ভক্ত-সমাজের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই অমূল্য গ্রন্থ হয় ত জন-সমাজে প্রকাশিত হইত না। আমরা শুনিলাম, এই গ্রন্থখানির বিক্রয়-জাত অর্থে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত করিবেন। আশা করি, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই অমূল্য গ্রন্থের শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্ব-সমাদৃত সর্ব্বজন-পঠিত

শ্রীবৈষ্ণব সম্মিলনী-পত্রিকার সুবিজ্ঞ

ভক্তপ্রবর সম্পাদক মহাশয়

উক্ত পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২।৩ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত। 'শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাণ্ডারে এই শ্রীগ্রন্থখানি উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমরা পূজ্যপাদ গ্রন্থকারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীরামানন্দ রায়ের চরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক সারসিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভুবনপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীরামানন্দ রায়ের যে ইষ্ট-গোষ্ঠী হইয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবধর্ম্মের অমৃতময় সারতত্ত্ব। এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহের দর্শন, বিজ্ঞান ও ভক্তিশাস্ত্র-

সম্মত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেখিয়া সুখী হইলাম। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের ভক্তিতত্ত্বে গভীর জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুল যুক্তিপ্রমাণ, 'পহিলহি রাগ' গানের পর্য্যালোচনা, অপ্রাকৃত নবীনমদন, কামবীজ ও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা, অতি সুন্দর হইয়াছে। সখীভাবের ভজন এবং প্রদ্যুম্নমিশ্রের মিলন পরিচ্ছেদে দেবদাসী ও ভাবপ্রকটন-লাস্যের সদ্-ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উৎস উৎসারিত হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে যে সকল উচ্চ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সুমীমাংসা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আমরা তাহার কণিকামাত্র পাইলেও কৃতার্থ হইয়া যাই; সুতরাং তাহার সমালোচনায় আমরা সম্পূর্ণ অনধিকারী। আশা করি, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রিয়তম পার্ষদের এই লীলামৃত ভক্তজনমাত্রেই অবশ্য পাঠ করিবেন। গ্রন্থের আয়তনের পরিমাণে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে ৩৲ টাকা মূল্য কিছু বেশী নহে, পরন্তু বিষয়-গুণে অমূল্য। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ভবিষ্যতে রচয়িতা আরও বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশ করিবেন। তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, অসমর্থ ভক্তগণকে ২৲ টাকা মূল্যে দুইশত খণ্ড মাত্র বিক্রীত হইবে।

ধান্যকুড়িয়ার বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের ব্যয়ে এই শ্রীগ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার-কল্পে এইরূপ নিঃস্বার্থ সাত্ত্বিক দানের নিমিত্ত উপেন্দ্র-বাবু সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

সুরাট হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় এম এ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

মহোদয়, আপনার প্রণীত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল গ্রন্থ পাঠ

করিয়াছি, তাহার কোন খানিতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে ভক্তিতত্ত্ব ও বৈষ্ণব দর্শনের অতি সূক্ষ্ম কথাগুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এমন কঠোর বিষয় এমন সরল-ভাবে লিখিতে কেবল আপনিই সমর্থ। আমি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু আপনার শ্রীরায় রামানন্দের লিখিত কৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব যেরূপ দার্শনিক ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, আমরা যাহা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া বুঝি, তাহা অসম্পূর্ণ ও অপরিস্ফুট। কৃষ্ণ-তত্ত্বেই ব্রহ্মতত্ত্বের চরম পরিণতি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শাস্ত্র বাক্য গুলি যেন লিখিবার সময়ে আপনার সুধানিঃস্যন্দিনী লেখনীর অগ্রে বিরাজ করিতেছিল। যখন যে বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক হইয়াছে, আপনি বেদ-বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র হইতে সেই সকল প্রমাণ তৎক্ষণাৎ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে লিখিত ভক্তিতত্ত্ব বা সাধন-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বা সাধ্যতত্ত্ব আমি এই সময়ের মধ্যে তিনবার পাঠ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা ও ধর্ম্ম এক প্রকার ভাবের আবেগে পূর্ণ। কিন্তু এক্ষণে আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে ইহা গভীর দার্শনিক ভাবে পরিপূর্ণ। অথচ ভাষার সরলতায়, ভাবের মাধুর্য্যে ও ভক্তির সরস প্রবাহে গ্রন্থখানি কি বৈষ্ণব কি অবৈষ্ণব সকলেরই চিত্তাকর্ষক হই-য়াছে। আমি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইলাম, ভক্তি-সিদ্ধান্তের ও মধুময় ভগবতত্ত্বের আভাস পাইলাম।

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত এবং
বহুল সংবাদ পত্র ও বহুল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসিত।

"আমাদের অতি সাধের ধন,—বহু সাধনের ধন "গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থ ধান্যকুড়িয়ার অন্যতম পরোপকারী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভাগীরথী-তটে প্রেমের যে কুলুকুলু ধ্বনির আরম্ভ, নীলাচলে সুনীল সমুদ্রের তটপ্রান্তে সেই প্রেমের গভীর রস কি প্রকারে মহাকল্লোলে পরিণত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার বহুল বিবরণ লিখিত হইয়াছে। শ্রীরাধাপ্রেমের অনন্ত বৈচিত্রময় ভাবপ্রবাহ অন্ত্যলীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছিলেন, ভক্তগণকে যে রসমাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। তাই বলিতে হয় এই গ্রন্থ বৈষ্ণব মাত্রেরই সাধের ধন—সাধনার ধন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-ঘটনা-মাত্রই মধুর। কিন্তু গম্ভীর-লীলায় তাঁহার লীলার যে রস-মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার তুলনা নাই। প্রেম-সাধনায় এমন প্রণালী আর কোনও ভাষায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের অবতার। তিনি শ্রীরাধা-প্রেমের প্রকট মূর্ত্তি। পূজ্যপাদ কবিবর বাসুঘোষ লিখিয়াছেন—

যদি গৌর না হ'তো, কেমন হইত,
কেমনে ধরিতাম দে।

রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা,
জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী-
প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

"গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থে এই চির-সত্য কবি-বাক্যের প্রকৃত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। পাঠক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে এক অতি সুন্দর মধুময় নিত্যধামের আভাস দেখিতে পাইবেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সাধনার এই তিন পথ। এই তিন পথের মধ্যে ভক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠতম। শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ কেমন মধুর, কেমন ঘনিষ্ঠ—প্রেমভক্তির সাধনাতে তাহা পরিস্ফুট হয়, এই গ্রন্থে তাহাও বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ কত সুন্দর, শ্রীভগবান্ কত মধুর, শ্রীভগবান্ কত রসময়, তিনি যে অনন্তগুণে অনন্ত রূপ-মাধুর্য্যে জীবদিগকে তাঁহার শ্রীচরণের অভিমুখে আকর্ষণ করেন, আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় আনন্দময় ও প্রেমময় অনন্ত রমণীয় রাজ্যের মহামাধুর্য্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন, প্রেমভক্তির সাধনে তাহা জানা যায়। স্বয়ং ভগবান্ নিজে শ্রীরাধাপ্রেম ও শ্রীরাধার প্রেমমহিমা গম্ভীরা লীলায়-আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের রস-মাধুর্য্য কি প্রকারে অনুভব করিতে হয়, কি প্রকারে আস্বাদন করিতে হয়, ভক্তগণকে তাহা গম্ভীরালীলাতে দেখাইয়াছেন, বুঝাইয়াছেন, নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। ভজনের যাহা চরমসীমা,—রসাস্বাদনের যাহা শেষ-পরিণতি,—মানব আত্মার যাহা শেষ লক্ষ্য—গম্ভীরা-লীলায় তাহা

অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে পাঠক ইহার আভাস বুঝিতে পারিবেন, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপায় উহার কিছু কিছু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

অনন্ত বিষয় কোলাহলের মধ্যেও সময়ে সময়ে বুঝা যায়, আমাদের আত্মা যেন কাহাকে চায়, কাহার সঙ্গলাভের জন্য ক্ষণেকের তরে ব্যাকুল হয়,—কাহার বাঁশরীর দূরাগত ক্ষীণধ্বনি শুনিয়া বংশীরবমুগ্ধা মৃগীর ন্যায় চকিত প্রাণে স্থগিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়ায়।

প্রিয় পাঠক—আপনি অবশ্যই জীবনে এইরূপ বাঁশরীর আহ্বান শুনিয়াছেন,—আপনি হয়ত, সংসারের কোলাহলে উহা গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু রসিকশেখর বংশীবদন, সুধাময় বংশীরবে আপনার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ক্ষণেকের তরেও আপনার প্রাণকে বাঁশীর গানে তাহার পানে ফিরাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু আপনি হয়ত শুনিয়াও তাহা শোনেন নাই, বুঝিয়াও তাহা বোঝেন নাই। শ্যামসুন্দরের মোহন বাঁশী সর্ব্বত্রই বাজে,—জলে স্থলে বনে ও মনে—অনবরতই সেই চির-সুন্দরের মোহন বাঁশী বাজিতেছে। বহু জন্মের সংসার-সংস্কারে আমরা সে ধ্বনি শুনিতে পাই না।

এই ভীষণ সংসার-কোলাহলের মধ্যেও মানুষের প্রাণ চকিতের ন্যায় সময়ে সময়ে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয়, তাঁহার মধুময় শ্রীচরণ-দর্শনের জন্য অজ্ঞাতসারে তদীয় চরণ-পানে আকৃষ্ট হয়। গম্ভীরা-লীলায় এই রূপ প্রেমভক্তিরপূর্ণ স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়।

"গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ" গ্রন্থখানিতে ব্রজরসের মধুর ভজনের কথা সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদের রসতত্ত্ব সাদা কথায় সকল শ্রেণীর পাঠকগণের বুঝিবার উপযুক্ত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ৪২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। কাগজ অতি উত্তম। বাঁধাই ভাল, সপার্ষদ শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর হাফটোন্ চিত্র সমলঙ্কৃত মূল্য আড়াই টাকা। সম্প্রতি দুই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পাঠকগণের অবস্থা অনুসারে কিঞ্চিৎ কম মূল্যের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

BANKURA, 20-10-10.

SIR,

I bow down to you according to our oriental custom and though I am not personally acquainted with you I hope you will not fail to accept my Bijoya pronam to you.

I have gone through your book—the life of Ray Ramananda—I have not command of language sufficient enough to praise it in terms it deserves. The get-up of the book is all that can be expected. Its nice binding, its beautiful printing, the sweet and easy style in which it is written, I do not know which to praise most. I am struck with the indomitable energy, perseverance and patience which you have brought into requisition in order to compare and weigh even the smallest reference to be found in the various books noticed by you. By its publication you have laid the Baishnava world and the educated public under deep obligation. None but you could have done full justice to the various intricate subjects dealt with in the book. I have known many men who desisted from reading books relating to Baishnav religion simply because of their bad style and bad printing but now I am full of hope that the labours of workers like yorself in the field of Baishnava religion are sure to draw the attention of all educated men to the religion of love preached by our Lord Gouranga.

But while praising you so much for the publication of the life of Baishnava devotee, I would be failing in my duty, if I do not, at the same time, praise Babu Upendra Nath Saoo, the learned Zamindar of Dhanyakuria but for whose generous liberality a poor man like myself would have been deprived of the heavenly enjoyment. May God give him long life, sound health and heavenly love.

I know that praise from a humble man like myself would be of no avail to you and that you will smile when you go through it, but still I could not help writing to you, I can't describe to you the fealing which goaded me, as it were to write it and when I finished writing drove me to post it. I hope you will pardon me for my inpertinence.

I have been anxiously waiting for the publication of your Gomvirai Shri Gouranga. I have read your Sharup Damodor. Kindly send me per V. P, P. one copy of your Shri Maddas Goswami if you have it in your stock.

Yours Obediently,

UPENDRA NATH DAS, B.L. Pleader,

BANKURA.

(Babu Akhoy Kumer Coo-or, writes from 113, Clive Street Calcutta, dated 18th November 1910, to Babu Upendra Nath Shaoo, Zamindar, Dhanyakuria, 24 Perganas.)

Through the kindness of my most revered friend and preceptor Pandit Russick Mohan Bidyabhusan, Editor of the Vernacular weekly "Sree Sree Vishnupriya & Ananda Bazar", I have been placed in possession of a copy of his latest work "Ramananda" brought out under your noble auspices. Pandit Russick Mohan, as one of the leaders of the present Vaisnavic Renaissance is a man of vast erudition and unquestioned Prem & Bhakti, and I, an unclean *Jib* that I am, should be committing an act of the gravest *aspardha* if I were to offer any comments on the merits of the work. This

much I am allowed to say that it will prove a beacon-light to many tossing in the surging sea of worldliness and materialism.

My object in addressing you these lines is to thank you from the bottom of my heart for the service you have rendered to the cause of Vaisnavic Revival by nobly coming forward to bear the cost of publication of the above work. This shows the stuff that is in you, Sir, and I endorse every word which the learned author has said in regard to your honoured self in his dedication.

(THE AMRITA BAZAR PATRIKA. 16-10.)

Babu Upendra Nath Shaoo—the noble-minded and highly cultured Zamindar of Dhankuria, 24 Perganas, has rendered a very good servie to the Vaisnava literature by helping financially Dr. Rasikmohun Bidyabhusan in publishing his masterly work "The Life and teachings of Raja Ramananda Ray" who was a constant companion and a devoted disciple of Shri Gauranga —the last and the greatest Avatar. Raja Ramananda served as Governor of Bidyanagar under Maharaj Prataprudra Deo of Orissa. He was a good governor, a renowned savant and above all a devoted Bhakta. We find in his life a harmonious development of superb intellect and Divine Emotion combined with a vast amount of learning.

This big volume written in elegant Bengalee with profuse quotations from various Sanskrit Shastric authorities contains a vast mine of informations regarding Vaisnavism—its rituals and philosophy, ethics and ideals, ways and means of attaining

salvation, the notions and conceptions regarding God, the individual soul and the Cosmos and various other important points. The able author with his extensive and profound knowledge of the Vaisnava philosophy and Vaisnava doctrines combined with the knowledge of other branches of the Hindu Shastras and Western philosophy has thrown a flood of light almost on every subject that he has so masterly handled, which, we doubt not, would apear to be almost unparalleled in the works of this nature. Every lover of our vernacnlar literature, whether Vaisnava or non-Vaisnava, is sure to profit by perusing this important volume which is rich with the doctrines of Bhakti and Prem—the best means of attaining God as taught by Sri Gauranga, the greatest Avatar, the world has ever seen. The author has also given an excellent portrait of the donor Babu Upendra Nath Shaoo on the frontispice The price is Rs. 3 only. Two hundread copies only will be sold at Rupees 2 to those who are not in a position to pay the full price. The sale-proceeds would be appropriated to the publication of some other books of this nature. The book is to be had of Dr. Rasik Mohun Bidyabhusan, 25, Bagbâzar Street, Calcutta.

(The Indian Daily News, 18th Nov. 1910.)

"Shree Rai Ramananda."—By Pundit Rasik Mohon Vidyadhusan of Baghazar, Calcutta, Price Rs. 3, published by the author through the help of the zemindar of Dhaukuriya, Babu Upendra Nath Shaoo. The book contains the life and teachings of the illustrious disciple of Chaitanya Deb. The volume of 548 pp. is an able and the most methodical exposition

of the Vaishnava philosophy, replete with apt quotations from renowned Sanskrit authors. Raja Ramananda, was the governor of Bidyangara under the then king of Orrisya, Raja Prataprudra. He was the great savant of his age in whose life and teachings one can find a harmonious development of the three mental faculties—a keen intellect, whole-hearted devotion and exceptionally high emotions—in a healthy body. The learned author Pandit Rasik Mohon Vidyabhusan is to be congratulated on the success of this his latest work and no student of Hindu Philosophy or literature should be without a copy. It is, as alreadsy stated, a brilliant example of the author's treatment of Vaishnavite philosophy, its ethics, its lofty ideals, its rituals and above all the final emancipation of the soul through faith and devotion by the teachings of Chaitanya. The author in supporting his position has brought in copious illustrations from the standard writers of Western thought. Pandit Rasik Mohon Vidyabhusan has established for himself a name which will go down to posterity who will undoubtedly profit by the Pundit's intention of bringing out other works by means of the sale-proceeds of this book.

THE INDIAN EMPIRE, APRIL 4 1911.t

We owe an apology to Pundit Rasik Mohan Bidyabhusan for the delay in reviewing his erudite masterly life of Rai Ramanund This contribution to the Bengali and Baishnava literature alone should hand down his name to the remotest posterity ; but as is wildly known his other works on religion are equally precious and we may have to notice a few of them in future issue. "Sree Rai Ramananda is a fairly large volume, well printed and bound,—the

whole cost of the publication having been met by that truly noble Zemindar and merchant, Babu Upendra Nath Saoo of Dhankuria—a Nature's nobleman in every sense of the word, whose silent charity, unostentatious beneficence, sincere patronage of letters. and simple life should stand out as ideals to most of our big men of higher castes The book before us is not merely a biography of a great man—of one of the associates of Sree Gouranga Deb as also one of the greatest administrators of the age he lived in – it is not merely a critical study such as the Bengalee literature is not over burdened with –it is not merely a learned discourse on Baishnav religion and philosophy but it is all these and more in one and the same book. The learned author had laid under contribution the unlimited range of sanskrit works of the highest perennial interest, and has placed before the reader a perfect store-house of knowledge regarding Baishnav religion and rituals, history and philosophy, ethics and ideals. notions and conceptions of the Godhead, way and means of attaining to salvation, so on and so forth. There is an idea prevalent that the Baishnave literature does not contain much of philosophic depth and degree : but works like the present dissipate such notions and prove the thoroughly philosophic base of the religion. The value of sree Rai Ramananda" has been much enhanced by the learning and erudition of its author in other systems of Hind philosophy and cults of Hindu religion, in the eyes and estimation of other sects. From a historical and critical point of view the work has considerable importance as it throws a flood of light on the time it treats of. It is certainly book of this character wich enriches our literature and give us a better opinion of our literary activity. Though it is not high priced at Rs. 3, two hundred copies of it will be given away for

Rs. 2 per copy to persons who are not in a position to pay the full price. We thank Pundit Rasik Mohan for his splendid work and hope that he will continue to render equally valuable services to religion and literature. The book is to be had of the author at 25 Bagbazar Sareet, Calcutta.

শ্রীরায় রামানন্দ

ও

গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ

এই দুইখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও বহুল

প্রশংসা-পত্র আছে।